সাহিত্যে নারী: স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি



৩০ জুলাই, ২০২৫ তারিখে উইকিসংকলন থেকে রপ্তানিকৃত

সাহিত্যে নারী: স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি

'তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি ॥' —যোগবাশিষ্ঠ

'তরুলতাও জীবনধারণ করে, পশুপক্ষীও জীবনধারণ করে। কিন্তু সেই প্রকৃতরূপে জীবিত, যে মনের দ্বারা জীবিত থাকে।'

নারী—সাহিত্যিকা ও সুপণ্ডিতা:

মানব-সভ্যতার আদিযুগে সকল দেশেই সাহিত্য ছিল ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কবি এবং ঋষির মধ্যে ভেদ-রেখা সেদিন আজকের মতো সুস্পষ্ট ছিল না, ঐতিহাসিক, এমন কি বৈজ্ঞানিকও ছন্দোবদ্ধ ভাষা ব্যবহার ক'রলে কেউ বিস্মিত হ'ত না। কবি বা সাহিত্যিকদের মধ্যে সে যুগে অনেকেই ছিলেন তপস্বী, উপাসক বা পুরোহিত। পৃথিবীর সাহিত্যক্ষেত্রে সেই অতি প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগে এবং আধুনিকযুগে অনবদ্য রসসৃষ্টির জন্য যাঁরা চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে নারীর সংখ্যা অল্প নয়। মিশরের দেবমন্দিরে সেদিন যে নারীপুরোহিতেরা দেবতার প্রতিনিধিরূপে সম্রাটদের প্রণতি গ্রহণ ক'রতেন এবং ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা সমস্ত জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন তাঁদের বাণী আজ আমরা হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু ভারতের প্রাচীনতর যুগের বেদমন্ত্ররচয়িত্রীদের রচিত সাহিত্য আজও লুপ্ত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতের আরণ্যক সভ্যতার যুগে আমরা যে সমস্ত জ্ঞানজ্যোতিবিভাসিতা মহীয়সী মহিলাদের বেদমন্ত্ররচয়িত্রীরূপে দেখতে পাই, তাঁদের জগতের প্রথম নারীজাগরণের অগ্রদূত ব'ললে অত্যুক্তি হবে না। ঋগ্বেদের যুগে এইরকম সাতাশ জন ঋষিকবির পরিচয় আমরা পেয়েছি। তাঁদের নাম; ঘোষা, গোধা, বিশ্ববারা, অপালা, উপনিষৎ, নিষৎ, জুহু, অদিতি, ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রমাতা, সরমা, রোমশা, উর্বশী, লোপামুদ্রা, নদীগণ, যমী, নারী, শাশ্বতী, শ্রী, লাক্ষা, সর্পরাজ্ঞী, বাক্, শ্রদ্ধা, মেধা, দক্ষিণা, সূর্যা, সাবিত্রী। বৃহদ্দেবতার এই তালিকার বাইরেও শচী, বসুক্রজায়া প্রভৃতি নারীর রচিত বেদমন্ত্র ঋগ্বেদে এবং অন্যান্য বেদে পাওয়া যায়। সূর্যকন্যা সূর্যা, দেবমাতা অদিতি, কুক্কুরমাতা সরমা, ইন্দ্রপত্নী ইন্দ্রাণী সাপেদের রাণী সর্পরাজ্ঞী প্রমুখের লেখা পড়ে মনে হয়, তাঁরাও একদিন মানবীই ছিলেন, পরবর্তী যুগের মানুষ তাঁদের অতিরিক্ত সম্মান

দেখাতে গিয়ে অকারণ দূরে ঠেলে দিয়েছে। যাঁদের মানবীত্বসম্বন্ধে দ্বিমত নেই তাঁদের মধ্যে কক্ষীবান-কন্যা ঘোষা, অত্রিকন্যা অপালা, বৃহস্পতিকন্যা রোমশা এবং অগস্ত্যপত্নী বিদর্ভরাজকন্যা লোপামুদ্রা ছাড়া বিশ্ববারা, শাশ্বতী এবং গোধানাম্নী বিভিন্ন ঋষিপত্নী এবং ঋষিকন্যার নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন দেবতার স্তবগান করেছেন, পুরুষেরই মতো অকুণ্ঠ ভাষায় আপনাদের অন্তরের কামনা ব্যক্ত করেছেন। কেউ চেয়েছেন রোগমুক্তি, কেউ চেয়েছেন বলিষ্ঠ অনুরক্ত স্বামী, কেউ চেয়েছেন শত্রুদমনে সহায়তা। ভাষার মাধুর্যে এবং প্রকাশভঙ্গীর প্রসাদগুণে এই সব অত্যন্ত ঘরোয়া কথাই চিরদিনের রসসাহিত্যে স্থানলাভ করেছে, বহু সহস্রাব্দীর ওপার থেকে সেদিনের সুখদুঃখ হাসিকান্নায় আজও আমাদের মর্ম স্পর্শ করছে। হিন্দু বিবাহমন্ত্রে সূর্যার লেখা কয়েকটি অতি অপূর্ব শ্লোক ঋগ্বেদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চ'লে আসছে, — কোটি কোটি হিন্দুনারীকে জীবনের যাত্রাপথে আলো দেখিয়ে। ঋগ্বেদের দেবীসূক্তের রচয়িত্রী অম্ভৃণঋষিকন্যা বাক্ নিজেকে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মবোধে স্বর্গমর্ত্যের অধিষ্ঠাত্রী বলে যে অপূর্ব ওজস্বিনী ভাষায় ঘোষণা করেছেন তা পড়লে শ্রদ্ধায় এবং বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থাকতে হয়। ইনিই যদি পরবর্তী যুগের বাগ্দেবী না হন, তবে সকল-কলাধিষ্ঠাত্রী বীণাপুস্তকধারিণী শ্বেতাম্বরা শুভ্রোজ্জ্বলকান্তি দেবী সরস্বতীর রূপমূর্তি এইযুগে ঋষির মানসচক্ষে কোন্ পটভূমিকায় প্রথম প্রতিভাত হয়েছিল তা' আজ জানবার উপায় নেই। আমরা শুধু জানি সেদিনের তপোবনে তপোবনে সর্বশুক্লা বা কনকগৌরী বিদুষী ঋষিপত্নী এবং ঋষিকন্যার অভাব ছিল না। 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে' একথা সেদিন ভারতবর্ষ মা'নত, তাই মুক্তিকামীকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে সেদিন ঋষিরা স্ত্রীপুরুষের মধ্যে পার্থক্যবুদ্ধি রাখতেন না। দম্পতি কি ক'রে পণ্ডিতা দুহিতা লাভ ক'রতে পারে তার শাস্ত্রোক্ত বিধান বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে এবং পৌরাণিক যুগের প্রথমদিকে মেয়েদের পুরুষদের মতোই বাল্যে ব্রহ্মচর্য পালন করে পতি লাভ করতে হতো।[১]

মেয়েকে ছোটবেলা থেকে লক্ষ্য ক'রে অভিভাবকেরা স্থির করতেন, কোন পথে গেলে তার জীবনে সাফল্য এবং শান্তি আসবে, তারপর নিজেদের স্বার্থচিন্তা না ক'রে তাকে সেই পথেই চলতে দিতেন। হারীতের মতে নারীর মধ্যে একদল ব্রহ্মবাদিনী, আর একদল সদ্যোবধূ। ব্রহ্মবাদিনীরা উপনয়ন, অগ্নীন্ধন ও বেদাধ্যয়ন করবেন এবং আত্মীয়দের মধ্যে ভিক্ষাচর্যা করবেন, সদ্যোবধূদের বিয়ের সময় নামমাত্র উপনয়ন করিয়ে বিয়ে দিতে হবে। যমস্মৃতিতেও মেয়েদের মৌঞ্জীবন্ধন অর্থাৎ উপনয়নের কথা আছে, তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের পিতা, পিতৃব্য এবং ভ্রাতার কাছে বেদ পড়তেন। সর্বত্র যে এ বিধি পালিত হ'তনা তার প্রমাণ পাই এর বহু পরবর্তী যুগে ভবভূতির লেখা 'উত্তররাম চরিতে'। বাল্মীকি লবকুশকে এয়ী বিদ্যা শেখাচ্ছেন; তাঁরা অতিরিক্ত মেধাবী, এত তাড়াতাড়ি শিখছেন যে সহপাঠিনী আত্রেয়ী তাঁদের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারছেন না, তাই তাঁকে অন্যত্র যেতে হচ্ছে। মালতীমাধবেও কামন্দকীর পুরুষের সঙ্গে সহাধ্যয়নের চিত্র পাই। তবু ভবভূতির যুগে নারীর অধিকার অনেক সঙ্কীর্ণ হয়েছে, বৈদিকযুগের স্ত্রীস্বাধীনতা তখন আর নেই। বৈদিক কর্মে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সঙ্গে

নারীর যে সমান অধিকার কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে স্বীকৃত হয়েছে, সে অধিকার তার বহু পূর্বেই সে হারিয়েছিল।

পৌরাণিক যুগের প্রারম্ভে উপনিষদের ঊষায় আমরা কয়েক জন মহীয়সী নারীকে বিদেহরাজ জনকের রাজসভায় দেখতে পাই। সে যুগের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মমহাসভায় ভারতবিখ্যাত ঋষি ও পণ্ডিতমহামণ্ডলীর মধ্যে বালব্রহ্মচারিণী ক্ষত্রিয়া নারী সুলভা রাজর্ষি ধর্মধ্বজের সঙ্গে দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্তা হয়েছিলেন। এই সুলভা একাকিনী পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছিলেন, সর্ববেদপারগা এবং যোগসিদ্ধা ছিলেন। পঞ্চশিখশিষ্য রাজর্ষি ধর্মধ্বজ জনককে পরীক্ষা করবার জন্য তিনি যোগবলে তাঁকে বশীভূত ক'রে তাঁর দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন এবং তর্কের দ্বারা তাঁকে পরাজিত করেছিলেন। ছবির পর ছবি চোখের ওপর ভেসে ওঠে। সহস্র সহস্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সম্মুখে দৃপ্তভঙ্গিমায় দাড়িয়ে যেদিন ব্রহ্মবাদিনী গার্গী সে যুগের অপরাজেয় পণ্ডিত দার্শনিকপ্রবর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের,—ব্রহ্মজিজ্ঞাসার,চরমমীমাংসার জন্য তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলেন, সেদিন কী দিন! সেদিন শ্রেষ্ঠত্বাভিমানী পুরুষের সমস্ত পৌরুষগর্ব সেই জ্ঞানগরীয়সী কুমারীর তর্কপ্রবাহে ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছিল। সেদিনের সভায় শেষ পর্যন্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে ধমক দিয়েই গার্গীকে নিরস্ত করতে হয়, বিচারে পরাজিত ক'রে নয়। এর পর আবার আর এক দৃশ্য। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ভোগৈশ্বর্য্যে বীতস্পৃহ হয়ে প্রব্রজ্যা নেবেন, দুই পত্নীকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ভাগ করে দিয়ে যেতে চান। যিনি একদিনের তর্কযুদ্ধে একটি রাজসভায় সহস্র সুবর্ণমণ্ডিতশৃঙ্গ ধেনুলাভ করেন, তার আজীবনসঞ্চিত সম্পত্তি নিতান্ত অল্প ছিলনা; কিন্তু তাঁর ব্রহ্মবাদিনী পত্নী মৈত্রেয়ীও সামান্যা নারী ন'ন, তিনি আশৈশব ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত, রাজকন্যা হয়েও স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ্রব্রতা অরণ্যচারিণী ঋষিপত্নী হয়েছিলেন। তিনি কৌতুকচ্ছলে স্বামীকে প্রশ্ন করে বসলেন;“এই সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে কি আমি মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারব?” মহর্ষি স্বীকার করলেন, “না, তা তুমি পারবে না।” তখন মৈত্রেয়ীর দ্বিতীয় প্রশ্ন এল; “যেনাহম্ নামৃতা স্যাম্ কিমহম্ তেন কুর্য্যাম্?” এত বড় প্রশ্ন মানবসভ্যতার আদিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত কেউ করেছে ব'লে আমাদের মনে পড়ে না! সহস্র সহস্রাব্দীর ওপার থেকে সেই মর্ম্মস্পর্শী প্রশ্ন আজও ভেসে আসছে, “ওগো, যে বিত্ত আমায় মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারবে না, তা' নিয়ে আমি কি করব?” আমরা আজ প্রগতির গর্ব্ব করি, নারীজাগরণের কথা বলি, জ্ঞানের ক্ষেত্রে, শক্তির ক্ষেত্রে, এবং ত্যাগের ক্ষেত্রে আজও আমরা সেদিনের নারীর অনেক পিছনে প'ড়ে আছি সে কথা ভুলে যাই। আমরা ভুলে যাই ‘অধিকার' ব'লে কোনো বৃন্তহীন পুষ্প জগতে কোথাও কোনোদিন ফোটেনি এবং ফুটবে না, আমরা যে পরিমাণে আমাদের কল্যাণবুদ্ধির এবং মহত্ত্বের প্রমাণ দিয়েছি এবং দে'ব সেই পরিমাণে ‘অধিকার' আমাদের গুণমুগ্ধ সমাজ চিরদিন স্বেচ্ছায় দিয়েছে, দিচ্ছে এবং দেবে। বিলাস- লীলায় এবং ভোগ্য বস্তুর জন্য দুরন্ত লালসায় আজ নারী পুরুষের অনুকরণে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং উত্তরোত্তর তাকেও বিভ্রান্ত করছে। বিবাহের পণে অনেক ক্ষেত্রে বাপকে সর্বস্বান্ত হ'তে হয় জেনেও ভাইকে অবশিষ্ট সম্পত্তির অংশ দিতে বাধ্য- করতে সে আজ বিদেশী রাজশক্তির সাহায্য নিতেও কুণ্ঠিত নয়। আজকের দিনে

বারবার এই প্রশ্নই মনে ওঠে, আমরা জাগছি, না চিরনিদ্রার সুযোগ খুঁজছি? চিরযুগের মানবমনের অমরাবতীতে প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষদের—বুদ্ধ, চৈতন্য, ঈশার পাশে স্থানলাভ করে জ্ঞানগরিমায় এবং আন্তরমাহাত্ম্যে যাঁরা সমস্ত পৃথিবীর শ্রদ্ধাঞ্জলি পেয়ে আসছেন, তাঁদের শিক্ষার ধারা কি আজ আধুনিকতার মরুভূমিতে সত্যই লুপ্ত হ'য়ে গেল?

নারীদের বেদমন্ত্র রচনার যুগ কেটে গেলেও বহুদিন পর্যন্ত তাঁদের বেদমন্ত্রে অধিকার ছিল। গোভিল গৃহ্যসূত্রে এবং কাঠক গৃহ্যে নারীর বেদপাঠের সমর্থন আছে। তারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করতেন (গোভিল, ২, ১, ১৯)। আচার্য এবং উপাধ্যায়ারা আচার্য্যের পত্নী আচার্য্যাণী ও উপাধ্যায়পত্নী উপাধ্যায়ী থেকে পৃথক ছিলেন, তাঁরা নিজেরাই ছাত্রীদের পড়াতেন, অর্থাৎ মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্যও অনেক সময়ে পুরুষ-গুরুর প্রয়োজন হত না, মেয়ের নারী-গুরুর কাছেই বেদবিদ্যা পর্যন্ত শিখতে পারতেন পাণিনির যুগেও। এই যুগের পণ্ডিতাদের মধ্যে মীমাংসাচার্য্য কাশকৃৎস্নির মীমাংসায় ব্যুৎপন্ন। কাশকৃৎদের এবং প্রাচীন ব্যাকরণ আপিশলে ব্যুৎপন্না আপিশলাদের পরিচয় কাশিকাবৃত্তি এবং পতঞ্জলি দিয়েছেন। বহু প্রাচীন দেবীমূতির গায়ে যজ্ঞোপবীত দেখতে পাওয়া যায়, আজও দুর্গোৎসবে দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করানো হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেও বাণভট্ট মহাশ্বেতার বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর 'ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা পবিত্রীকৃতকায়ার' উল্লেখ করেছেন। ঐতরেয় আরণ্যকের রচয়িতা মহিদাসের মা ইতরাকে নীচজাতীয়া ব'লে তাঁর ঋষি পিতা সম্মান দেন নি, উপযুক্ত পুর মায়ের সেই অপমানের প্রতিশোধ দিয়েছেন পিতার উল্লেখ না করে নিজেকে ইতরার পুত্র ব'লে পরিচয় দিয়ে; তাঁর বাল্যশিক্ষার গুরু ছিলেন তাঁর অনাদৃতা মা। গৃহস্থদের সে যুগে পত্নীকে বাদ দিয়ে কোনো ধর্মকার্য করবার উপায়ই ছিল না, শাস্ত্রাদেশ ছিল "সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ"। কৌশল্যা সে যুগের অন্যান্য প্রধানা রাজমহিষীদের মতো রাজা দশরথের যজ্ঞাংশভাগিনী ছিলেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দেখা যায় মন্ত্রপাঠে হোমে আহুতিতে স্ত্রী সমানভাবে যোগ দিতে পারতেন। অরণ্যবাসের সময়ে সীতাদেবী নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনাদির জন্য নদীতীরে যেতেন। বনগমন কালে রামচন্দ্র তাকে প্রথমতঃ সঙ্গে নিতে চাননি, সেই সময়ে সীতাদেবী তাঁকে যে সব জ্ঞানগর্ভ কথা বলেছিলেন তাতে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অত্রি-পত্নী অনসূয়া শুধু সর্বশাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিতা ছিলেন না, তাঁর তপঃপ্রভাবে অনাবৃষ্টি নিবারণ, ঋষিদের তপোবিঘ্ন নিরসন এবং দেবকার্য সুসাধন হত। তার স্বামী তাকে 'মহাভাগা', সর্বভূতের নমস্কারার্হা, ধর্মচারিণী তপস্বিনী' বলে বনবাসকালে সীতাকে তার কাছে উপদেশ নিতে অনুরোধ করেছেন। মতঙ্গ আশ্রমের পরিচারিকা হীনবংশোদ্ভবা শবরীও শংসিতব্রতা তপঃসিদ্ধা নিত্য ধর্মনিরতা তপস্বিনী এবং সাক্ষাৎ 'দেবতার মতো' সকল লোকের নমস্কৃতা ছিলেন। বালির মৃত্যুর পর শোকবিহ্বলা তারা রামচন্দ্রকে অনুরোধ করছেন, তিনি যেন তাঁকে হত্যা করেন। সেই উপলক্ষ্যে বেদ ও শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে স্ত্রী যে স্বামী থেকে অভিন্নাত্মা সেই কথা প্রমাণ ক'রে, তাঁকে মারলে যে স্ত্রীবধের পাপ হবে না, তাও বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সুগ্রীব রাজভোগে শ্রীরামের কার্য ভুলে বিলম্ব করছেন

দেখে লক্ষ্মণ যখন তাঁকে শিক্ষা দিতে যান, তখন তাঁরা তাঁকে কামের দুর্জয় প্রভাব সম্বন্ধে দৃষ্টান্তসহ বক্তৃতা দিয়ে শান্ত করেন। এই অনার্য নারী ছাড়া মন্দোদরী, কৈকসী প্রভৃতি অনার্যা বিদুষীর সাক্ষাৎ আমরা রামায়ণে পাই। রঘুকুলের কুল পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী বশিষ্ঠের সমানশীলা ও সমান ব্রতচারিণী ছিলেন। (অনু ১৩০) তাঁর কাছে পিতৃগণ এবং ঋষিগণ ধর্মের গুহ্যতম তত্ত্ব শুনে ধন্য হয়েছিলেন। এই যুগের আর একজন মহীয়সী এবং সুপণ্ডিত নারী কাশীরাজমহিষী মদালসা। তিনি উপযুক্ত তিনপুত্র— বিক্রান্ত, সুবাহু এবং শত্রুমর্দনকে নিজে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে বনবাসী সন্ন্যাসী করেন, শেষে স্বামীর অনুরোধে চতুর্থ পুত্র অলর্ককে রাজনীতি এবং যোগশাস্ত্র শিক্ষা দেন। কাশীরাজ অলক এই পুণ্যবতীর শিক্ষানুসারে যোগাভ্যাস দ্বারা রিপুসমূহ দমন করে কাশীতে ধর্মরাজ্য স্থাপন করেছিলেন। মহাভারতে 'শিবা' নাম্নী এক সিদ্ধা ব্রাহ্মণীর উল্লেখ আছে, তিনি সর্ববেদপারগা ছিলেন। শাণ্ডিল্য মুনির কন্যা কৌমার ব্রহ্মচারিণী ছিলেন। তিনি যোগযুক্ত। তপঃসিদ্ধ হয়েছিলেন এবং কঠোর তপস্যা ক'রে দেব-ব্রাহ্মণপূজিতা হ'য়ে স্বর্গে গেছলেন। কুনিগর্গ কন্যা, গৌতমী প্রভৃতি তপস্বিনীর কথা মহাভারতে পাওয়া যায়, তাঁরা প্রত্যেকেই সুপণ্ডিতা ছিলেন। ধ্রুবজননী সুনীতি তাঁর পিতৃগৃহে অপমানিত পুত্র ধ্রুবকে ধর্মের মধ্যেই সান্ত্বনা লাভ করতে শিখিয়েছিলেন। ধ্রুবের ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের মূলে ছিল তার বিদুষী ধর্মপ্রাণ মা সুনীতির শিক্ষা। এই যুগের অন্যান্য বিদুষীর মধ্যে মহারাজ স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবহুতি ঋষি-কর্দমের পাণ্ডিত্য খ্যাতি শুনে স্বেচ্ছায় তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। এই জ্ঞানতপস্বী দম্পতির পুত্র মহামনীষী মহর্ষি কপিল সাঙ্খ্য দর্শনের রচয়িতা বলে উত্তরকালে বিশ্ববিশ্রুত হয়েছেন, কিন্তু তার বিদুষী মা'ই যে তাঁকে শৈশবে মাতৃস্তন্যের সঙ্গে মননশীলতায় দীক্ষা দিয়েছিলেন, সে কথা অনেকেই জানেন না।

মদ্ররাজকন্যা সাবিত্রী পিতার সঙ্গে, নারদের সঙ্গে, পতি সত্যবানের সঙ্গে এবং সর্বোপরি যমের সঙ্গে শাস্ত্রীয় তর্কে নিজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। পাতিব্রত্যের জন্য তিনি আজও ভারত নারীর কাছে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য এবং বিচারবুদ্ধির কথা আমরা ভুলে গেছি। বিদর্ভ-রাজদুহিতা দময়ন্তীর অসামান্য সাহস এবং অনন্যদুর্লভ বুদ্ধিমত্তা না থাকলে তিনি নলকে ফিরে পেতেন কিনা সন্দেহ। সে যুগের রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণা-সভায় পরামর্শ দেবার জন্যও বিদুষী নারীদের ডাক পড়ত, মহাপ্রজ্ঞা গান্ধারী, ধীমতী দ্রৌপদী প্রমুখ তত্ত্বজ্ঞ বুদ্ধিমতী নারীরা সেখানে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ রাজগণকেও কর্তব্যনির্ধারণে সহায়তা করতেন এবং সদুপদেশ দিতেন। তাঁদের জন্য সভায় স্বতন্ত্র আসন রাখা থাকত (আদি, ১৩৪,১১)। কূটনীতি বিষয়ে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে এতই উপদেশ দিয়েছিলেন, যে তাঁর বিশ্বাস দাঁড়িয়েছিল, 'শুক্রাচার্য ও বৃহস্পতির বুদ্ধিও স্ত্রীবুদ্ধি অপেক্ষা প্রশংসনীয় নয়। তাঁরা নিশ্চয় মেয়েদের বুদ্ধির প্রয়োগ-কৌশল দেখেই অর্থশাস্ত্র লিখে গেছেন।' রাজনীতি সে যুগের ক্ষত্রিয় বীরপত্নীদের অবশ্য শিক্ষণীয় ছিল বলেই মনে হয়। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে বহুশ্রুতা দীর্ঘদর্শিনী সৌবীররাজপত্নী বিদুলার কথা আছে। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর রাজ্য অরক্ষিত দেখে সিন্ধুরাজ সৌবীররাজ্য কেড়ে নেন, বিদুলার শান্তশিষ্ট ছেলেরা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে

জয়লাভ সম্ভব নয় জেনে নিশ্চেষ্ট রয়েছে দেখে বিদুলার সহ্য হচ্ছে না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রাণাধিক পুত্রদের রণক্ষেত্রে পাঠাবার জন্য তিনি মরীয়া। এই তেজস্বিনী নারীর বজ্রগর্ভ বীরবাণী চিরদিনের ভীরুর জন্য অপমানিতের জন্য নিত্যকাল ধ্বনিত হচ্ছে, আত্মপ্রবঞ্চক লাঞ্ছিতকে ধুলিশয়নের তামসিকতা থেকে সুতীব্র ভাষার কষাঘাতে জাগিয়ে তুলছে। তিনি ব'লছেন, "আপনার আত্মাকে অপমান কোরো না, নিজেকে অল্প দিয়ে ভ'রতে যেয়ো না, পরম কল্যাণের জন্য মনকে প্রস্তুত করো, ভয় কোরো না। ক্ষুদ্র নদী অল্প জলেই ভ'রে যায়, ইঁদুরের অঞ্জলি অল্প জিনিষেই পূর্ণ হয়, কাপুরুষেরাই সহজে এবং অল্পে সন্তুষ্ট হয়।...বজ্রাহতের মতো পড়ে আছ কেন? কাপুরুষ, ওঠো, শত্রুর দ্বারা নির্জিত হয়ে ঘুমিয়ে থেকো না।...হয় আপনার বীর্যকে জাগিয়ে তোলো, না হয় কল্যাণময় গতি (মৃত্যু) প্রাপ্ত হও।" (শুধু সংখ্যা বাড়াবার জন্য পুরুষ বা স্ত্রীলোক হ'য়ে লাভ নেই) "যারা শুধু সংখ্যা বাড়ায়, তারা পূরুষও নয়, স্ত্রীলোকও নয়।" সুদীর্ঘ চার অধ্যায় ধ'রে বিদুলার এই জ্বালাময়ী ভাষা চলেছে, পৃথিবীর সাহিত্যে বীররসের এ এক অপূর্ব সম্পদ। এই ভাষারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই সভামধ্যে অপমানিতা দ্রৌপদীর মুখে;— "ধিক ভীমের বলকে, ধিক অর্জুনের গাণ্ডীবকে, এই ক্ষুদ্রজনেরা আমায় অপমান করছে, এঁরা কেমন করে সহ্য করছেন?" শুধু রুদ্র ভাব নয়, শুধু ক্ষমা নয়, সময়বিশেষে উপযুক্ত ব্যবহারই ছিল দ্রৌপদীর নীতি। তাঁর গভীর রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় আমরা তাঁর এই সব কথায় পাই: "ক্রমাগত তেজ ভালো নয়, সব সময়ে ক্ষমা ভালো নয়...উপযুক্ত সময় বুঝে মৃদু বা তীক্ষ্ণ ব্যবহার করবে...মৃদুতার দ্বারা দারুণ অদারুণ সকলকেই জয় করা যায়, মৃদুর অসাধ্য কিছু নেই, সুতরাং মৃদুরই শক্তি বেশী।...কিন্তু তেজেরও সময় এলে তেজ প্রয়োগ করা অবশ্য কর্তব্য।" দ্রৌপদী শুধু তেজস্বিনী এবং রাজনীতিতে পারদর্শিনী ছিলেন না; ধর্মজ্ঞা এবং ধর্মদর্শিনী ছিলেন, নিরীশ্বরবাদ, হঠবাদ প্রভৃতির সমালোচনায় তার গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাই। সে যুগের আর একজন মহীয়সী মহিলা ধৃতরাষ্ট্রপত্নী গান্ধারী। এই ধর্মপ্রাণ বিদুষী নারীর তুলনা—শুধু ভারতে নয়—পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। অন্ধ স্নেহমুগ্ধ স্বামীর প্রশ্রয় পেয়ে পুত্র দুর্যোধন সুসমৃদ্ধ কৌরবরাজপরিবারকে দ্রুতবেগে কি নিদারুণ পরিণতির দিকে নিয়ে চলেছে তা তিনি দিব্যচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন, তাই সকলের কল্যাণ কামনায় মাতা হ'য়ে পুত্রকে ত্যাগ করবার জন্য বার বার স্বামীকে অনুরোধ করেছিলেন। যুদ্ধগমনোদ্যত পুত্র আশীর্বাদ চাইতে এসেছিল, মুখের কথায় মৃত্যু পথগামীকে তিনি একবার আশীর্বাদ করতে পারেন নি, বলেছিলেন "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" দেবতার কাছে ভক্ত অনেক কিছু চায়, কিন্তু তাঁর মতো নিষ্কাম প্রার্থনা ক'জন করতে পারে? ক'জন বলতে পারে, "আমার কর্মফল আমাকে ভোগ করতেই হবে (তা থেকে মুক্তি দেবার জন্য অন্যায় অনুরোধ তোমায় করব না) কিন্তু নিজের কর্মফলে যে কোনো যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, হে হৃষীকেশ, তোমার প্রতি ভক্তি যেন আমার অচল থাকে।" গান্ধারী বিদ্বেষ-ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ মহাভারতের অন্ধকার আকাশে অত্যুজ্বল ধ্রুবতারকা, পাণ্ডব কৌরবের রণহুঙ্কার ছাড়িয়ে আজও তাঁর অকুণ্ঠ কণ্ঠধ্বনি আমাদের কানে এসে পৌঁছায়, আমাদের ধর্মের পথে সত্যের পথে সন্তানকে অবিচল রাখতে সাহস এবং শক্তি দেয়।

এ যুগের আর একজন মনস্বিনী মহিলা পাণ্ডবজননী কুন্তী। পাণ্ডবেরা যে তাঁদের মাকে দেবীর মতো শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন, সে শুধু মাতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যবোধে নয়, তাঁদের বিদুষী এবং তেজস্বিনী মা আশৈশব পিতৃহীন তাঁদের পিতার মতোই শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং নিজগুণে তাঁদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি একদিকে বেদজ্ঞা, বৈদিক মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে যজ্ঞে যথারীতি সোমপান ক'রে বৈদিক যুগের নারীর মতো তাৎকালীন লোকাচারকে অগ্রাহ্য করে স্বীয় অধিকার খ্যাপন করেছিলেন, অপরদিকে ক্ষত্রিয় বীরনারীর মতো ধর্মযুদ্ধে প্রাণপ্রিয় সন্তানদের মৃত্যুমুখে পাঠাতে দ্বিধা করেন নি। পরপুত্রের প্রাণ রক্ষার জন্য নিজ পুত্র ভীমকে বক-রাক্ষসের মুখে প্রেরণ করেছিলেন। ভারত-যুদ্ধের প্রাক্কালে বনচারী যুধিষ্ঠিরের কাছে এই বলে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন, “ক্ষত্রিয় নারীরা যে জন্য পুত্র প্রসব করে, তার সুসময় উপস্থিত হয়েছে।” বৈদিক এবং পৌরাণিক যুগে বহু ঋষিপত্নী তপস্যার এবং পাণ্ডিত্যের জন্য জনসাধারণের প্রণম্য হয়েছিলেন, তাঁদের সকলের নাম করা এবং পরিচয় দেওয়া। এখানে সম্ভব নয়। ধর্মপ্রাণ, পতিব্রতা প্রভৃতিরূপে তাদের কারো কারো কথা অন্যত্র বলব। ধর্মনীতির ক্ষেত্রে যাদের মহত্ত্ব সর্বজনস্বীকৃত তাঁরা ছাড়া রাজনীতির ক্ষেত্রে দূত হিসাবে নারীর নৈপুণ্য প্রাচীনকাল থেকেই দেখা যায়। সরমা ইন্দ্রের দূতী হয়ে পণি’দের কাছে গেছলেন, তাদের গরুগুলি আদায় করবার জন্য। তাঁর দৌত্য অবশ্য সফল হয়নি। এই যুগেই গায়ত্রী ‘সোম’ আনতে গিয়ে অসমর্থ হলে সরস্বতী গন্ধর্বদের ছলনা ক'রে ‘সোম’ হরণ করে এনেছিলেন। পরবর্তী যুগে রাজনৈতিক প্রয়োজনে এবং গুপ্তচরের কাজে নারী কর্মচারী নিয়োগ অর্থশাস্ত্রের বিধানের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেছল।

বৈদিক এবং পৌরাণিক যুগের বিদুষী নারীদের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই দু’টি সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর নারীকে দেখতে পাওয়া যায় তাদের একদলের কাছে আত্মাই সব, আত্মজ্ঞান এবং মোক্ষচিন্তাই পরম পুরুষার্থ, আর একদলের কাছে দেহ এবং তার সুখ বিধানই সমস্ত, তার জন্য জড়জগতের যত কিছু ঐশ্বর্য, সম্মান, রূপ, শক্তি প্রভৃতি প্রয়োজন তা সংগ্রহ করা চাই, দৈব কৃপালাভের দ্বারাই হোক আর পুরুষকারের দ্বারাই হোক। বেদ-রচয়িত্রী ব্রহ্মবাদিনীদের মধ্যে অধিকাংশ এবং পৌরাণিক যুগের ক্ষত্রিয় নারীদের মধ্যে অধিকাংশই দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়েন। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে মৈত্রেয়ী, গার্গী, সুলভা, মদালসা, শাণ্ডিল্য-কন্যা, শবরী প্রমুখ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং শূদ্র নারীদের পাই। এই দুই দলের মধ্যেও আবার দু’পক্ষেই আছেন অথচ কোনো পক্ষেই সম্পূর্ণ নেই গান্ধারী প্রমুখ এমন কয়েকজন অপূর্বচরিত্রা নারীকে দেখতে পাওয়া যায়। আবার ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য অধর্মে ডুবেছেন, যে রাজসিংহাসনের মায়া ছিন্নবস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করে পঞ্চপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে দু’দিন পরে মহাপ্রস্থানের পথের যাত্রী হয়েছেন, তারই জন্য ভারতবর্ষকে শ্মশান করে জ্ঞাতি-শোণিতে কুরুক্ষেত্রের সুবিশাল প্রান্তর প্লাবিত করেছেন, এমন নিষ্কাম হিংসার প্রতিমূর্তি দ্রৌপদীকে দ্বিতীয় দলের মধ্যে ফেললে অন্যায় হবে, অথচ না ফেললেও উপায় নেই।

বৌদ্ধ যুগের নারী-লেখিকাদের সম্যক্ পরিচয় আমরা পাই না, আড়াই হাজার বছরের শত শত রাষ্ট্রবিপ্লব এবং বিদেশী আক্রমণে তাদের অনেকেরই নাম পর্যন্ত আজ

লুপ্ত হ'য়ে গেছে। তবু যে ক'জনের নাম পাই এবং তাদের লেখার যেটুকু নমুনা পাই, তা' থেকে সে যুগের নারীর ধীশক্তির এবং পাণ্ডিত্যের জন্য শ্রদ্ধা এবং গৌরব অনুভব না করে থাকা যায় না। থেরীগাথা নামক একটি গাথা-সংগ্রহে প্রথম যুগের তিয়াত্তর জন থেরীর রচনা পাওয়া যায়: তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের নাম এই: পূর্ণা, ভিষ্যা, ধীরা, মিত্র, ভদ্রা, উপশমা, মুক্তা, ধর্মদণ্ডা, বিশাখা, সুমনা, উত্তরা, ধার্ম, সঙ্ঘা, জয়ন্তী, আঢ্য কাশী (বা অর্ধকাশী) চিত্রা, মিত্রিকা, অভয়া, শ্যামা, উত্তমা, দন্তিকা, শুক্লা, শৈলা, সোমা, কপিলা, বিমলা, সিংহা, নন্দা, মিত্রকালী, বকুল, সোনা, চন্দ্রা, পটাচারা, বাশিষ্ঠী, ক্ষেমা, সুজাতা, অনুপমা, মহাপ্রজাবতী (ব, মহাপ্রজাপতি) গৌতমী, গুপ্তা, বিজয়া, চালা, উপচালা, বৃদ্ধমাতা, কৃশা গোতমী, উৎপলবর্ণা, পূর্ণিমা, অম্বপালী, রোহিণী, চম্পা, সুন্দরী, শুভ্রা, ঋষিদাসী, সুমেধা। 'থেরী' অর্থে স্থবিরা বৌদ্ধ তপস্বিনী, এঁদের মধ্যে অনেকে বুদ্ধদেবের জীবিতকালেই গাথা রচনা করেছিলেন। আজ থেকে আড়াই হাজার বছরেরও আগে লেখা এই সব গাথা আজকের দিনেও যে কোনো সুকবির লেখার পাশে অনায়াসে স্থান পেতে পারে। এঁদের মধ্যে কয়েক জনের সম্বন্ধে দু'এক কথা বলব। বুদ্ধের শিষ্যাদের মধ্যে তাঁর বিমাতা গোতমীর পরেই ক্ষেমা এবং উৎপলবর্ণার স্থান নির্ণীত হয়েছে, তাঁরা ছিলেন বুদ্ধের অগ্রশ্রাবিক। ক্ষেমা মগধরাজ বিম্বিসারের প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন, অপরূপ রূপলাবণ্যের গর্বে তিনি বুদ্ধকেও গ্রাহ্য ক'রতেন না। ঘটনাক্রমে একদিন বেণুবনে বেড়াতে বেড়াতে তিনি বুদ্ধের কাছে গিয়ে পড়েন। বুদ্ধ মায়াবলে তাঁর চেয়ে অপরূপ সুন্দরী এক অপ্সরা সৃষ্টি ক'রে তাঁর রূপগর্ব চূর্ণ করেন। তারপর তাঁর চোখের সামনে সেই সুন্দরীর দেহের ক্রমপরিণতি—জরা এবং মৃত্যুর বীভৎস করুণ দৃশ্য দেখিয়ে ক্ষেমার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার করেন। ভগবান বুদ্ধের উপদেশে স্বামীর অনুমতি নিয়ে রাজমহিষী ভিক্ষুণীসম্প্রদায়ে প্রবেশ করে অচিরে অর্হৎ পদ প্রাপ্ত হন। অলোকসামান্য রূপের জন্য থেরী উৎপলবর্ণার খ্যাতি যৌবনে এত ছড়িয়ে পড়েছিল যে, বিবাহার্থীদের একজনের সঙ্গে বিবাহ দিলে বহুজনের সঙ্গে শত্রুতা হ'বার সম্ভাবনা দেখে তাঁর পিতা তাঁকে চিরকুমারী রেখেছিলেন এবং বৌদ্ধভিক্ষুণী-সঙ্ঘে যোগ দিতে দিয়েছিলেন। তিনি পাণ্ডিত্যের এবং ধর্মপরায়ণতার জন্য ভগবান বুদ্ধের বাঁ পাশে আসন পেয়েছিলেন এবং মেয়েদের সম্বন্ধে যে কোনো জটিল প্রশ্ন উঠলে বুদ্ধ স্বয়ং তার পরামর্শ গ্রহণ ক'রতেন। এই যুগের নারীদের মধ্যে সব চেয়ে প্রতিভাশালিনী বাগ্মী ছিলেন থেরী পটাচারা। তাঁর অমৃতমধুর উপদেশবাণী শুনে একদিনের একটি সভায় পাঁচশ' পর্যন্ত নারী বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। বহুসহস্র নারী তাঁর আদেশ দৈবাদেশের মতো মা'নত, বুদ্ধের জীবিতকালে উত্তর-ভারতের বহু রাজ্যে তাঁর অসামান্য প্রভাব ছিল। তাঁর প্রথম জীবনের করুণ কাহিনী তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন শ্রাবস্তীর এক সম্ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠীর কন্যা, যৌবনে এক যুবকের প্রেমে প'ড়ে পিতার অসম্মতিতে বিবাহ অসম্ভব দে'খে গৃহত্যাগ করেন। বিদেশে বিবাহ ক'রে কিছুদিন সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটিয়েছিলেন, তার পর বিপদের বন্যা এল। স্বামী সর্পদংশনে মারা গেলেন, দৈন্যে, অনাহারে নিরুপায় হ'য়ে দুই শিশুপুত্র নিয়ে পটাচারা দেশে ফিরছিলেন, পথের মধ্যে দুটি ছেলেরই মৃত্যু হ'ল। উন্মাদিনীর মতো দেশে ফিরে তিনি শুনলেন, ঘরচাপা পড়ে তাঁর পিতা, মাতা, ভাই—সবাই এক সঙ্গে মারা গেছেন। সে

সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে ছিলেন, হতভাগিনী শোকোন্মত্তা নারীকে তিনি ধর্মের মধ্যে আশ্রয় এবং সান্ত্বনা দিলেন, তাঁর উপদেশে পটাচারার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হ'ল। যে হোমাগ্নি সেদিন তাঁর অন্তরে জ্বলেছিল, সেই হোমশিখার আগুন তিনি সহস্র সহস্র নারীর হৃদয়ে জ্বেলে দিয়েছিলেন, রোগ, শোক, দৈন্য জয় করে নারীকে আত্মসচেতন হ'তে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বৌদ্ধযুগের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান ধর্মনেত্রী বুদ্ধবিমাতা গোতমীর কথা অন্যত্র বলেছি। তাঁর কাছে একদিক দিয়ে সমস্ত পৃথিবীর নারী ঋণী। তাঁর রচিত গাথায় তিনি বলেছেন: “হে সুগত, আমি তোমার মা, কিন্তু তুমি আমায় সদ্ধর্ম দান করে নূতন জন্ম দিয়ে আমার পিতৃস্থানীয় হয়েছ। আমি প্রতিপালন করে তোমায় বড়ো করেছিলেম, তুমি আমায় ধর্মদেহ দিয়েছ। তোমার মুহূর্তকালের তৃষ্ণা মেটাতে আমি দুধ খাইয়েছি, তুমি ধর্মদুগ্ধ পান করিয়ে আমাকে অক্ষয় শান্তি দিয়েছ। মান্ধাতা প্রমুখ রাজার নাম ভবসাগরে লোপ পেয়েছে, কিন্তু তোমার মা হয়ে আমি ভবসাগরে উদ্ধার পেয়েছি। রাজার মা, রাজার মহিষী হওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে সহজ, কিন্তু বুদ্ধমাতা এই নাম পরম দুর্লভ। মেয়েদের প্রব্রজ্যার অধিকার দেবার জন্য আমি তোমায় বার বার বলেছি, সেজন্য কোনো দোষ হয়ে থাকে তো ক্ষমা কোরো। তোমার আজ্ঞায় আমি ভিক্ষুণীদের শাসন করেছি, সে কাজে কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে তো, হে আমার আধার, তুমি আমায় ক্ষমা কোরো। তোমার দেওয়া ধর্মরস পান করে যে তৃপ্তি পেয়েছি, শৈশবে তোমার সুন্দর রূপ দেখে, তোমার মধুর কথা শুনে সে তৃপ্তি আমার হয়নি। হে বুদ্ধবীর, তোমায় নমস্কার, তুমি সকল সত্তার শ্রেষ্ঠতম। তোমার কৃপায় আমার মতো কত শত দীন দুঃখী দুঃখের জ্বালা এড়িয়েছে।...” সমসাময়িক অন্যতমা থেরী শ্রাবস্তীর ব্রাহ্মণকন্যা মুক্তা বলেছেন:—

“শুভযোগে হও মুক্ত চন্দ্রসম রাহুগ্রাস হ'তে।
ঋণমুক্ত হয়ে মুক্তা পিণ্ডপাত করা কোনো মতে॥” (বিঃ মঃ)

সুকবি থেরী পূর্ণা বলেছেন:

“পূর্ণে, পূর্ণ করে প্রাণ পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র সম।
পূর্ণপ্রজ্ঞালোকে দূর করে তুমি অজ্ঞতার তম॥”

(বিজয় মজুমদার)

সুবক্ত্রী শুক্লা পাঁচশ' ভিক্ষুণীর নেত্রী ছিলেন, প্রকাশ্য সভায় ধর্মপ্রচার করে তিনি বহুনারীকে মুক্তির বাণী শোনাতেন, তাঁর এক গুণমুগ্ধা শিষ্যা লিখে গেছেন,

"ওগো রাজগৃহবাসী, কেন সবে আছ মত্তপ্রায়।
শোনো গিয়া শুক্লা আজি ধর্মের মধুর গাথা গায়।
বচনে যে মধু ক্ষরে, পান করি' দীপ্ত করে প্রাণ।
মধুর মাধুরী নহে কভু সেই অমৃত সমান।
জ্যোতির্ময় ধর্মেরত, বীতরাগ সমাহিত-চিত।
সসৈন্যে 'মার'কে বধি' হয় তার জীবন বাহিত॥" (বিঃ মঃ)

মগধরাজ বিম্বিসারের সভাপণ্ডিতের মেয়ে সোমা বলেছেন: শ্রাবস্তীর কাছে এক বনে গাছতলায় বসে তিনি ধ্যান করছিলেন, —এমন সময় 'মার' তাঁর তপস্যাভঙ্গ করবার জন্য ভয় দেখাতে এসে অবজ্ঞাভরে বললে, "যোগী ঋষিরা বহু তপস্যায় যে পরমপদ লাভ করেন, তুমি সামান্যা নারী হয়ে কি করে তার সন্ধান পাবে? চিরকাল রাঁধো বাড়ো, তবু তো হাত পাকল না, এখন ও তো ভাত সিদ্ধ হ'ল কিনা বার বার টিপে দেখতে হয়।" তার উত্তরে সোমা নাকি তাঁকে বলেন:

"নারীজন্ম লভিয়াছি বল তাহে ক্ষতি কি আমার?
নরনারী সবাকার সত্যলাভে তুল্য অধিকার।
একাগ্র করিয়া চিত, আপনায় করিয়া নির্ভর,
অর্হতের পথ ধরি' ধীরে ধীরে হ'ব অগ্রসর।
বিষয়বাসনা যত, কালে হবে ছিন্নমূল তার,
সত্যের আলোকে আর ঘুচে যাবে অজ্ঞান-আঁধার।
জান্ ওরে ভাল ক'রে, আপনারে দেখ্, দুরাশয়,
আমিও চিনেছি তোরে, নাহি আর নাহি কোন ভয়।"

(সত্যেন্দ্রঠাকুর)

মন্তাবতীরাজ মঞ্চের কন্যা সুমেধা বাল্যেই বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগিণী হয়েছিলেন। বারণাবতীরাজ অনিকর্তের সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা চলছিল। অন্ন জল ত্যাগ করে তিনি মাতাপিতাকে ব'ললেন "আমি সংসারসুখ চাই না, হয় প্রব্রজ্যা, নয় মৃত্যু বরণ করব।" শেষ পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছারই জয় হ'ল, রাজকন্যা ভিক্ষুণী হয়ে শান্তি পেলেন।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে সে যুগের এমন অনেক মেয়েকে দেখা যায়, যারা প্রকৃতই নিঃস্বার্থ এবং ধর্মবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিতা; তাই দেখি বিদুলা এবং কুন্তী সুপণ্ডিত হয়েও অধমকে দমন করবার জন্য পুত্রদের নররক্তপাতে উৎসাহিত করছেন, আবার অপর দিকে দেখি রাজরাণী মদালসা পুত্রদের ব্রহ্মবিদ্যা শিখিয়ে নির্মমচিত্তে বনে পাঠাচ্ছেন। ছোটোবেলায় রাজপুত্র বিক্রান্ত একবার প্রজার ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে গিয়ে মার খেয়ে এসেছিলেন। তিনি মায়ের কাছে নালিশ করলেন এবং প্রজার ছেলের রাজপুত্রের গায়ে হাত তোলার স্পর্ধার জন্য শাস্তি দিতে বললেন। তাতে মদালসা তাকে বোঝালেন, "ভুলে যেও না তুমি শুদ্ধাত্মা। তোমার বিক্রান্ত নাম বা

রাজপুত্র উপাধি প্রকৃত পদার্থ নয়, কল্পনামাত্র। রাজপুত্র ব'লে অভিমান করা তোমার সাজে না। আর যে দেহে আঘাত পেয়ে তুমি উত্তেজিত হয়েছ, সেই তোমার এই দৃশ্যমান শরীর পঞ্চভূত দিয়ে তৈরি, তুমি তো সে দেহ নও, তবে দেহের বিকারে তোমার কাঁদবার কি আছে?” এরকম মা আজকের দিনের বিদুষী নারীদের মধ্যে ক’জন আছেন জানতে ইচ্ছা হয়, আছেন কি?

এর পর ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভেও ভারতে বিদুষী নারীর অভাব ছিল না। বাৎস্যায়নের মতে, “পুরুষের মতো মেয়েরাও কবি হতে পারেন।” শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন রাজকন্যা মন্ত্রিকন্যা, কৌতুকি-ভার্যা এবং গণিকা তাঁর সময়ে অনেক দেখা যেত। তা তিনি স্বীকার করে গেছেন। চৌষট্টিকলার মধ্যে কাব্যচর্চা মেয়েদের শিক্ষার অঙ্গ এবং বৈদগ্ধ্যের পরিচায়ক ব'লে বিবেচিত হ'ত। এই যুগে এবং এর পরবর্তী যুগে বিদুষী নারীদের মধ্যে অধিকাংশই ধর্মসাধনার চেয়ে কবিতা রচনার দিকে বেশী ঝোঁক দিয়েছিলেন। মহাপুরুষ বুদ্ধের সময়ে কিছু দিনের জন্য এই কাব্যস্রোতের মোড় ফিরে যায় ধর্মসাধনার দিকে নির্বাণের কামনায়। বুদ্ধদেব বলেছেন কোনো কোনো নারী পুরুষের চেয়ে ধর্মপ্রাণতায় এবং মানসিক শক্তিতে বড়। তিনি প্রথম যৌবনে তাঁর পাত্রীনির্বাচনের সময় ‘মেয়ের কবিতা লিখতে জানা চাই’[২] এই দাবী জানিয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে মুক্তিসাধনার বিঘ্ন মনে করে তিনি নারীকে সন্দেহের চক্ষে দেখতেন, তবু আনন্দের এবং মহাপ্রজাবতী গোতমীর অনুরোধে তাঁকে মেয়েদের সন্ন্যাসিনী হ’বার অনুমতি দিতে হয়। ভগবান তথাগত যেদিন মহাপ্রজাবতী গোতমীকে ধর্মদীক্ষা দিলেন সেদিন ভারতীয় নারীর ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন। ইতিমধ্যে দেশের বিলাস-ব্যসন বৃদ্ধি হয়েছিল। জাতীয় জীবনে মননধর্মী আর্য সভ্যতার উপর প্রাণধর্মী অনার্য সভ্যতার যে প্রভাব মহাভারতের যুগেই দেখা দিয়েছিল তা ক্রমেই প্রবলতর হচ্ছিল। আত্মার উৎকর্ষসাধনের চেষ্টার চেয়ে পুরুষের অনুকরণে হাবভাব সাজসজ্জা এবং কলাচর্চায় তাদের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হ'ত, ফলে নারীপ্রতিভার বিপুল অপচয় ঘটছিল। হঠাৎ নবধর্মের নূতন উৎসাহবাণী তাদের আত্মসচেতন করে তু'ললে, নির্বাণলাভের আশায় সহস্র সহস্র নারী সহসা সেদিন সংসারের সব সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে পথে এসে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে সকলশ্রেণীর সকল অবস্থার নারীই ছিল, রাজরাণী থেকে ভিখারিণী, পতিতা এবং গণিকারা পর্যন্ত সেদিনের সেই ভিক্ষুণীসঙ্ঘে স্থান পেয়েছিল। এদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষিতা ছিলেন তারা পূর্বসংস্কৃতি ত্যাগ করেননি, তাঁদের পাণ্ডিত্য ধর্মের সেবায় লোকশিক্ষার কাজে লাগিয়েছেন, যাঁরা কবি ছিলেন তাঁরা ধর্ম বিষয়ক কবিতা রচনা করে মানুষের অন্তর জয় করেছেন। নারীর রচিত কবিতা শুধু শিক্ষিতের সৌখীনের সখের সামগ্রী হয়ে রাজসভায় এবং নাগরিকের প্রমোদভবনে ব'সে না থেকে যেনি বিশ্বের প্রশস্ত রাজপথে ধর্মের জয়ভেরী বাজিয়ে যাত্রা ক'রল, ‘সেদিন এক হ'য়ে গেল মান-অপমান, ব্রাহ্মণ আর জাঠ', সেদিন ভারতের এক পরম গৌরবের দিন। এর অনতিকাল পূর্বে এবং পরবর্তী বৌদ্ধ ও হিন্দুযুগে পার্থিব প্রেম এবং প্রকৃতি-বর্ণনাই ছিল অধিকাংশ নারীলিখিত কবিতার বিষয়-বস্তু, ভগবান বুদ্ধের পুণ্যপ্রভাবে প্রাথমিক বৌদ্ধ যুগের নারীকবিরা নিজেদের সমস্ত ক্ষুদ্রতার বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমায়

প্রকাশিত হ'লেন, কাব্যক্ষেত্রে ধর্মের জয়গান গেয়ে দুঃখতপ্ত পৃথিবীকে অভয়ের এবং সান্ত্বনার বাণী শোনালেন। মৈত্রেয়ীর বাণী নূতন মূর্তি নিয়ে ফিরে এল।

থেরী অনুপমা ছিলেন সাকেত নগরের এক বিখ্যাত ধনীর মেয়ে, তিনি লিখেছেন, "আমার সৌন্দর্যখ্যাতি শুনে আমাকে বিবাহ করবার জন্য বহু রাজপুত্র, বহু শ্রেষ্ঠিপুত্র প্রার্থী হয়েছিলেন, তাঁদের দূতেরা এসে পিতাকে বলতেন 'অনুপমাকে ওজন ক'রলে যত সোনা হয়, তার আটগুণ সোনা দে'ব, আমাদের পাত্রকে কন্যাদান করুন' কিন্তু লোকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে দেখবার জন্য আমার প্রাণ উদ্বুদ্ধ হ'ল, তাঁর চরণবন্দনা ক'রে আমি ধ্যানে বসলুম। তিনি আমায় ধর্ম দীক্ষা দিলেন।"

শুভানাম্নী এক থেরী আমবাগানে সাধনারত ছিলেন, এমন সময় জীবক নামক এক ধূর্ত্ত তাকে কুপথে নিয়ে যাবার জন্য চাটুবাদ আরম্ভ করে। জীবক বলে, "তোমার চোখ দুটি পাহাড়ী কিন্নরীর মতো অথবা হরিণীর মতো। ঐ চোখ দেখলে কি মানুষের প্রেমের তৃষ্ণা বেড়ে যায় না?" শুভা নিজের হাতে নিজের চোখ দুটি উপড়ে ফেলে ধূর্তকে দিয়ে বললেন, "হে পুরুষ, যে চোখ দুটির তুমি এত সমাদর করছ, এই নাও, সে চোখ দুটি তোমাকেই দিলুম।" ধূর্তের পাপলালসা নিমেষ মধ্যে ঘুচে গেল, সে পায়ে পড়ে সেই মহাভাগা তপস্বিনীর কাছে ক্ষমা চাইল এবং জীবনে আর কখনো পরনারীর দিকে পাপদৃষ্টিতে চাইবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ল। বুদ্ধের কৃপায় শুভা দিব্যচক্ষু পেয়েছিলেন। ত্রিশটি গাথায় তিনি তাঁর জীবনের এই স্মরণীয় ঘটনাটি বর্ণনা করে গেছেন। কৃশা গোতমী লিখেছেন, "আমার দুই পুত্র মারা গেল, স্বামী অনশনে মারা গেলেন, মা বাবা ভাই একসঙ্গে একদিনে আগুনে পুড়ে মরলেন। আত্মজ্ঞানহারা হয়ে দারিদ্র্যের কষ্ট সইলুম, শ্মশানে পুত্রের মাংস গৃধিনীদের খেতে দেখলুম। এই রূপে পতিহারা কুলহারা হ'য়ে ভগবান বুদ্ধের দয়ায় অমৃতত্ব লাভ করেছি।"

সংসারে অনেক জ্বালাযন্ত্রণা পেয়ে যাঁরা বুদ্ধের ধর্মে সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন তার মধ্যে থেরী ঋষিদাসী তিন বার পতিপরিত্যক্তা হয়েছিলেন, ভদ্রা আত্মরক্ষার জন্য স্বামী হত্যা ক'রে অনুতাপে দগ্ধ হয়েছিলেন, উষিবরী স্বামীশোকে এবং বৈশিষ্টী পুত্রশোকে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। অম্বপালী, বিমলা, অর্ধকাশী প্রমুখ সুন্দরী গণিকারা তাঁদের পাপজীবনে জলাঞ্জলি দিয়ে কি ভাবে নূতন জীবন পেয়েছিলেন, তা তাঁদের নিজেদের ভাষাতেই আমরা পাই। বিমলা ব'লছেন, "আমি আমার যৌবন, বর্ণ, রূপ, ভাগ্য ও খ্যাতির অহঙ্কারে মত্ত ছিলুম, লোকের মন ভোলাবার জন্য নানাভূষণে লেপনে দেহ সাজিয়ে ব্যাধের মতো জাল পেতে ব'সে থাকতুম। মানুষের ধর্ম ও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দেবার জন্য নানা রকম ছলনা ক'রে আঁচল ওড়াতুম। আজ আমার মাথা মোড়ানো, পরণে ছেঁড়া কাপড়, ভিক্ষা ক'রে উদরান্ন সংগ্রহ করি, গাছতলায় ধ্যান করে আমার জীবন কাটে। আমার সব বন্ধন কেটে গেছে, সব পাপ নষ্ট হয়েছে, নির্বাণের সুখ আমার চিত্ত অধিকার করেছে।" থেরী অম্বপালীর অলৌকিক সৌন্দর্য এককালে জনপ্রবাদে পরিণত হয়েছিল। বৈশালীর এই সুন্দরীর মোহে মগধেশ্বর বিম্বিসারকেও এক দিন

পড়তে হয়েছিল। বৈশালীতে তাঁর আম্রবনে বুদ্ধদেব বিশ্রাম করছেন শুনে অম্বপালী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁর সামান্য বেশ-ভূষা অথচ সুন্দর মোহন মূর্তি! স্বয়ং বুদ্ধও তাকে দেখে চমকে গেছলেন, মনে মনে ভেবেছিলেন, "স্ত্রীলোকটি কি অপূর্ব সুন্দরী! রাজপুরুষেরাও এর রূপলাবণ্যে মোহিত এবং বশীভূত, অথচ এ কেমন সুধীর শান্ত। সচরাচর স্ত্রীলোকের মতো যৌবনমদমত্ত চপলস্বভাব নয়। জগতে এমন নারীরত্ন দুর্লভ।" অম্বপালীর চিত্তক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল, পাপে বিতৃষ্ণা এসেছিল, বুদ্ধের ধর্মোপদেশে তাঁর মন গলে গেল। সশিষ্য বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ ক'রে পরিতোষ ক'রে খাইয়ে তাঁর প্রাসাদতুল্য উদ্যানভবন বুদ্ধ এবং সঙ্ঘকে দান ক'রলেন। পাপলব্ধ বিপুল ঐশ্বর্য সঙ্ঘের সেবায় ব্যয় ক'রে তপোবলে অম্বপালী যৌবনেই থেরীপদ লাভ করেন। থেরী গাথায় আমরা তাঁর বার্ধক্যের উক্তি পাই, "আমার ভ্রমরকৃষ্ণ চুল আজ শণের মতো সাদা হয়েছে! যে চুলে আমি চাঁপা করবী গুঁজে রাখতুম সে এখন শশকের লোমের মতো কুৎসিৎ। আমার সুনীল আয়ত নেত্র এক দিন মণির মতো ভাস্বর ছিল, আজ তা মলিন। আমার স্বর্ণবর্ণ সুন্দর উঁচু নাক আজ শুকিয়ে ঝুলে পড়েছে... বর্তুল অর্গলের মতো বাহু দুটি নত এবং দুর্বল হয়েছে।"

অধ্যাপক সুকবি ৺বিজয়কুমার মজুমদারের কবিতাটী হইতে সামান্য উদ্ধৃত করলেম:

"সুরভিত কালকেশে বেণী হত রচিত;
স্বর্ণভূষণে হয়ে খচিত।
দুলিত শোভায় সাজি,
স্খলিত জরায় আজি,
আজি মোর শির কেশ-রহিত,
সত্য বচন তাঁর অন্যথা কোথা বা?"
"সোনার শাঁখের মত ছিল যার শোভা গো,
এই কি আমার সেই গ্রীবা গো?
জরায় গিয়েছে ভেঙ্গে, ঝুলিয়া পড়েছে নেমে,
এ দেহের গৌরব কিবা গো?
সত্য বচনে তাঁর অন্যথা কোথা বা?"

বৌদ্ধযুগের প্রথম দিকে মগধের তৎকাল প্রচলিত পালিভাষাতেই বৌদ্ধ ধর্মের অধিকাংশ বই লেখা হয়েছিল। বৈদিক সংস্কৃত সে সময়ে অপ্রচলিত হ'য়ে গেছে, সাধারণলোকের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা চ'লছে। সংস্কৃত তখন শিক্ষিতের ভাষা, সর্বসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচার ক'রতে সে ভাষার চেয়ে চলিত ভাষাই বেশী কাজে লেগেছিল, তাই বৌদ্ধ বিদুষীদের অধিকাংশ রচনাই পালিতে পাওয়া যায়। থেরী গাথা ছাড়া অন্যত্র যে সব নারীর রচনা পাওয়া যায় তার মধ্যে বুদ্ধপত্নী যশোধরার

নাম উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভের পর যখন কপিলাবস্তুতে শুদ্ধোধনের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তখন যশোধরা তার শিশু পুত্র রাহুলকে তার কাছে পাঠিয়ে দেন পিতৃধন চাইবার জন্য, বুদ্ধও তাকে নিজধর্মে দীক্ষা দিয়ে ভিক্ষু ক'রে নে'ন। এই উপলক্ষ্যে একটি পালি কবিতায় যশোধরা ছেলের কাছে তার পিতাকে চেনবার সুবিধার জন্য বুদ্ধের রূপ বর্ণনা করেছেন; তাঁর শুদ্ধ নীল মৃদুকুঞ্চিত কেশ, সূর্যের মতো উজ্জ্বল প্রশস্ত ললাট, চক্রচিহ্নযুক্ত আরক্ত পদতল, সর্বসুলক্ষণাক্রান্ত পুণ্যশরীরের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, "সেই নবীর লোকহিতের জন্য চলে গেছলেন,—সেই পুরুষসিংহই তোমার পিতা।" কবিতাটির মধ্যে পতিপরিত্যক্তা নারীর অভিযোগের বা অশ্রুর চিহ্নমাত্র নেই, পুরুষসিংহেরই উপযুক্ত সিংহিনীর বলিষ্ঠ মনের পরিচয়, তার মহাপুরুষ স্বামীর জন্য অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং গৌরববোধ লেখাটির প্রতি ছত্রে দেদীপ্যমান।

থেরী-গাথা ছাড়া হীনযানী বৌদ্ধদের জাতকগুলিতে পালিভাষায় এবং মহাযানী বৌদ্ধদের বোধিসত্ত্বাবদানমালা ও জাতক মালার সংস্কৃত ভাষায় আমরা সে যুগের বহু মহীয়সী নারীর পরিচয় পাই। তাঁদের মধ্যে কাশীরাজ কৃকীর কন্যা মালিনী এবং কুমার কাশ্যপের মায়ের কথা উল্লেখযোগ্য। মালিনীর বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগ সনাতনপন্থী কাশীর রাজসভার এবং প্রজাদের ভালো লাগেনি। তারা রাজার কাছে রাজকন্যার নির্বাসন দণ্ড প্রার্থনা করে, নিরুপায় হ'য়ে রাজাও কন্যাকে নির্বাসন দণ্ড দেন। গৃহত্যাগের পূর্বে মালিনী প্রকাশ্য সভায় রাজ্যের সমস্ত পণ্ডিতকে তর্কে পরাজিত ক'রে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করেন। তার পর গৃহে থাকবার জন্য তাঁকে আবার সকলে অনুরোধ করে, কিন্তু সে অনুরোধ তিনি রাখেন নি। সারনাথে গিয়ে তিনি ধর্মজীবন যাপন আরম্ভ করেন, তাঁকে কেন্দ্র করে তাঁরই চেষ্টায় দশ সহস্র ভিক্ষুণীর এক বিরাট সঙ্ঘ সারনাথে গড়ে ওঠে।

ভগবান বুদ্ধের জীবিতকালে ভিক্ষু কুমার কাশ্যপ এবং তাঁর মা দুজনেই অর্হত্ব লাভ করেছিলেন। বুদ্ধদেব স্বয়ং বলেছেন— 'ভিক্ষু-সঙ্ঘের মধ্যে কুমার কাশ্যপ সব চেয়ে বাকপটু; তাঁর মতো ধর্মব্যাখ্যা করতে কেউ পারত না। এই ভিক্ষুর মা ছিলেন রাজগৃহের এক ধর্মপরায়ণা শ্রেষ্ঠিকন্যা। শৈশবে তিনি প্রব্রজ্যা নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাপ মা'র মত ছিল না বলে হয়নি। যৌবনে শ্বশুরকুলের সকলেই তাঁর গুণমুগ্ধ ছিল, তাঁদের বাধার জন্য প্রথমতঃ গৃহত্যাগ করতে পারেননি, কিন্তু তাঁর মনে শান্তি ছিল না। একবার পর্বদিনে বাড়ীর সবাই সাজসজ্জা করে উৎসবে মেতেছেন কিন্তু শ্রেষ্ঠিকন্যা প্রতিদিনের মতো সাধারণ সাজেই গৃহকর্মে লিপ্ত আছেন দেখে, তাঁর স্বামী প্রশ্ন করলেন, "তুমি যে সাজলে না?" শ্রেষ্ঠিকন্যা বললেন, "আর্যপুত্র, এই দেহ বত্রিশ রকম শবোপাদানে পূর্ণ, একে সাজিয়ে কি হবে? এ দেবনির্মিত বা ব্রহ্মনির্মিত নয়, স্বর্ণ, মাণিক্য বা হরিচন্দন দিয়েও তৈরি নয়, পদ্মযোনি বা অমৃতসাহিত্যে নারী শ্রী ও সৃষ্টি গর্ভও নয়। এ পাপপুষ্ট, মরণশীল বাপ-মার শরীর থেকে উৎপন্ন, ক্ষণভঙ্গুর, এর ক্ষয় এবং বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এ দেহ কাচার- নিরত, দুঃখের আকর, পরিদেবনার হেতু, ব্যাধির মন্দির, কমের ক্ষেত্র, কৃমির বাসভূমি। শ্মশানভস্মের পরিমাণ বাড়ানোই এর কাজ। মরণের পর শ্মশানে

ফেলে দিলেই এর স্বরূপ লোকে বুঝতে পারে।” এর পর দীর্ঘ একটি দেহতত্ত্বের গাথা শুনিয়ে বললেন;“ভেবে দেখুন, এ রকম দেহ সাজিয়ে লাভ কি? .একে সাজানো আর মলভাণ্ডকে বাইরে চিত্রিত করে রাখা সমান কথা।” অতঃপর তাঁর স্বামী সংসারের প্রতি তাঁর বীতস্পৃহা দেখে তাকে প্রব্রজ্যা নে'বার অনুমতি দিলেন। দেবত্তের আশ্রমে ভিক্ষুণীদের যে উপায় ছিল, তিনি নিজে তাঁকে সেখানে রেখে এলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রেষ্ঠিকন্যা তখন সবে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন, তা তিনি নিজেই জানতে পারেননি। উপায়ে যাবার কিছুদিন পরেই তার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় দুনামের ভয়ে দেবদত্ত তাকে তাড়িয়ে দেন। দীর্ঘপথ পদব্রজে চ'লে নিরুপায় নারী শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের শরণাপন্ন হন। ভগবান্ বুদ্ধ অগ্রশাবিকা উৎপলবর্ণাকে দিয়ে তাকে পরীক্ষা করিয়ে ভিক্ষুণী- সঙ্ঘে স্থান দিলেন। এই শ্রমণ কালে অহত্ত্ব লাভ করেছিলেন। প্রসবান্তে তাঁর ছেলেটিকে রাজা প্রসেনজিৎ লালনপালনের জন্য রাজপ্রাসাদে নিয়ে যান। রাজকুমারদের সঙ্গে লালিত হওয়ায় তাকে সবাই কুমার কাশ্যপ বলে ডাকত। এই ভিক্ষু শ্রেষ্ঠের ধর্মজীবন এবং প্রতিভার জন্য তিনি তাঁর মা'র কাছে ঋণী।

বৌদ্ধযুগের আর কয়েকজন বিখ্যাত। মনস্বিনী নারী ভিলী ধর্মপালী, তার শিষ্যা সম্রাটকন্যা সঙঘমিত্রা, ভিক্ষুণী হেমা অগ্নিমিত্রা, সীবল, মহারুহা, অঞ্জলি, অনুলা এবং চারুমতী। অশোককন্যা সঙঘমিত্রা তথাগতের ধর্মের বাণী বহন করে ভারতের কল্যাণদূতীরূপে যেদিন সিংহলে উপস্থিত হলেন, সেদিন সৌভাগ্যক্রমে সিংহলের নারীর চিত্তক্ষেত্র তার ধর্মবীজ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল, সিংহলের রাজমহিষী অমুলা দেবী পাঁচশত সঙ্গীকে নিয়ে একদিনে বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষিত হলেন। ‘দীপবংশ’নামক সিংহলীগ্রন্থে সঘমিত্রা, হেমা এবং অগ্নিমিত্রাকে ত্রিবিধজ্ঞানপারদর্শিনী বলা হয়েছে। সীব এবং মহারুহা সুপণ্ডিতা ছিলেন, তারা বিনয় সূত্রপিটক এবং অভিধর্ম পড়াতেন। অশোকের আর এক কন্যা চারুমতী নেপালে বিহারস্থাপন করেছিলেন এবং বহু নারীকে ধর্মদীক্ষা দিয়েছিলেন। অঞ্জলিনাম্নী ভিক্ষুণী শাস্ত্রজ্ঞা এবং দৈবশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। মধ্য এসিয়ার কুচীরাজ্যের বিদুষী রাজকন্যা জীব। উত্তরভারতের এক পরিব্রাজক ভিক্ষু কুমারায়ণের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পতিরূপে বরণ করেছিলেন। তাদের যোগ্যপুত্র কুমারজীবের নাম সকলেই জানেন। জীব। দুই পুত্রের জন্মের পর সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষুণী হন। তাঁর শিক্ষায় কুমারজীব সাতবছর বয়সে বহু শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, কিন্তু কুচীরাজ্যের জ্ঞানভাণ্ডার ছেলের পক্ষে যথেষ্ট নয় মনে করে জীবা তাঁকে নিয়ে কাশ্মীরে আসেন। সেখানে শিক্ষা সমাপ্ত করে কুমারজীব কুচীতে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন, পরে চীনসম্রাটের আক্রমণে কুচীরাজ্য ধবংস হলে তিনি বন্দীরূপে চীন-রাজসভায় উপস্থিত হন। সেদিন থেকে ত্রিশবৎসর ধরে তিনি চীনের বৌদ্ধ পণ্ডিতদের দীক্ষাগুরু ছিলেন, বহু সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ সংস্কৃত থেকে চীনভাষায় অনূদিত করে তিনি ভারত এবং চীনকে এক ধর্মসূত্রে বেঁধেছিলেন। তার আগে এবং পরে বহু পণ্ডিত চীন দেশে গেছেন, কিন্তু সহস্রাধিক বৎসর ধরে যে সম্মান তিনি চীনে পেয়েছেন, আর কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তির ভাগ্যে সে রকম সম্মানপ্রাপ্তি ঘটেনি। এই মহাপুরুষের জীবনের সকল উন্নতির মূলে ছিল তাঁর বিদুষী বিদ্যানুরাগিণী মা জীবার অনলস পরিশ্রম এবং তাত্মত্যাগ।

বুদ্ধের সমসাময়িক মহাপুরুষ মহাবীরের ধর্মেও সে যুগের বহু বিদুষী নারী শান্তি এবং শেয়োলাভ করেছিলেন, জৈনসাহিত্যে তাদের অনেকের নাম এবং ধর্মকীর্তির উল্লেখ আছে। মহাবীরের মা ত্রিশলা ছিলেন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের শিষ্যা, মহাবীরের পত্নী যশোদাও তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং বহু নারীকে ধর্মপথে আকর্ষণ করেছিলেন। বৈশালীরাজ চেতকের মেয়ে চন্দন ছিলেন বিখ্যাত জৈনবিদুষী, তার অন্যান্য বোনদের মধ্যে বিম্বিসার-মহিষী চেল্লনা এবং কৌশাম্বী রাজমহিষী মৃগাবতী এবং মহাবীরের ভাই নন্দীবর্ধনের স্ত্রী জ্যেষ্ঠা এবং আর একবোন সুজ্যেষ্ঠ। মহাবীরের শিষ্য ছিলেন। তাঁদের সকলেরই পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। আনন্দের বোন শিবনন্দা ছিলেন বিখ্যাত জৈনধর্ম-প্রচারিকা। জৈন সন্ন্যাসিনীদের সাধারণতঃ 'সাধ্বী' বলা হয়, সুপণ্ডিত চন্দনা ছত্রিশ হাজার সাধ্বীর মধ্যে প্রধান ছিলেন। ঐ যুগের জৈনসন্ন্যাসিনীদের রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই; সুতরাং এখানে কোন কিছু উদ্ধৃত করা সম্ভব হল না। গুজরাত অঞ্চলে আজও বহু জৈন ভিক্ষুণী তাদের আদর্শ জীবন এবং ধর্মানুরক্তির জন্য জনসাধারণের সাহিত্যে নারী: অস্ত্রী ও সৃষ্টি সমস্যা হয়ে আছেন। মহাবীরের বহুপূর্বে যে সব তীর্থঙ্কর জন্মেছিলেন বলে জৈনদের বিশ্বাস, তাদের মধ্যে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের দুই ধোন ব্রাহ্মী এবং সুন্দরী, অন্যতম তীর্থঙ্কর অমরনাথের মা অযোধ্যারাজ সুদর্শনের মহিষী রাণী দেবী প্রভৃতি সুপণ্ডিত। জৈন নারীর নাম পাওয়া যায়। তীর্থঙ্কর অমরনাথের তিন লক্ষ বিশহাজার ভিক্ষুণী শিষ্যা ছিলেন বলে শোনা যায়। অবশ্য এই সব প্রাগৈতিহাসিক যুগের নারীদের সম্বন্ধে সত্যমিথ্যা নির্ণয় করা আজ সম্ভবপর নয়।

বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের প্রাবল্যের যুগেও সকল বিদুষীই কিছু আর সন্ন্যাসিনী হন নি, বিশাখা, সুজাতা প্রভৃতি ধর্মশীলা বিদুষী গৃহস্থ নারীর পরিচয় আমরা জাতকে এবং অন্যত্রও পাই। আবার ঈশ্বরদত্ত ধীশক্তিকে যাহারা পরের ক্ষতির জন্য কাজে লাগাতেন এমন মেয়েরও সে যুগে অভাব ছিল না। মগধেশ্বর নবম নন্দের মন্ত্রী শাকটালের সাতটি মেয়ে–যক্ষা, যক্ষদত্তা, ভূত, ভূতদত্তা, এণিকা, বেণা এবং রেণ শ্রুতিধরী ছিলেন। প্রথমা এক বার,দ্বিতীয়া দুই বার, তৃতীয়া তিন বার, এই ভাবে সপ্তম সাতবার কোনো কিছু শুনলে কণ্ঠস্থ করতে পারতেন। রাজসভায় নূতন কবিদের পুরস্কার দেবার প্রথা ছিল কিন্তু শাকটাল অন্যের সম্মান সহ্য করতে পারতেন না। তার ব্যবস্থা মতো সভায় কোনো নূতন কবিতা পড়া হলেই যক্ষা সেটির পুনরাবৃত্তি করতেন, কবির এবং যক্ষার আবৃত্তি শুনে যক্ষদত্তা, তাদের তিন জনের আবৃত্তি শুনে ভূতা, এইভাবে সাতজন মেয়ে যখন পরে, পরে কবিতাটি আবৃত্তি করতেন তখন সেটিকে পুরাতন এবং বহু প্রচলিত বলে উড়িয়ে দেওয়া হত। বিখ্যাত কবি বররুচি এই সাত বোনের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়েছিলেন বলে প্রবাদ আছে।

প্রাচীন যুগের বিদুষী নারীদের কথা বলতে হলে ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশের কথাও কিছু বলা দরকার। আজ থেকে পাঁচ ছ' হাজার বছর আগে মিশরের নারী পুরোহিতরা সুপণ্ডিত। এবং ভবিষ্যদ্বক্তী বলে বিখ্যাত ছিলেন। বহু সহস্র বৎসর ধরে

মিশরে এই পুরোহিতদের প্রাধান্য অক্ষুন্ন ছিল, দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডার এই রকম এক নারীর ভবিষ্যদ্বাণী শোনবার জন্য নিজের অভিযানের পথ ছেড়ে চারশ' মাইল মরুভূমি পার হয়ে উবাস্তি দেবীর মন্দিরে গেছলেন, সেই নারীর ভবিষ্যদ্বাণী তার ভবিষ্যৎ জীবনে সফল হয়েছিল।

সম্রাজ্ঞী টিয়ি তার স্বামীর এবং পুত্রের রাজত্বকালে এক বিরাট ধর্মান্দোলনের প্রবর্তন করে একেশ্বরবাদ প্রচলনের চেষ্টা করেন, পাণ্ডিত্যে এবং প্রতিভায় তাঁর সমসাময়িক কোনো পুরুষ তার সমকক্ষ ছিলেন না। আখেনাটনের রাজত্বকালে তিনি এবং তার পুত্রবধু নেকারতিতিই ছিলেন প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যের কর্ণধার; শিল্প সাহিত্যের উৎসাহদাত্রী হিসাবে তারা দুজনেই ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। সম্রাজ্ঞী হাটসেপসুট বা হাতা একদিকে রণকুশলা নেত্রী, অপরদিকে সুপণ্ডিত এবং বহু কলাবিশারদা। তাঁর সমাধি-মন্দিরের ছবিগুলিতে আমরা তাঁর জ্ঞানপিপাসার বহুতর প্রমাণ পাই, বিভিন্ন দেশ আবিষ্কার, বিভিন্ন জাতির সঙ্গে সংস্কৃতির আদান-প্রদান তাঁকে আনন্দ 'পণি' (ফিনিসীয়া) দের দেশে তার অভিযানের ছবিগুলি এদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য।

খৃষ্টের আড়াই হাজার বছর আগে আসিরিয়া সম্রাজ্ঞী সেমিরাসিস রূপে গুণে বীর্যে এবং পাণ্ডিত্যে অতুলনীয়া ছিলেন। পৃথিবীর দুর্ভাগ্যক্রমে তার অসীম শক্তি এবং অতিমানুষী প্রতিভা বিপথে পরিচালিত হয়ে লক্ষ লক্ষ লোকের দুঃখের কারণ হয়েছিল।

খৃষ্টের প্রায় তেরো শ বছর আগে এসিয়া মাইনরে ইলিয়াম নগরে বহু বিদুষী নারী ছিলেন, তন্মধ্যে রাজা প্রিয়ামের দুহিত। কাসত। ভবিষ্যদ্বক্তীরূপে বিখ্যাত ছিলেন। ট্রোকানেজের পরাজয় এবং ইলিয়াম নগরের পতন সম্বন্ধে তিনি বহু পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। গ্রীসদেশে ঐ যুগে নারী পুরোহিত, সম্ভ্রান্তবংশীয়া নারী এবং গণিকাদের মধ্যে বিদ্যা এবং কলাচর্চা ভারতবর্ষের মতোই প্রবল ছিল। পেরিক্লিসের প্রিয়তমা অস্পেসিয়া তার উপযুক্ত সঙ্গিনী ছিলেন, তাঁর পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্যবোধ এবং একনিষ্ঠ প্রেম পেরিক্লিসের প্রেরণার উৎস ছিল। এথেন্সের চরম গৌরবের দিনে শিল্পে স্থাপত্যে তার চরম উন্নতি ঘটেছিল নারীর প্রভাবে। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'সাফো নাম্নী এক বিদুষী নিস্ফল প্রণয় নামক একটি কবিতার বই লিখে একটি ছন্দের প্রবর্তন করে বিখ্যাত হন। প্রণয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ইনি পুরুষবিদ্বেষিণী এবং বিপথগামিনী হন। তাঁর কবিতার একটু উদাহরণ দিচ্ছি (প্রথম বয়সে) "মেয়েটি যেন একটি মিষ্টি আপেল, গাছের মগডালের শেষ বোঁটায় পেকে লাল টুকটুক করছে। লোককে ভুলিয়ে নিজেকে পাড়িয়ে তবে ছাড়ল! (পরে) পাহাড়ী রাস্তার ধারে ফুটে আছে—সে যেন একটি পাহাড়ী ফুল, রাখালদের পায়ের সাহিত্যে নারী: অস্ত্রী ও সৃষ্টি আঘাতে বারে বারেই সে কেঁপে কেঁপে উঠছে দারুণ ব্যথায়; শেষ পর্যন্ত পথিকের পায়ের চাপেই তার রঙের মায়া মাটিতে মিশিয়ে যাবে।"

রোমের প্রথম যুগের রাজা টাকুইনাস সিবিলা নাম্নী এক ভবিষ্যদ্বক্ত্রীর কাছে তাঁর লেখা তিনখানি বই কেনেন। গুলির সার্থকতা পরে জানা যায়, ধর্মমন্দিরে রোজ পূজার সম্মান দিয়ে রোমানরা সিবিলার বই ক'খানিকে চিরস্মরণীয় করে। যখন রাজ্যের মধ্যে কোনো বিষয়ে কোনো গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হত; তখনই রোমানরা সিবিলের বই থেকে তার সন্তোষজনক মীমাংসা পেতেন। প্রথম সিবিলের নাম থেকে ভবিষ্যদ্বী মাত্রই রোমে সিবিল উপাধি পেতেন।

খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নগর ছিল পশ্চিম এসিয়া, য়ুরোপ এবং আফ্রিকার জ্ঞানতীর্থ। শত শত বৎসর ধরে সহস্র সহস্র পণ্ডিতের আজীবন সাধনায় এই নগরীর বিরাট গ্রন্থাগারগুলি সুসমৃদ্ধ হয়েছিল। শেষ স্বাধীন সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার সময়ে আমরা মিশরদেশের পরিপূর্ণ দীপ্তির মধ্যে এক নারীকে দেখতে পাই।

ইতিহাসের অপূর্ব চরিত্র এই নারী! ক্লিওপেট্রার চরিত্রে বালিকার সারল্য এবং বয়োবৃদ্ধের বুদ্ধিবিদ্যার একত্র সমাবেশ ঘটেছিল।

দেবীর মতো রূপ এবং সাপের মতো কুটিলতা তাঁকে বহুজনপ্রিয় এবং সর্বজন-নিন্দিতা করেছিল, এখানে তার নৈতিক চরিত্র আলোচনা করে লাভ নেই, সুপ্রাচীন মিশর সভ্যতার শেষ সৃষ্টি হিসাবে, পাপপুণ্যবিজড়িত অতীত সংস্কৃতির প্রতীক হিসাবে আমরা তাকে শুধু বোঝবার চেষ্টা করব। খৃষ্টপূর্ব উনসত্তর অব্দে মিশরের টলেমি নামক গ্রীকরাজবংশে এই কন্যার জন্ম হয়। সেদিনের সব চেয়ে বড় অধ্যাপকরা তাকে শৈশব থেকে পড়িয়েছেন, সব চেয়ে বড় শিল্পীরা ছবি আঁকতে নাচতে গাইতে শিখিয়েছেন। কিন্তু শেখালেই সকলে সব কিছু শিখতে পারে না, গ্রহণ করবার শক্তি চাই। ক্লিওপেট্রার সেই অসামান্য গ্রহণশক্তি ছিল, আর ছিল লোকোত্তর প্রতিভা। চৌদ্দবছর বয়সে তার পাণ্ডিত্যখ্যাতি তার রূপের খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে, তার মধ্যেই তিনি আটটা ভাষায় অবলীলাক্রমে কথা বলতে পারতেন, রাজনীতির কূটতর্ক, দর্শনের গভীরতত্ত্ব, শিল্পকলার নিগূঢ় রহস্য নিয়ে অনায়াসে আলোচনা করতে পারতেন। সতেরো বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি ছোট ভাই টলেমির সঙ্গে একত্রে রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী হলেন। দু'জনে এক সিংহাসনে বসলেও স্বাধীন ভাবে রাজকার্য দেখতেন ক্লিওপেট্রাই। ক্রমে টলেমি বড় হয়ে ক্লিওপেট্রার রাজশক্তি কেড়ে নিলে, তিনি সিরিয়ায় গিয়ে সৈন্যসংগ্রহে নিযুক্ত হলেন। এই সময়ে পরাজিত পলায়মান 'পম্পি'কে অনুসরণ রোমের দিগ্বিজয়ী সেনাপতি জুলিয়াস সিজার মিশরে আসেন। এখানে অসামান্য রূপবতী ও কূটনীতিজ্ঞা সুশিক্ষিত ক্লিওপেট্রার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, পরিশেষে ক্লিওপেট্রা পরামর্শদাত্রীরূপে বিরাট সাম্রাজ্য শাসনে তাকে সাহায্য করতে থাকেন, সিজারের হত্যার পর তিনি স্বরাজ্যে ফিরে আসেন। অতঃপর নানারূপ অনাচার অনুষ্ঠানের পরিণামে ইচ্ছাকৃত সর্পদংশনে নিজেই নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। এত বড় একটা নারী-প্রতিভার এইরূপ নিদারুণ পরিণতি সত্যই পৃথিবীর দুর্ভাগ্য।

বর্বরের আক্রমণে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের জ্ঞানের প্রদীপ নির্বাপিত হয়, সেদিন যে, ক্ষতি হয়েছে, দু'হাজার বৎসরেও তার সম্পূর্ণ সম্পুরণ হ'ল না। সে যুগের বহু মনীষীর সঙ্গে বহু মনস্বিনীর কীর্তি এমন কি নাম পর্যন্ত আমরা সেদিন হারিয়ে ফেলেছি। হ'য়ে যে কয়েকজনের নাম আজও টিকে আছে, তাঁদের কথাই আমরা শুধু জানি এবং বলতে পারি। আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিওপেট্রার তিনশ' বছর পরে ক্যাথারিন নাম্নী এক বিদুষী তরুণী খৃষ্টধর্মানুরাগের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন।

সম্রাট ম্যাক্সিমিনিয়াসের নিষ্ঠুরতায় শত শত মানুষের মৃত্যু দেখে তিনি বিচলিত হন, এবং তাঁর বিরুদ্ধে দাড়ান। সম্রাটের সভায় সমবেত পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে হারিয়ে এই সুপণ্ডিতা নারী সম্রাটের বিরাগভাজন হন। খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করতে সম্মত না হওয়ায় তাকে নিষ্ঠুর নির্যাতনের পর হত্যা করা হয় (৩০৭ খৃষ্টাব্দে)। এই ব্রহ্মচারিণী বিদুষীকে পরবর্তী যুগের খ্রীষ্টানের ঋষি বলে সম্মানিত করেছেন চতুর্থ শতাব্দীতেই আর একজন অসামান্যা রূপসী এবং বিদুষী মিশরে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি পণ্ডিত থিয়নের কন্যা হাইপেসিয়া। এই পুণ্যশ্লোক। ক্যাথারিণা হাইপেসিয়া প্রভৃতি অনেকে খৃষ্টধর্মের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে আত্মোৎসর্গ করেন। ক্যাথারিণের আত্মদানের পর ইতিমধ্যে খৃষ্টধর্ম রোমকসাম্রাজ্যের রাজধর্মে পরিণত হয়েছে এবং নব ধর্মের ধর্মান্ধতা অতীতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য সব কিছু নির্মমভাবে ধ্বংস করতে আরম্ভ করেছে। আলেকজান্দ্রিয়ার সেই পতনের যুগে মিশরের প্রাচীন ধর্মের সেই চরম দুর্দিনে স্বজাতির প্রাচীন সভ্যতাকে এবং অধর্মের কল্যাণ-বাণীকে রক্ষার জন্য প্রবল শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে দাড়িয়েছিলেন হাইপেসিয়া। এই মহীয়সী নারী বক্তৃতার পর বক্তৃতায় মিশরবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন তাদের অতীত গৌরব, তাদের ধর্মের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। বোঝালেন সবাই যাকে ছেড়েছে তাকে ছাড়ার মধ্যে বাহাদুরী নেই। সেদিন নব ধর্মের পক্ষে সায় দিয়ে গেলে অর্থ এবং রাজদত্ত সম্মানে তাঁর জীবনে কিছু অভাব হত না। কিন্তু সাংসারিক সাচ্ছন্দ্য সম্মানকে তিনি তৃণজ্ঞান করতেন। তার অবহেলিত স্বধর্মের পক্ষ নিয়ে ধর্মান্ধ জনসমুদ্রের বিরুদ্ধে তিনি দাড়ালেন পর্বতের মতো উচ্চ শিরে। তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতায় ক্রমে জনমতের পরিবর্তন হচ্ছে দেখে, খৃষ্টান পুরোহিতের দল তাদের শিশুসুলভ যুক্তি-তর্ক নিয়ে তার বিরুদ্ধে দাড়াতে না পেরে শেষ পর্যন্ত কুটিল পথ আশ্রয় করলেন, ধর্মোক্ষ্মত্ত পশুপ্রকৃতির একদল লোককে লেলিয়ে দিলেন তাকে হত্যা করার হাইপেসিয়ার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড খৃষ্টধর্মের এবং খৃষ্টানজাতিকে কলঙ্ক কালিমা প্রলিপ্ত করেছিল।

এই যুগে পৃথিবীর আর একপ্রান্তে চীনদেশে বিদুষী নারীদের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু না বললে অন্যায় হবে। প্রাগৈতিহাসিক চীনের নারীতন্ত্র সমাজ সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছিল, সেখানে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মেয়েরা রাজসভার সভাসদ এবং রাজপুরুষদের দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হতেন, তার প্রমাণ আছে।

আজ থেকে প্রায় পৌনে পাঁচহাজার বছর আগে সম্রাট হোয়াংতি বিচ্ছিন্ন চীনকে একত্র করে ‘চীনজাতির জনক এবং ‘পীত সম্রাট’ উপাধি পান। এই সম্রাটের উপযুক্ত পত্নী লেইৎসু সর্বপ্রথম রেশম আবিষ্কার করে জগতের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। চীনের পরবর্তী যুগের বিদুষীদের মধ্যে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে স্থান সম্রাট চেংটির প্রিয়পাত্রী বিদুষী ‘প্যানচিয়ে-উ’র নাম উল্লেখযোগ্য। এক সময়ে সম্রাট একে অতিরিক্ত সম্মান দেবার জন্য রথে করে নিজের সঙ্গে নগর ভ্রমণে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেন “প্রাচীনকালে সম্রাটরা সুবিজ্ঞ মন্ত্রীদের নিয়ে ভ্রমণে যেতেন, নারী নিয়ে ভ্রমণে রাজমর্যাদা ক্ষুন্ন হবে। পরে অন্য রূপসী এবং বিদুষী এক নারীর মোহে সম্রাট তাঁকে অনাদর করায় ‘প্যান চিয়ে-উ’ সম্রাটকে একটি পাখার উপর এই কথাগুলি একটি সুন্দর কবিতায় লিখে পাঠান। “গ্রীষ্মবসানে হত-গৌরব শরৎকালের পাখার মতো আমি আজ অনাদৃত হয়ে পড়ে আছি। দিনগুলির মতো আমিও বেঁচে থেকেই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে গেছি।” শেষ বয়সে রাজমাতার সেবা এবং ধর্মচর্চায় তার দিন কাটে, তার সেই ‘শরৎকালের পাখা কথাটি চীনদেশে আজও অনাদৃতা নারীর সমর্থবোধক হয়ে আছে।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট ‘ট্শাও জুই'এর (২০৫-২৪০) রাজত্বকালে নারী-সভাসদ এবং রাজপুরুষ নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। সম্রাটের কয়েকজন প্রধান রাজকর্মচারী ছিলেন নারী। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত চীন রাজ্যের বিদুষী নারীরা শাসন, বিচার প্রভৃতি বিভাগে উচ্চ রাজপদ লাভ করতেন এবং জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন।

প্রাচীন কালে যে সব বিদুষী আরব নারীদের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের মধ্যে পালমিরার রাণী পূর্বদেশের সম্রাজ্ঞী জেনোবিয়ার নামই সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। তার সময়ে রোমের রাজসভার চেয়ে তাঁর সভায় অধিকসংখাক জ্ঞানী এবং গুণীর সমাবেশ হয়েছিল, তিনি নিজে জগতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের সঙ্গে জ্ঞানালোচনা করতে ভালো বাসতেন। সম্রাট অরেলিয়ানের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় জেনোরিয়ার পরাজয় এবং পালমিরার পতন হয়।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে চীনদেশে সম্রাট ‘ফুচিয়ান’ একসময় ‘টুটাও’ নামক এক রাজপুরুষকে কোনো অপরাধের জন্য তাতারের মরুভূমিতে নির্বাসিত করেন। ‘টুটাও’এর বিদুষী পত্নী ‘সু হুই’ তাঁর স্বামীর প্রবাস-দুঃখ ভোলাবার জন্য তাঁর নিজের অবর্ণনীয় বিরহবেদনাকে ছন্দোবদ্ধ একখানি কাব্যে ভাষাদান করেন এবং কাব্যখানি লোকমারফত টুটাওএর কাছে পাঠিয়ে দেন। চীনভাষা না জানায় এই ‘নব মেঘদূত’ থেকে কোনো উদাহরণ দিতে পারা গেল না।

ভারতবর্ষে আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কর্ণাটেশ্বরী বিজয়াঙ্কা সরস্বতীর অবতার এবং বৈদভী রীতির কবিতা রচনায় মহাকবি কালিদাসের সমকক্ষ বলে সম্মানিত

হয়েছিলেন। কবি চণ্ডালবিদ্যা সম্রাট বিক্রমাদিত্য এবং কালিদাসের সঙ্গে এক যোগে একটি কবিতা রচনা করে তার তৎকালীন প্রতিষ্ঠার এবং রচনাশক্তির উদাহরণ রেখে গেছেন।

এদের কথা পরে বলব।

কাশ্মীরে আনুমানিক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা তুঞ্জীনের মহিষী রণরা দেবী ছিলেন মহাপণ্ডিত এবং যোগসিদ্ধা।

রাজতরঙ্গিণীর লেখকের মতে তিনি দেবী ভ্রমরবাসিনীয় অবতার ছিলেন, দেহ ত্যাগ করে ভিন্ন দেহ ধারণ, মায়াদেহ সৃষ্টি প্রভৃতি অলৌকিক শক্তি বা বিভূতির অধিকারিণী ছিলেন বলে কাশ্মীরের রাজা প্রজা সকলের কাছে তিনি পূজনীয় ছিলেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পৃথিবীর নানা দেশে বহু বিদুষী নারীর আবির্ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে হিঙা নাম্নী বিদুষী পুণ্যবতী নারী (৬.৪-৬৮০) হুইটুবি মঠের প্রথম মঠাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অনুপম চরিত্র এবং অত্যদ্ভুত সাধনার জন্য খ্রীষ্টান জগৎ তাঁকে ঋষি বলে সম্মানিত করেছে।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের আর একজন সুপণ্ডিত। রাজবংশীয় নারী ছিলেন প্রভাকর বর্ধনের কন্যা কনৌজের রাণী রাজ্যশ্রী।

মালব ও গৌড়েশ্বরের আক্রমণে তার স্বামীর মৃত্যু হলে তিনি বন্দিনী হন, নানা কৌশলে বন্দিশালা থেকে পালিয়ে বিন্ধ্যারণ্যে গিয়ে তিনি চিতায় পুড়ে মরবার আয়োজন করছিলেন। সময় হর্ষবর্ধন এসে পড়ে তাঁকে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করেন। তার পর দিগ্বিজয়ী হর্ষকে উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য পরিচালনে সাহায্য করে, তাঁর সঙ্গে ধর্মালোচনায় যোগ দিয়ে এবং তার সকল সৎকর্মের অংশভাগিনী হ'য়ে এই পুণ্যবতী সম্রাট্‌ভগিনী ইতিহাসে বরণীয়া ও স্মরণীয় হয়ে আছেন।

চীন সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী বহু শাস্ত্রবিশারদ 'উহু' (৬২৫-৭০৫) এই শতাব্দীতেই পরমেশ্বর' উপাধি ধারণ করে দোর্দণ্ড প্রতাপে স্বাধীনভাবে সাম্রাজ্য শাসন করেছিলেন। তার জীবন বহুপাপে কলুষিত কিন্তু তার রাজনীতিক জ্ঞানের প্রাধান্য অস্বীকার করার উপায় নেই।

দাক্ষিণাত্যের মাহিষ্মতী নগরীর মণ্ডনমিশ্রের পত্নী উভয়ভারতীকে অষ্টম শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিদুষী ব'ললে অত্যুক্তি হবে না।

গত দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে ভারতে শঙ্করাচার্যের মতো দার্শনিক পণ্ডিত জন্মেছেন কিনা সন্দেহ। সেই মহাপণ্ডিতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত

মণ্ডনমিশ্র যখন অধ্যাত্মতত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হলেন, তখন সর্ববাদিসম্মতিক্রমে উভয়ভারতীর উপর জয়-পরাজয়ের মীমাংসার ভার পড়ল। কয়েকদিন তর্কের পর মণ্ডনমিশ্র পরাজিত হলে উভয়ভারতী অসঙ্কোচে সে কথা সর্ব সমক্ষে ঘোষণা করলেন, তারপর নিজে শঙ্করের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামলেন। শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলেও এই বিদুষী নারীর গৌরব-দীপ্তি সেই পরাজয়ে কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয়নি।

এই যুগের যে সমস্ত নারী সংস্কৃতে কবিতা রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনার পূর্বে অন্যান্য ভাষার এবং অন্যান্য দেশের সাহিত্যিকা এবং বিদুষীদের কিছু কিছু পরিচয় দিয়ে নিতে চাই।

আরবে ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্বে স্ত্রীশিক্ষার অভাব থাকলেও স্ত্রীস্বাধীনতার অভাব ছিল না, জেনোবিয়া প্রভৃতি মেয়ের রাজ্যশাসন করতেন, সাজা প্রভৃতি বিদুষী ধর্মপ্রচার করতেন, মধ্যে মধ্যে এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই।

মুসলিম রাজত্বের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীস্বাধীনতা কিছু কমল বটে কিন্তু পারস্য, ভারত, মিশর, নোম প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে সংস্পর্শে এসে আরবজাতির জ্ঞানস্পৃহা বাড়ল, ফলে স্ত্রীশিক্ষারও উন্নতি হ'ল। সপ্তম শতাব্দীতে হজরত মোহম্মদের কন্যা জোহরা, হজরতের কনিষ্ঠা পত্নী আয়শা এবং তার ভগ্নি এসম, হোসেনের কন্যা সকীন প্রভৃতি সুকবি এবং বিদুষী ছিলেন। তাঁরা প্রকাশ্য সভায় কবিতা পড়তেন এবং শাস্ত্র আলোচনা করতেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শেখা শুহ,দা বাগদাদ নগরে ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিতেন। এই সময়ে মুসলিম জগতের অদ্বিতীয়া ধর্মনেত্রী এবং সাধিকা তপস্বিনী রাবেয়া বা নগরে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ধর্মদীক্ষা দিয়েছেন। তাঁর মুখে ধর্মোপদেশ শোনবার জন্য যেমন জনসাধারণের আগ্রহের অন্ত ছিল না, তেমনি তিনিও নিরলস ভাবে চিরদিন জ্ঞানের সাধনা করতে ত্রুটি করেন নি, সাধকবর হোসেন বাস্ত্রীয় ধর্মসভায় নিয়মিত জিজ্ঞাসু রূপে উপস্থিত থাকিতেন। সামান্য ক্রীতদাসী থেকে নিজের চেষ্টায় আত্মোন্নতি করে চরিত্রের এবং সাধনার বলে রাবেয়া মুসলিম জগতের প্রণম্যা এবং সর্বদেশের সর্বকালের প্রকৃত ধর্মপ্রাণ নরনারীদের মধ্যে অন্যতম। বলে স্বীকৃত হয়েছেন।

মৌর্যযুগ থেকে মুসলমান রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত দেড় হাজার বছর ধরে বন্ধু নারী ভারতবর্ষের ধর্মে সাহিত্যে এবং কাব্যে তাদের দান রেখে গেছেন। তাদের মধ্যে প্রাথমিক যুগের বৌদ্ধনারীদের রচনা পালিতে এবং পরবর্তী যুগের হিন্দু বৌদ্ধ অধিকাংশ বিদুষী নারীর রচনাই সংস্কৃতে পাওয়া যায়।

সংস্কৃত কবিদের রচনার নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া গেলেও তাঁদের অনেকেরই সময় নির্ধারিত হয়নি, সুতরাং তাদের কথা পরে একসঙ্গে আলোচনা করব।

হিন্দু বৌদ্ধ যুগে যারা অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় কবিখ্যাতি লাভ করেছেন তাদের সম্বন্ধে তৎপূর্বে দু'এককথা বলা দরকার। ভারতবর্ষের অ-সংস্কৃত দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যে তামিল ভাষার ইতিহাস খুব প্রাচীন। তামিল দেশে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ধর্মগুরুদের নাম ছিল আলোয়ার। এই আলোয়ারদের মধ্যে একমাত্র নারী আলেয়ার আণ্ডাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শ্রীবিল্লিপুটুর মন্দিরের পূজারী সুকবি পেরিয়া আলোয়ারের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন।

আণ্ডাল শিশুকাল থেকেই ধর্মপ্রাণা ছিলেন, নারায়ণকে পতিরূপে বরণ করে তিনি চিরকৌমারব্রত গ্রহণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণুমন্দিরে দেহত্যাগ করেন। তাঁর কবিত্বের খ্যাতি এক দিন তাঁর সাধনার খ্যাতির সঙ্গে সমভাবে দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। তাঁর কবিতার একটি উদাহরণ দিচ্ছি; সমাজের তাড়নায় তাঁর পিতা তাঁর বিবাহ দেবার উদ্যোগ করছেন শুনে তিনি এই কবিতাটি লিখেছিলেন? “বৈদিক ব্রাহ্মণের যজ্ঞের হবি মরুচারী শৃগালের দ্বারা দুষিত হওয়ার মতো আমার এই যৌবন পুষ্পিত শঙ্খচক্রধারী প্রভুকে উৎসর্গিত অর্ঘ্যরূপ এই দেহ, কোনো মর্ত-মানবের সঙ্গে বিরাহ সম্বন্ধে বদ্ধ এবং কলুষিত হবার পূর্বেই,—এমন কি তার কথা উঠলেই,হে মন্মথ, আমার যেন মৃত্যু হয়। বলা বাহুল্য, তাঁর সমাজের লোক তাঁর ভক্তির এবং বৈরাগ্যের অকৃত্রিমতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিল এবং জীবিত অবস্থাতেই তার সাধনার মাহাত্ম্য স্বীকার করে তাঁকে ঋষি বা ‘আলোয়ার’ পদে বরণ করেছিল। তামিল জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ ‘কুরাল’এর লেখক সাধকপ্রবর তিরুবল্লভনের আবির্ভাবের সময় নিয়ে মতভেদ আছে, তবে তিনিও অষ্টম নবম শতাব্দীর মধ্যে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমিত হয়। তার উপযুক্ত ভগ্নী ‘অভভেই এই যুগের সুলেখিকা ছিলেন। তাঁর লেখা ‘অত্তিসুদ্দি’ (আত্মশুদ্ধি) এবং কোরেইভেইদান্ নামক নীতিবাক্য এক সময়ে খুব প্রসিদ্ধ ছিল, আজও মাদ্রাজ প্রদেশে অনেক বিদ্যালয়ে এর কোনো কোনো অংশ পড়ানো হয়।

নবম শতাব্দীতে চীনসম্রাট টেংশুর সময়ে পাঁচটি বোন অলৌকিক সৌন্দর্য এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে চারজন সম্রাটের মহিষী হন, অন্যতম ‘সুংজোচাও' চিরকৌমার্য এবং চির দারিদ্র্যের ব্রত নিয়ে জ্ঞানচর্চায় জীবন কাটিয়ে চীনবাসীর স্মৃতির অমরাবতীতে স্থান লাভ করেন।

নবম শতাব্দীতে ইংলণ্ডেশ্বর অ্যালফ্রেডের মা ‘অস্বার্গা' বিদুষী এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায় অ্যালফ্রেড, সেই অ-শিক্ষার যুগে শিক্ষিত এবং সুশাসকরূপে খ্যাতি লাভ করেন। দশম শতাব্দীতে স্পেনে দ্বিতীয় হাকাম নামক একজন রাজা ছিলেন, তার মতো বিদ্যোৎসাহী মুসলমান নরপতি মুসলমানদের মধ্যে খুব কমই জন্মেছেন।তাঁর রাজত্ব কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে চারলক্ষ হাতে লেখা পুঁথি তার পুস্তকাগারে বহুব্যয়ে সংগৃহীত হয়েছিল। এই পুথি সংগ্রহের কাজে তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন বহু শাস্ত্রবিশারদা এবং সুগায়িকা ‘কাফফা। তিনি হাকামের বিদুষী কার্য সম্পাদিকা (সেক্রেটারী) ছিলেন, তাঁর রচনামাধুর্য, অঙ্কশাস্ত্র, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে

প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য হাকামকে মুগ্ধ করে। ছিল। সুকবি ফাতেমা, লেখিকা আয়শা এই সময়ে স্পেনদেশে আরবী সাহিত্যে সুসাহিত্যিক। বলে খ্যাতি লাভ করেন। সুপণ্ডিত নরপতি হাকামের সব চেয়ে প্রিয়পাত্রী ছিলেন 'রজিয়া' নাম্নী এক অসামান্য প্রতিভাশালিনী বিদুষী, হাকাম তাঁকে সৌভাগ্যসেতারা' উপাধি দিয়েছিলেন। সেভিল নগরে মরিয়ম নাম্নী এক বিদুষী বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েকে বিবিধ বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। একাদশ শতাব্দীতে সেভিলরাজ "মুতামিদ' 'রূমাইকীয়া নাম্নী এক ক্রীতদাসীর কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'জয়নাব-উম্মুল-মুয়াইয়েদ আরবদেশে ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞা রূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। শতাব্দীর শেষদিকে সুলতান সালাউদ্দীনের রাজত্বকালে আবুলফরোজ দুহিতা 'তকীয়া' "হাদীশ" সম্বন্ধে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিতেন এবং সুললিত ভাষায় কবিতা রচনা করতেন।

ভারতবর্ষে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাকতীয় রাজকন্যা রুদ্রাম্বা স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করে গেছেন। তিনি নিজে সুপণ্ডিত এবং রাজনীতিজ্ঞা ছিলেন। তাঁর উৎসাহে তাঁর রাজ্যে ধর্মচর্চা, জ্ঞানচর্চা, কলাচর্চা এবং শক্তিচর্চা সমভাবেই প্রজাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল।

তুরস্কের বর্বরদল পারস্যে এবং এসিয়া মাইনরে রাজ্যবিস্তার করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার প্রাচীন সভ্যতার সংস্পর্শে এসে জ্ঞানচর্চার মাহাত্ম বুঝতে শিখল। প্রাথমিক তুর্কী লেখকের কেউ কেউ আরবের ভাষা গ্রহণ করেছিলেন, আরবী অক্ষর অনতিকাল পূর্বেও তুর্কী সাহিত্যের বাহন ছিল, কিন্তু পরবর্তী যুগের তুর্কী-সাহিত্যে পারস্যের প্রভাব খুব বেশী। তুর্কনারীদের মধ্যে বোরখার প্রচলন ছিল, অনতিকাল পূর্ব পর্যন্ত তাঁদের স্বাধীনতা ভারতবর্ষের হিন্দুযুগের নারীদের চেয়ে অনেক কম ছিল, তবু ভারতীয় মুসলিম নারীর মতো কঠিন অবরোধপ্রথা তুরস্কে কোনো দিনই ছিল না।

তুর্কী নারী লেখিকাদের মধ্যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে জয়নাব ও মিহরী খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে লায়লা, ফিৎসেহানুম, আমিনা হানুম, হফেৎ হানুম প্রভৃতি সুকবি এবং সুলেখিকা বলে বিখ্যাত হয়েছেন।

ভারতবর্ষে পাঠান মোগল প্রভৃতি বিভিন্ন নামে প্রধানতঃ তুর্কী-রাজগণই রাজত্ব করেছেন, তাঁরা রাজসভায় এবং দৈনন্দিন জীবনে অনেকেই ফারশী ভাষা ব্যবহার করতেন, হিন্দু প্রজাদের সঙ্গে কথোপকথনের সুবিধার জন্য 'উদু" নামক মিশ্র ভাষাও ব্যবহৃত হত। ঐ যুগের মুসলমান নারী-কবিরা অধিকাংশই ফারশী ভাষায় তাঁদের প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁদের কথা ব'লবার পূর্বে তাদের পূর্ববর্তিনী সংস্কৃত ভাষার লেখিকাদের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে বুদ্ধ এবং মহাবীরের সময়ে এবং তাদের অনতিকাল পরে যে ধর্মোন্মাদনা এসেছিল, ক্রমে তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মানুষের মনে পরলোকের এবং ধর্মের চিন্তা কমে এল। যবন, শক, হুন প্রভৃতি বিদেশী বর্বর জাতিদের আক্রমণে নির্যাতিত এবং বারংবার বিড়ম্বিত হয়ে জনসাধারণ অহিংসাধর্মের প্রতি ক্রমেই শ্রদ্ধা হারাচ্ছিল, শুঙ্গ, কথ এবং গুপ্তরাজগণের অভ্যুদয়ে হিন্দুধর্ম এবং সংস্কৃত ভাষার পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেশে শক্তি চর্চা, আশা ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে নিয়ে এল বটে, কিন্তু সাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রাণতা পূর্বের পরিমাণে ফিরল না। সস্কৃত নারীকবিদের অধিকাংশ রচনাই পার্থিব প্রেমের জয়গানে এবং প্রকৃতি বর্ণনায় এবং দেব বন্দনায় পরিপূর্ণ। এই বস্তুতান্ত্রিকতার আদর্শ সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মের চরম উন্নতির দিনেও লুপ্ত হয়নি, সে যুগেও তিষ্যরক্ষিতা, চিঞ্চা, মালবিকাদের অস্তিত্ব থেকে প্রমাণ হয়, ‘মহেন্দ্রের তপোভঙ্গদূত’ এবং স্রষ্টার চক্রান্ত মানবের মুক্তিচেষ্টার রুদ্রতপস্যার পাশে পাশেই সেদিনও সুযোগ অন্বেষণে ফিরছিল, যথাকালে সে আবার আত্মপ্রকাশ করে বহু শতাব্দীর সাধনাকে ভূমিসাৎ করল। মুসলমান-পূর্ব যুগে যে সব ভারতীয় বিদুষী সংস্কৃতে কাব্য রচনা করে গেছেন তাদের মধ্যে ধর্মপ্রবণতার একান্ত অভাব দেখা যায়। অবশ্য দেড় হাজার বছর ধরে ভারতীয় নারী ধর্মচিন্তা ছেড়ে দিয়েছিল, এ কথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। সে দিনও বৌদ্ধ এবং জৈন বিহারে লক্ষ লক্ষ ভিক্ষুণী বাস করছিলেন এবং ধর্মালোচনা করছিলেন তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে, উভয় ভারতীর মতো মনস্বিনী হিন্দু নারীরা সে দিনও বিরাজিত ছিলেন। দেশে অধ্যাত্ম-বিদ্যার নিয়মিত চুচ্চা না থাকলে উভয়ভারতীর মতো মহাপণ্ডিতার উদ্ভব সহসা সম্ভব হয় না। বিদেশী আক্রমণে এবং গৃহবিবাদে বৌদ্ধ এবং হিন্দু বিদ্যাপীঠগুলির ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এই যুগের ধর্মপ্রাণ। লেখিকাদের নাম পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে বলেই মনে হয়; রাজসভার সঙ্গে সংশ্লিষ্টা এবং অত্যধিক জনপ্রিয় নারী কবিদের সন্ধানই কেবলমাত্র আমরা বিভিন্ন ‘সুভাষিতাবলী’তে পাচ্ছি। যাই হোক্, যাদের কথা আমরা জানি, তাঁদের কবিত্বশক্তি, ভাবের গভীরতা এবং ভাষার মাধুর্য দিয়েই তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁদের মহত্ত্বের বিচার করবার চেষ্টা করব।

পালিভাষার নারী-কবি ‘থেরী’দের কবিতা এবং পরবর্তী সংস্কৃতভাষার নারী-কবিদের কবিতার মধ্যে সব চেয়ে বড় তফাৎ, থেরীরা শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন এবং ইহ-পারলৌকিক মুক্তি-প্রচেষ্টার ইতিহাসকেই তাদের লেখার বিষয়বস্তু করেছেন। অপরদিকে পরবর্তী যুগের নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মপরিচয় সম্পূর্ণ গোপন করে নানা বিষয়ে নানা বিচিত্র বর্ণনায় তাদের যুগের দৃষ্টিভঙ্গী এবং আশা আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিয়ে অতীত ভারতের একটা সর্বাঙ্গ সুন্দর উজ্জ্বল নারীরূপ অনাগত মানবের জন্য রেখে গেছেন। অনুদার গভীরতার এবং ঔদার্যপূর্ণ চাপল্যের পরিচয় এই দুই যুগের সাহিত্যের বিশেষত্ব ব’ললে অত্যুক্তি হবে না। এর মধ্যে আর একটা প্রধান দ্রষ্টব্য এই যে বুদ্ধ মহাবীর থেকে আরম্ভ করে শঙ্করাচার্য প্রভৃতি ভিক্ষু ও সন্ন্যাসীরা অনেক স্থলে নারীজাতিকে সমগ্রভাবে মুমুক্ষু পুরুষকে প্রলুব্ধ করার জন্য যথেচ্ছ অপবাদ দিয়েছেন, কিন্তু থেরীরা বা সংস্কৃত নারীকবির কারণসত্ত্বেও একের দোষে অন্যকে এবং সমগ্র পুরুষ জাতিকে কখনও সে ভাবে আক্রমণ করেন নি। এই একদেশদর্শিতার অভাব তাঁদের

স্বভাবগত সংযম এবং সংস্কারগত ধৈর্য ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয়। কোনো মোহে এবং কোনো উত্তেজনায় তাঁরা নিজেদের এই চরিত্রগত মাহাত্ম্য এবং চিরাচরিত প্রথা যেন ত্যাগ না করেন।

উপনিষদের ও বৌদ্ধযুগের জ্ঞানমার্গের জটিলতা ছেড়ে ভারতবর্ষের ধর্মগুরুরা যখন প্রধানতঃ ভক্তিমার্গ আশ্রয় করলেন, জনসাধারণের চিত্ত যখন জ্ঞান-বুদ্ধির অনধিগম্যের সন্ধানে ব্যর্থ ভ্রমণের দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে মনোমত দেবতাকে পূজা নিবেদন ক'রে তৃপ্ত ও শান্ত হ'ল, সেই যুগের অর্থাৎ হিন্দুরাজত্বের শেষদিকের এবং মুসলমান রাজত্বকালের সংস্কৃত নারীকবিরা শিব, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, মীনাক্ষী প্রভৃতি দেবদেবীর বন্দনা গেয়ে আবার নিজেদের সত্য পরিচয় অর্থাৎ ধর্মপ্রাণতার পরিচয় দিয়েছিলেন, এও আমরা দেখতে পাব। নারীর মন স্বভাবতঃই পুরুষের চেয়ে বস্তুতান্ত্রিক, ধরবার ছোঁবার জিনিষ না পেলে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই মন জোর পায় না, রচনায় দানা বাঁধে না। এও সম্ভব যে প্রথম দিকের নারীকবিদের লেখায় সে যুগের বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রের জটিলতা ধর্মালোচনায় বাধা দিয়ে থাকতে পারে।

অতি প্রাচীন যুগের কোনো নারীর লেখা সম্পূর্ণ কাব্য আমরা পাইনি, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 'বচনসমুচ্চয়' 'সুভাষিত সংগ্রহ' 'সদুক্তি সংগ্রহ' প্রভৃতি থেকে এবং রাজশেখর দণ্ডী প্রভৃতি আলঙ্কারিকের লেখা থেকে আমরা তাঁদের কথঞ্চিৎ পরিচয় মাত্র পাই। সেই সব কয়েক ছত্র ক'রে লেখা নিশ্চয়ই তাঁদের সমস্ত লেখার শতাংশের একাংশও নয়, তবু সেই কয়েক ছত্রেই তাঁদের শক্তির সম্বন্ধে আমাদের নিঃসংশয়িত করে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিস্মিতও করে থাকে। এই নারীকবিদের মধ্যে কাল হিসাবে 'চণ্ডাল-বিদ্যার' নাম সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। তিনি নিঃসন্দেহ কালিদাসের যুগে জন্মেছিলেন, সেই যুগ খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতেই হোক্, আর খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতেই হোক্। 'চণ্ডালবিদ্যা' মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছিলেন। নিম্নলিখিত কবিতাটি তিনি, কালিদাস এবং বিক্রমাদিত্য একযোগে লিখেছিলেন ব'লে প্রসিদ্ধি আছে:

"ক্ষীরোদাম্ভসি মজ্জতীব দিবসব্যাপারখিন্নং জগ-
ত্তৎক্ষোভজ্, জলবুদ্বুদা ইব ভবন্ত্যালোহিতাস্তারকাঃ।
চন্দ্রঃ ক্ষীরমিব ক্ষরত্যবিরতং ধারাসহস্রোৎকরৈ
রুদ্গ্রীবৈ স্তৃষিতৈরিবাদ্য কুমুদৈঃ জ্যোৎস্নাপয়ঃ পীয়তে॥"

কবিতাটির বিষয়বস্তু 'জোৎস্না' বর্ণনা, সারাদিনের কেনাবেচার পরিশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে জগৎ যেন ক্ষীরসমুদ্রে স্নানে নেমেছে তাতে ক্ষুব্ধ সমুদ্রে ফেন বুদ্বুদের মতো রক্তাভ তারকারা দেখা দিয়েছে। চন্দ্র তার সহস্র কিরণ দিয়ে যেন অবিরত সহস্র ধারায় ক্ষীর হ'য়ে ঝরে পড়ছে, আজ রাত্রে উদ্গ্রীব তৃষিত কুমুদেরা যেন জ্যোৎস্নার দুগ্ধ পান করছে।' চণ্ডালবিদ্যার নাম যে বিক্রমাদিত্য এবং কালিদাসের সঙ্গে একত্রে উচ্চারিত

হ’ত, এতেই আমরা তাঁর শক্তির এবং প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাই। দুর্ভাগ্যক্রমে এঁর লেখা বেশী পাওয়া যায় না।

পরবর্তী যুগের অধিকাংশ কবিরই সময় স্থির হয়নি, তাঁদের অনেকের কবিতা খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্বে এবং অনেকের কবিতা ত্রয়োদশ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত কেবল এইটুকু জানা যায়। যাঁদের সময় নিশ্চিত জানা যায় তাঁদের ছাড়া আর সকলেরই কবিতা খৃষ্টের প্রথম সহস্রাব্দীতে রচিত বলে ধরলে খুব ভুল হবে না। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের পূর্বে লেখা ফল্গুহস্তিনী’র ‘দৈব’ নামে কবিতাটি উল্লেখযোগ্য:

‘সৃজতি তাবশেষগুণাকরং পুরুষরত্নমলঙ্করণম্ভুবঃ।
তদনুতৎক্ষণভঙ্গি করোতি চেৎ অহহ কষ্টমপণ্ডিততা বিধেঃ॥’

“ঈশ্বর পুরুষরত্নকে জগতের অলঙ্কার এবং অশেষ গুণের আকর ক’রে সৃষ্টি করেন তারপরেই আবার তাকে নষ্ট করেন, বিধাতার এই নির্বুদ্ধিতা বড়ই কষ্টকর।” সপ্তম অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মধ্যে শীলা-ভট্টারিকা, বিজ্জকা প্রভুদেবীলাটি, বিকট-নিতম্বা প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত নারী কবির নাম পাওয়া যায়। শীলা ভট্টারিকা মহারাজ মিহিরভোজের সভায় ছিলেন এবং রাজার সঙ্গে পাশা খেলতে ব’সে তিনি যেভাবে তাঁকে বিদ্রুপ করতেন, তাতে তাঁর সঙ্গে রাজার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা সূচিত হয়। শীলার বিখ্যাত কবিতা ‘অসতী’ অনেকেই শুনে থাকবেন:

যঃ কৌমারহরঃ স এব বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ[৩] প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি চৌর্যসুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥’

বিজ্জকা, বিজ্জা বা বিজ্জিকা চন্দ্রাদিত্যের পত্নী বিজয় ভট্টারিকা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, তবে তিনি যে অষ্টম নবম শতাব্দীর মধ্যেই জন্মেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর বহু কবিতা পাওয়া যায়, তার মধ্যে যেটিতে তিনি বিদ্যার দম্ভে নিজেকে সাক্ষাৎ সরস্বতী বলে দাবী করেছেন, সেটিই সব চেয়ে উপভোগ্য, কবিতাটি এই:

নীলোৎপলদলশ্যামাং বিজ্জকাং মাম্ অজানতা।
বৃথৈব দণ্ডিনা প্রোক্তং ‘সর্বশুক্লা সরস্বতী॥’

“আমি বিজ্জকা, আমি নীলোৎপলের পাপড়ির মতো শ্যামবর্ণা, আমাকে জানতেন না ব’লেই দণ্ডী বৃথাই সরস্বতীকে সর্বশুক্লা ব’লে বর্ণনা করেছেন।” এই শ্যামবর্ণা

সরস্বতীটির বহু বিভিন্ন বিষয়ে লেখা কবিতা পাওয়া যায় তার মধ্যে আর একটি এই:

প্রিয়সখি বিপদ্দণ্ডপ্রান্তপ্রপাত-পরম্পরা-
পরিচয়চলে চিন্তাচক্রে নিধায় বিধিঃ খলঃ।
মৃদমিব বলাৎ পিণ্ডীকৃত্য প্রগল্ভকুলালবৎ
ভ্রময়তি মনো নো জানীমঃ কিমত্র করিষ্যতি॥'

"প্রিয় সখি, আমার মনটাকে নিয়ে জোরকরে মাটির তালের মতো পাকিয়ে খল বিধাতা প্রগল্ভ কুমোরের মতো চিন্তার চাকায় রেখে বিপদের কাঠির ডগার ধাক্কা দিয়ে অবিশ্রান্ত ঘোরাচ্ছে, এ থেকে কি তৈরী করবে জানিনা।" বিজ্জকার সম্পূর্ণ কোনো কাব্য পাওয়া যায়নি।

কর্ণাটের রাণী বিজয়াঙ্কাকে জনশ্রুতি কালিদাসের সমসাময়িক ব'লে নির্দেশ করে, যদিও তার কোনো প্রমাণ নেই। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্বে যে কোনো সময়ে তিনি জন্মেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে জন্মতিথি তাঁর যে কোনো তিথি নক্ষত্রেই হোক্; বৈদর্ভী রীতির রচনায় তাঁকে মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে সমান আসন দিতে এবং সরস্বতীর অবতার ব'লে ঘোষণা করতে সেকালের আলঙ্কারিকরা দ্বিধা করেননি। তাঁর লেখা কোনো সুভাষিত সংগ্রহে পাওয়া যায় না, তবু লোকমুখে কয়েকটি কবিতা আজও তাঁর নামে চ'লে আসছে। উদাহরণস্বরূপ একটি উদ্ধৃত করছি:

"একোঽভূল্লিনাৎ পরস্তু পুলিনাৎ বল্মীকতশ্চাপরঃ।
তে সর্বে কবয় স্ত্রিলোকগুরবস্তেভ্যো নমস্কুর্মহে॥
অর্ব্বাঞ্চো যদি গদ্যপদ্যরচনৈশ্চেতশ্চমৎকুর্বতে।
তেষাং মূর্ধ্নি দদামি ধামচরণম্ কর্ণাট-রাজ-প্রিয়া॥"

অষ্টম-নবম শতাব্দীর পূর্বজাতা কবিদের মধ্যে 'বিকট-নিতম্বা' নাম্নী এক কবি বহু বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা লিখে গেছেন, প্রকৃতি বর্ণনা থেকে অশ্লীল আদিরসের কবিতা পর্যন্ত তিনি বাদ দেননি। তাঁর রুচিজ্ঞানের বা যাঁরা তাঁর নাম রেখেছিলেন তাঁদের রুচিজ্ঞানের প্রশংসা করা যায় না, তবু তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রশংসা না ক'রে উপায় নেই! তাঁর লেখার মধ্যে তাঁর স্বামীর মূর্খতাজ্ঞাপক নিম্নলিখিত শ্লোকটি বিখ্যাত:

"কালে মাষং শস্যে মাসং বদতি শকাসং যশ্চ সকাশম্।
উষ্ট্রে লুম্পতি ষং বা রং বা, তস্মৈ দত্তা বিকট-নিতম্বা॥"

অর্থাৎ বিদুষী বিকট-নিতম্বা এমন লোকের হাতে পড়েছেন, যিনি ‘মাস’কে ‘মাষ’, ‘মাষকলাই’কে ‘মাস’, ‘সকাশ’কে ‘শকাস’ বলেন, যিনি উষ্ট্র বলতে কখনও উষ্ট, কখনও উট্র বলেন। তাঁর হাতে পড়ে বিদুষী কবির লজ্জার অবধি ছিল না, কিন্তু আজ পাঠক পাঠিকার সহানুভূতি স্বভাবতঃই পাণ্ডিত্য-গর্বিতা পত্নীর চেয়ে স্বামীর দিকেই বেশী আকৃষ্ট হয়। এই কবিতার পাঠান্তর কালিদাসের পত্নী ‘নিবিড়-নিতম্বা’ রাজকন্যা বিদ্যোত্তমার নামেও প্রচলিত আছে, সম্ভবতঃ সেটি পরবর্তী যুগের রচনা। বিদুষী রাজকন্যা কমলার (বিদ্যোত্তমার) ঐতিহাসিক অস্তিত্বের কোনো নিদর্শন নেই।

এঁদের পর খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যে আমরা সরস্বতী, সীতা, ত্রিভুবনসরস্বতী এবং সিন্নস্মার রচনা পেয়েছি। কামলীলা, কনকবল্লী, ললিতাঙ্গী, মধুরাঙ্গী, সুনন্দা, বিমলাঙ্গী এবং প্রভুদেবী লাটীর নাম ইতিপূর্বে বা এই সময়ে পাওয়া গেলেও তাঁদের কোনো রচনা পাওয়া যায়নি। লাটী অর্থাৎ গুজরাত দেশীয় প্রভুদেবীই এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন, আলঙ্কারিক রাজশেখর তাঁর কবিত্বের এবং পাণ্ডিত্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন[৪] বলেছেন, ‘তিনি মৃত্যুর পরেও তাঁর কীর্তির জন্য মানুষের হৃদয়ে অমর হ’য়ে আছেন’। তাঁর লেখা নিঃশেষে বিলুপ্ত হ’য়ে যাওয়ার কারণ যাই হোক্, এই ক্ষতিকে সংস্কৃত সাহিত্যের দুর্ভাগ্য ব’লতে হবে। সরস্বতী দেবীর কবিতার একটি উদাহরণ দিচ্ছি:

“পত্রাণি কণ্টক-দুরাসদানি বার্তাহপি নাস্তি
মধুনো রজসান্ধকারঃ।
আমোদমাত্র-রসিকন মধুব্রতেন নালোকিতানি
তব কেতকি দূষণানি॥”

“ওগো কেতকি, তোমার পাতার সহস্র কাঁটা কাউকে কাছে ঘেঁসতে দেয় না, রেণুতে অন্ধকার তোমার দেহে মধুর খোঁজ পর্যন্ত নেই। ভ্রমর কেবল সুগন্ধ রসের রসিক বলেই তোমার এত দোষ দেখেও দেখে না।”

কবি সীতার দ্ব্যর্থবোধক কবিতাটিতে এক অর্থে চন্দ্রকে উদ্দেশ ক’রে এবং অপর অর্থে ভীরু প্রণয়ীকে উদ্দেশ ক’রে বিদগ্ধ বনিতার উক্তি পাওয়া যায়:

“মাভৈঃ শশাঙ্ক মম সীধুনি নাস্তি রাহুঃ।
খে রোহিণী বসতি কাতর কিং বিভেষি॥
প্রায়ো বিদগ্ধবনিতা-নব-সঙ্গমেষু।
পুংসাং মনঃ প্রচলতীতি কিমত্র চিত্রম্॥”

"হে শশাঙ্ক, তুমি ভয় কোরো না, আমার এই মদের মধ্যে রাহু নেই (আমার স্বামী অনুপস্থিত) রোহিণীও আকাশে বাস করছেন (তোমার পত্নীও অনেক দূরে)। হে কাতর ব্যক্তি, তুমি কেন ভয় পাচ্ছ? শিক্ষিতা মেয়েদের সঙ্গে নূতন আলাপে পুরুষের মন চঞ্চল হ'য়েই থাকে, এতে বিচিত্র কি আছে?"

কবি ত্রিভুবনসরস্বতীর একটি রাজস্তুতি এই:

"শ্রীমদ্রূপবিটঙ্কদেব সকল-ক্ষ্মাপাল-চূড়ামণে
যুক্তং সঞ্চরণং যদত্রভবতশ্চন্দ্রেণ রাত্রাবপি।
মা ভূত্বদ্বদনাবলোকনবশাদ্রীড়া-বিলক্ষঃ শশী
মা ভূচ্চেয়মরুন্ধতী ভগবতী দুঃশীলতা-ভাজনম্॥"

"সমস্ত নরপতিগণের চূড়ামণি স্বরূপ হে পরম সুন্দর মহারাজ, তুমি যে রাত্রে চাঁদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াও এ কাজ তোমারই উপযুক্ত। কেবল দেখো, যেন তোমার মুখ দেখে চাঁদ লজ্জায় না অদৃশ্য হন, আর ভগবতী অরুন্ধতীর (তোমার জন্য) দুঃশীলতার দুর্নাম না রটে।"

কবি ভাবদেবী বা ভাবকদেবীর সময় ঠিক জানা যায় না, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর আগে কোনো সময়ে তিনি জন্মেছিলেন। অল্প কথায় সহজ ভাষায় কাব্যে মাধুর্য সঞ্চার করবার ক্ষমতা তাঁর খুব বেশী ছিল। একটি উদাহরণ দিচ্ছি:

"তথাহভূদস্মাকং প্রথমমবিভিন্ন তনুরিয়ং
ততোহনু ত্বং প্রেয়ান্ অহমপি হতাশা-প্রিয়তমা।
ইদানীং নাথস্ত্বং বয়মপি কলত্রং কিমপরং
ময়াপ্তং প্রাণানাং কুলিশকঠিনানাং ফলমিদং॥"

"প্রথমে এমন দিন ছিল যখন তোমার আমার দেহ একই ব'লে মনে হ'ত, তারপর তুমি আমার কাছে প্রিয়তর হ'য়ে উঠলেও আমি তোমার আশাহতা প্রিয়তমা হ'য়ে রইলুম। উপস্থিত তুমি প্রভু, আমরা তোমার (অজ্ঞাত) স্ত্রী, এর পর আর কি হ'তে পারে? আমার বজ্রকঠিন প্রাণের (এত অনাদরেও যার শেষ হ'ল না) জন্যই এই ফল আমি পাচ্চি।"

খৃষ্টীয় একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে মারুলা, মোরিকা, সরস্বতী-কুটুম্ব-দুহিতা, মদালসা, লক্ষ্মী, ইন্দুলেখা এবং রাজকন্যার নাম এবং তাঁদের কবিতা পাওয়া যায়। মারুলার কবিতার একটি উদাহরণ দিচ্ছি:

“গোপায়ন্তী বিরহজনিতং দুঃখমগ্রে গুরূণাং
কিং ত্বং মুগ্ধে নয়নবিসৃতং বাষ্পপূরং রুণৎসি।
নক্তং নক্তং নয়নসলিলৈরেষ আর্দ্রীকৃতন্তে
শয্যোপান্তঃ কথয়তি দশাম্ আতপে শোষ্যমাণঃ॥”

অয়ি মুগ্ধে, গুরুজনের কাছে বিরহ দুঃখ লুকোতে গিয়ে কেন তুমি বাষ্পপূর্ণ চোখের অশ্রুস্রোত রুদ্ধ ক’রছ? রাতের পর রাত চোখের জলে ভিজে যাওয়া তোমার শয্যার প্রান্তদেশ তুমি যে রৌদ্রে শুকিয়ে নাও, তাতেই তোমার দশা প্রকাশ ক’রে দিচ্চে।”

সমসাময়িক প্রতিভাশালিনী কবি মোরিকার কবিতার একটি উদাহরণ এই:

“লিখতি ন গণয়তি রেখাং নির্ঝরবাষ্পাম্বু-ধৌতগণ্ডতটা
অবধি দিবসাবসানং মা ভূদিতি শঙ্কিতা বালা॥”

(স্বামীর আগমনের বাকি দিনগুলি গ’ণবার জন্য বিরহিণী) “মেয়েটি মাটিতে দাগ কাটে কিন্তু ভয়ে গ’ণে দেখেনা, পাছে দিন ফুরোতে বেশি দেরি আছে দেখা যায়। চোখের জলের ঝরণায় তার গালের দুই কূল ভেসে যায়।”

লক্ষ্মীর কবিতার একটি উদাহরণ দিচ্ছি:

“ভ্রমন্ বনান্তে নবমঞ্জরীষু ন ষট্পদো গন্ধফলীমজিঘ্রৎ।
সা কিং ন রম্যা স চ কিং ন রন্তা বলীয়সী কেবলমীশ্বরেচ্ছা॥”

“বনান্তে নবমঞ্জরীর মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ভ্রমর প্রিয়ঙ্গুর-গন্ধ শুঁকলনা। সে কি রমণীয় নয়? ভ্রমর কি রসিক নয়? দেখা যাচ্ছে জগতে কে’ কি রকম মর্যাদা পাবে, সে বিষয়ে নিজের গুণ কোনো কাজে লাগে না। কেবল ঈশ্বরেচ্ছাই বলবতী।”

ইন্দুলেখার লেখা নিম্নোদ্ধৃত একটিমাত্র কবিতা পাওয়া যায়, এই থেকে তাঁর প্রতিভার কিছু পরিচয় আমরা পাই। তাঁর অন্যান্য রচনা লুপ্ত হ’য়ে যাওয়ায় নিঃসন্দেহ সংস্কৃত সাহিত্য এবং আমাদের দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে:

“একে বারিনিধৌ প্রবেশম্ অপরে লোকান্তরালোকনম্
কেচিৎ পাবকযোগিতাং নিজগদুঃ ক্ষীণেহহ্নি চণ্ডার্চিষঃ।

মিথ্যা চৈতৎ অসাক্ষিকং প্রিয়সখি প্রত্যক্ষতীব্রাতপং
মধ্যেহহং পুনরধ্বনীন-রমণী-চেতোহধিশেতে রবিঃ ॥

প্রিয় সখি, কেউ বলে সূর্য দিন শেষে সমুদ্রে প্রবেশ করে, কেউ বলে অন্যদেশ দে'খতে যায় কেউ বলে সূর্য্য ঐ সময় অগ্নির সঙ্গে যুক্ত হয়। এ সবই মিথ্যা কথা, কারণ এর কোনো সাক্ষী নেই। আমার মনে হয় সূর্য্য পথিক বধূর (বিরহিনীর) অন্তরে গিয়ে শয়ন করে, কারণ সেইখানে দিনশেষে তার তীব্র দাহ প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়।"

এই যুগের অন্যতমা কবি মদালসা সমসাময়িক অন্যান্য কবির মতো মেঘগর্জনকে মদনের পৃথিবী জয়ের রণ-নির্ঘোষ ব'লে কবিত্ব করেছেন, আবার অ-কবিজনোচিত ভাষায় মানুষকে ধর্মের উপদেশও দিয়েছেন। তাঁর হিতোপদেশটি এই:

পরলোকহিতং তাত প্রাতরুত্থায় চিন্তয়।
ইহ তে কর্মণামেব বিপাকশ্চিন্তয়িষ্যতি ॥"

"বাছা, সকালে উঠে পরলোকে যাতে ভাল হয়, তার চিন্তা কোরো। এ জগতে তোমার কাজের ফলই পরলোকে বিচার করা হবে।"

চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে যাঁরা সংস্কৃতে কবিতা লিখে সাহিত্য ক্ষেত্রে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে কেরলী, কুটলা, পদ্মাবতী, গৌরী, মদিরেক্ষণা, বিদ্যাবতী, গন্ধদীপিকা, জঘনচপলা, গঙ্গাদেবী, দেবকুমারিকা, লক্ষ্মীদেবী ঠাকুরাণী, প্রিয়ম্বদা, বৈজয়ন্তী, মানিনী, সুভদ্রা, বেণীদত্তা, মধুরবর্ণী এবং চন্দ্রকান্তা ভিক্ষুণীর নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের কয়েকজনের কবিতার একটু আধটু উদাহরণ দে'ব। কবি কেরলী সরস্বতীর বন্দনা করছেন:

"যস্যাঃ স্ব-রূপমখিলং জ্ঞাতুং ব্রহ্মাদয়োহপি ন স্পষ্টাঃ।
কামগবী সুকবীনাং সা জয়তি সরস্বতী দেবী ॥"

"যাঁর প্রকৃতরূপ ব্রহ্মাদিও স্পষ্টরূপে সম্পূর্ণ জানতে পারেন না, যিনি সুকবিদের কামধেনু স্বরূপা (সকল কামনা পূর্ণকারিণী) সেই সরস্বতী দেবীর জয় হোক।" কবি পদ্মাবতী গ্রীষ্মবায়ুর বর্ণনা দিচ্ছেন:

"ধূলীকর্করিণঃ প্রচণ্ডতপনজ্বালালি-মালা ধরাঃ

স্পর্শাদেব সরিজ্জলং তরুদলং সংশোষয়ন্তক্ষণাৎ।
পীতোন্মুক্ত ফণীশ-ফুৎকৃতি-বিষ-জ্বালালি যুক্তা ইব
স্বচ্ছন্দং পরিতো ভ্রমন্তি বহুশো গ্রীষ্মস্য বাতা অভী॥”

গ্রীষ্মের হাওয়া ধূলো কাঁকর নিয়ে প্রচণ্ড রৌদ্র জ্বালার মালাপরে নির্ভয়ে ইচ্ছামতো চতুর্দিকে ঘুরছে। তার স্পর্শমাত্র নদীর জল এবং গাছপালা শুকিয়ে যাচ্ছে। (সমুদ্রমন্থন কালে) ছাড়া পাওয়া সর্পরাজের ফুৎকার নিঃসৃত বিষের জ্বালা যেন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।”

দক্ষিণ ভারতে বিদ্যাবতী এবং নেপালে চন্দ্রকান্তা ভিক্ষুণী ধর্মপ্রাণা নারী ছিলেন। প্রথমার সুদীর্ঘ মীনাক্ষীস্তোত্র থেকে প্রথম দু’পংক্তি দেওয়া হ’ল:

“যা দেবী জগতাং কর্ত্রী শঙ্করস্যাপি শঙ্করী।
নমস্তস্যৈ সুমীনাক্ষ্যৈ দৈব্যৈ মঙ্গলমূর্তয়ে॥’

“যিনি জগতের কর্ত্রী এবং (সর্বলোকের) শুভঙ্কর শঙ্করেরও যিনি কল্যাণ-বিধায়িনী, সেই সুকল্যাণ স্বরূপা দেবী সুমীনাক্ষীকে প্রণাম করি।” ভাষার মধ্যে বিশেষত্ব কিছু থাকলেও ভক্তিনম্র নারীহৃদয়ের অকপট প্রকাশ এই স্তোত্রটিকে মহিমান্বিত করেছে সেদিক দিয়ে চন্দ্রকান্তার অবলোকিতেশ্বরস্তোত্র এর পাশেই স্থান পেতে পারে। স্তোত্রটি সুদীর্ঘ, কয়েক ছত্র উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া হ’ল। শঙ্করাচার্যের শিবাষ্টকের প্রভাব এর ওপর পড়েছে, না আচার্য শঙ্কর ভিক্ষুণীর কাছে ঋণী, তা, আজ নিশ্চিত করে বলা শক্ত,—কারণ চন্দ্রকান্তার সময় নিরূপিত হয় নি।

“ভুবনয়বন্দিতলোকগুরুম্, অমরাধিপতি-স্তুতি-ব্রহ্ম-বরম্।
মুনিরাজবরং যুতিসিদ্ধিকরং প্রণমাম্যবলোকিত-নাম-ধরম্॥১॥
কুটিলামলপিঙ্গলধুম্রজটং, শশিবিষসমূজ্জ্বলপূর্ণ-মুখম্।
কমলায়তলোচনচারুকরং হিমখণ্ডবিমণ্ডল পূণ্ডপুটম্॥৩॥”

“ত্রিভুবন কর্তৃক বন্দিত লোকগুরু, দেবতাদের অধিপতিদ্বারা স্তুত ব্রহ্মবর মুনিশ্রেষ্ঠদিগের মধ্যে প্রধান, যোগসিদ্ধিদায়ক অবলোকিত নামধারীকে আমি প্রণাম করি।...যাঁর জটা কুটিল, নির্মল, পিঙ্গল এবং ধুম্রবর্ণ। যাঁর মুখ চন্দ্রকিরণের মতো উজ্জ্বল, পদ্মের মতো আয়ত লোচন তাঁকে সুন্দর করেছে, তুষার-শুভ তিলক যাঁর শোভাস্বরূপ।”

এই যুগের কবিদের মধ্যে গন্ধদীপিকা ছিলেন কাজের লোক। তিনি কবিতায় ধূপতৈরি করবার জন্য উপকরণের ফর্দ দিচ্ছেন:

"শশি-নখ-গিরি-মদ-মাংসী-জতু-ভাগো মলয়লোহয়ো র্ভাগৌ।
মিলিতৈর্গুগু-পরিমৃদিতৈর্বস্ত্রগৃহাদীনি ধূপয়েচ্চতুরঃ॥"

অর্থাৎ "কর্পূর, নখ, গিরি, মদ, জটামাংসী এবং লাক্ষা এক এক ভাগ, চন্দন ও তামা দু'ভাগ ক'রে মিশিয়ে ঝোলাগুড়ের সঙ্গে পিষে চতুর ব্যক্তি তা'র বস্ত্র এবং গৃহ সুরভিত করবেন।"

বেণীদত্তার রাজস্তুতি মূলক কবিতাটি অতিশয়োক্তিতে পূর্ণ হ'লেও সে যুগের চাটুবাদের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত:

"ক্ষৌণীপাল বিশালভাল ভবতঃ প্রস্পর্দ্ধিবর্গ্যবিলা-
কীর্ত্যা শ্যামলিতে শিবে গণগণে ভীতে গুহে কম্পিতে।
বিভ্যদ্দেবগণে ত্রসৎফণিগণে কম্পৎপিশাচীগণে
ক্রোধোৎকম্পিত-পাণি-পঙ্কজতলা সা হিঙ্গুলা পাতু নঃ॥

"হে বিশাল ললাট মহারাজ, তোমার শত্রুদের কুকীর্তির কালিমা যখন শিবের কণ্ঠের কালিমাকেও ছাড়িয়ে গেছে, যখন তাঁর প্রমথেরা ভীত, কার্তিক যখন ভয়ে কাঁপছেন, দেবতারা সর্পেরা এবং পিশাচীরা যখন ভয়ে কাঁপছেন তখন যাঁর পদ্মহস্ত ক্রোধে কাঁপছে, সেই হিঙ্গুলা দেবী আমাদের রক্ষা করুন।"

যাঁদের সময় আমরা নিশ্চিতরূপে জানিনা তাঁদের মধ্যে দক্ষিণী পণ্ডিত এলেশ্বর উপাধ্যায়ের বালবিধবা কন্যা নাচী নিজের দুঃখময় জীবন অবলম্বনে 'নাচীনাটক' লিখে গেছেন। তিনি তীর্থযাত্রা উপলক্ষ্যে ভারতের নানা প্রদেশে ভ্রমণ ক'রে নানা প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে হারিয়ে দিগ্বিজয় ক'রে এসেছিলেন। চিরকুমারী ব্রাহ্মণকন্যা 'অভয়া' জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ ও ভূগোল বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন, তিনি সংস্কৃত এবং তেলগু উভয় ভাষাতেই সুপণ্ডিতা ছিলেন। ভূগোল এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ কবিতায় লিখে তিনি যশস্বিনী হয়েছিলেন। তাঁর এক বোন উপাগ্গা 'নীলি-পাটল' গ্রন্থ লিখে এবং আর দুই বোন ভল্লী এবং সুরেগা নানা খণ্ডকাব্য এবং কবিতা লিখে খ্যাতি লাভ করে ছিলেন।

সংস্কৃতে প্রাচীন কবিদের লেখা সম্পূর্ণ কাব্য বা কবিতাসংগ্রহ অল্পই পাওয়া গেছে। রাজপ্রাসাদ থেকে যে সব কাব্য রচিত হয়েছিল, বৈদেশিক আক্রমণের নানা

অবস্থাবিপর্যয়ের মধ্যেওসেই রকম কয়েকখানিমাত্র টিঁকে গেছে, রাজসভা থেকে দূরে গ্রামের দরিদ্র নারীর লেখার সে সৌভাগ্য হয়নি। রাজা কৃষ্ণদেবের সময় কুম্ভকারকন্যা মল্লী বা মল্লা অবসর সময়ে তেলুগু ভাষায় রামায়ন লিখেছিলেন। মন্দিরের দেবদাসীরা গত শতাব্দীতেও সংস্কৃতে মৌলিক রচনার জন্য খ্যাতিলাভ করেছেন, সুতরাং হিন্দুরাজত্বের সমৃদ্ধির যুগে রাজান্তঃপুরিকারা যে অনেকেই সুশিক্ষিতা এবং সুকবি ছিলেন তা'তে আশ্চর্য হবার কোনই কারণ নেই। উত্তর ভারতে মুসলমান আধিপত্য সংস্কৃতচর্চায় সর্বত্র বাধা না দিলেও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় ঐহিক উন্নতির সম্ভাবনা ছিলনা ব'লে জনসাধারণ সংস্কৃতকে পূর্বের সম্মান দিত না। দাক্ষিণাত্যে বিজয় নগরে এবং তাঞ্জোরে দীর্ঘকাল পর্যন্ত রাজানুকূলতায় শিক্ষিত সমাজে নারীদের মধ্যেও সংস্কৃতচর্চা অব্যাহত ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বিজয়নগররাজ বীরকম্পন বা কম্পরায়ের পত্নী গঙ্গাদেবী তাঁর স্বামীর মুসলমানসৈন্যের কাছ থেকে মাদুরা-উদ্ধার উপলক্ষ্য ক'রে মধুরা-বিজয় কাব্য লেখেন, এই কাব্যখানি সম্পূর্ণ পাওয়া গেছে। এই ঐতিহাসিক বীররসপূর্ণ কাব্যে কবি তাঁর যুগকে জীবন্ত কঁরে তুলেছেন অপরূপ বাণীচিত্রে। একটি উদাহরণ দে'ব। স্বামীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে তিনি তাঁকে এক দেহে বিরাজিত পঞ্চপাণ্ডবরূপে চিত্রিত ক'রেছেন। অত্যুক্তি হ'লেও বর্ণনাটি উপভোগ্য:

"স সত্যবাক্ ভূরিবলো্গুণান্বিত-
স্তুরঙ্গমারোহণকর্মমর্মবিৎ।
কৃপাণবিদ্যা-নিপুণঃ পৃথাভুবাম্
অলক্ষি সংঘাত ইবৈকতাং গতঃ ॥"

"তিনি ছিলেন (যুধিষ্ঠিরের মতো) সত্যবাক্, (ভীমের মতো) মহাবলশালী, (অর্জ্জুনের মতো) সর্বগুণান্বিত, (নকুলের মতো) অশ্বদক্ষ এবং (সহদেবের মতো) অসিচালনানিপুণঃ যেন পার্থেরা (পঞ্চপাণ্ডব) একদেহে মিলিত হয়েছিলেন।"

পঞ্চদশ শতাব্দীতে আর একজন সুকবিকে রাজান্তঃপুরে দেখতে পাই। মিথিলারাজ শিবসিংহের পত্নী লক্ষ্মীদেবী ঠাকুরাণী বা লছিমা দেবীর নাম বিদ্যাপতির বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই জানেন। তিনি শুধু সুন্দরী এবং অন্যের কাব্যরসের উৎস স্বরূপা ছিলেন না, নিজেও তিনি সুকবি ছিলেন। যে সব নির্লজ্জ লোক ধনীর কাছে ভগ্নী বিক্রয় ক'রে ভগ্নীপতির পয়সায় বড়মানুষী করে, নিম্নলিখিত কবিতাটিতে তিনি তাদের তীব্র আক্রমণ করেছেন। কবিতাটি তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা কিনা তা' বলা যায় না:

"চপলং তুরগং পরিনর্তয়তঃ পথি পৌরজনান্ পরিমর্দয়তঃ।
ন হি তে ভুজ-ভাগ্য-ভবো বিভবো ভগিনী-ভগ-ভাগ্য-

ভবো
বিভবঃ ॥”

“যতই তুমি চঞ্চল ঘোড়া নাচিয়ে রাস্তায় রাস্তায় সহরের লোককে চাপাদিয়ে বেড়াও, তোমার ঐশ্বর্য তোমার নিজের বাহুবলের দ্বারা উপার্জিত নয়, নিজের ভগ্নী বিক্রয় করেই তুমি এই সৌভাগ্য লাভ করেছ।”

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে রাজপুতানায় রাজা সংগ্রামসিংহের মা ‘দেবকুমারিকা’ বৈদ্যনাথের মন্দিরস্থাপন উপলক্ষ্যে ‘বৈদ্যনাথ প্রশস্তি’ নামক এক ঐতিহাসিক কাব্য লেখেন, সেটি এখনও পাওয়া যায়। এই যুগেই মালাবারের লক্ষ্মীরাজ্ঞী ভাগবৎপুরাণের একটি গল্প নিয়ে ‘সান্তনা-গোপাল কাব্য’ রচনা করেন।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে তাঞ্জোররাজ অচ্যুতরায়ের পত্নী তিরুমলাম্বা তাঁর স্বামীর সঙ্গে ‘বরদাম্বিকা’ নাম্নী তাঁর সপত্নীর প্রণয় এবং বিবাহ ঘটনা উপলক্ষ্য ক’রে একটি কাব্য রচনা করেন। এই নিরাসক্তচিত্ত কবির পতিপ্রেম আজকের দিনে অনেকের অদ্ভুত লাগতে পারে, কিন্তু কাব্যের বিষয়বস্তু থেকে নির্লিপ্ত না হ’লে কবির রচনা সার্থক এবং সুন্দর হয়না, একথা তিরুমলাম্বার জানা ছিল তাই কাব্যরচনার সময় সপত্নী-বিদ্বেষ তাঁকে অভিভূত করতে পারেনি। পরবর্তী পরমবিদ্যোৎসাহী তাঞ্জোররাজ রঘুনাথ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিদ্যোৎসাহী এবং সুপণ্ডিত ছিলেন, বহু নারী কবিকে তিনি তাঁর রাজসভায় স্থান দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাতা মধুর বাণী রঘুনাথের লেখা তেলুগু রামায়ণ সংস্কৃতে অনুবাদ করেছিলেন। কুমারসম্ভব এবং নৈষধকাব্য ও তিনি নিজের মনের মতো ক’রে সংস্কৃতে লিখেছিলেন। এই যুগের সুভাষিতহারাবলীতে মধুরবর্ণী নাম্নী একজন নারীকবির রচনা পাওয়া যায়, দু’জনে অভিন্ন বলেই মনে হয়। মধুরবর্ণীর একটি অম্লমধুর কবিতায় কোনো অসতী নারীর স্বামীকে কেন ভালো লাগে না, তার কারণ দেওয়া আছে:

“আকারেণ শশী গিরা পরভৃতঃ পারাবতশ্চুম্বনে
হংসশ্চক্রমণে সমং দয়িতয়া রত্যাং বিমর্দে গজঃ।
ইত্থং ভর্তরি মে সমস্ত যুবতি-শ্লাঘ্যৈর্গুণৈং কিঞ্চন
ন্যূনং নাস্তি পরং বিবাহিত ইতি স্যান্নৈক-দোষো যদি ॥”

“আমার স্বামীর রূপ চাঁদের মতো সুন্দর, কণ্ঠস্বর কোকিলের মতো মিষ্ট, তাঁর গতি রাজহংসের মতো,...যুবতীদের কাম্য কোনো গুণেরই তাঁর অভাব নেই। তাঁর একমাত্র দোষ তিনি আমার বিবাহিত পতি।”

এতক্ষণ যাঁদের নাম করলুম তাঁদের অধিকাংশই বাংলার বাইরের মেয়ে। এই বার কয়েকজন বাঙ্গালী নারীর নাম ক'রব, যাঁরা তিন চারশ'বছর আগে মোগল পাঠান-মগ-ভুঁইয়া-পর্টুগিজ রাজা এবং দস্যুদের সংঘর্ষে বিধ্বস্ত বাঙ্গলার সেই নিরতিশয় দুর্দিনে মুসলমানরাজত্বের সশঙ্কিত আবহাওয়ায় সুদূর পল্লীগ্রামে ব'সে দেবভাষার চর্চায়, অধ্যয়নে এবং অধ্যাপনায় বাঙ্গালী নারীর সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং তাদের মুখোজ্জল ক'রে গেছেন। একটি নারীরচিত শ্লোক আপনারা হয়তো অনেকেই শুনেছেন, তবু এখানে উল্লেখ না ক'রে পারলুমনা:

"কালিন্দী পুলিনেষু কেলিকলনং কংসাদিদৈত্যদ্বিষং।
গোপালীভিরভিষ্টুতং ব্রজবধূ-নেত্রোৎপলৈরর্চিতং॥
বর্হালঙ্কৃতমস্তকং সুললিতৈ রঙ্গৈ স্ত্রিভঙ্গং ভজে।
গোবিন্দং ব্রজসুন্দরং ভবহরং বংশীধরং শ্যামলং॥"

কবি প্রিয়ম্বদা এই শ্লোকটির রচয়িত্রী। ষোড়শ শতাব্দীর সংস্কৃতজ্ঞা মহিলাকবিদের মধ্যে প্রিয়ম্বদা দেবীর স্থান সর্বোচ্চে। তিনি ফরিদপুর কোটালিপাড়ার সুপণ্ডিত শিবরাম সার্বভৌমের কন্যা ছিলেন। বাল্যে পিতার কাছে কাব্য অলঙ্কার, ব্যাকরণ ন্যায়শাস্ত্র প'ড়ে তিনি অদ্বিতীয়া বিদুষী ব'লে খ্যাতিলাভ করেন। পিতা তাঁর পাত্র অন্বেষণে বাংলাদেশের অনেক স্থানে ঘুরে শেষে তাঁকে নিয়ে কাশীতে যান। সেখানে রঘুনাথ মিশ্র নামক এক কনৌজী বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ প্রিয়ম্বদার রূপ গুণে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর পাণি প্রার্থনা করেন, কন্যার সম্মতি বুঝে তাঁকে কন্যা সম্প্রদান ক'রে নিশ্চিন্ত হন। রঘুনাথ ধনীর সন্তান ছিলেন, তাঁর পিতা তাঁদের একটি জমিদারী দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পত্নীর পরামর্শে তিনি তা গ্রহণ করেননি। জমিদারীর দেখাশোনা ক'রতে গেলে পড়াশোনার অসুবিধা হ'বে বলে তাঁরা কোনোরকমে দুজনের গ্রাসাচ্ছাদন চলে এইটুকু মাত্র আয়ের সম্পত্তি রেখেছিলেন। দাসদাসী রাখায় নিজের কাজ পরকে দিয়ে অর্থের জোরে করিয়ে নেওয়ার যে হীনতা আছে, সেটা ব্রাহ্মণকন্যার ধর্মসাধনার বিরোধী বিবেচনায় প্রিয়ম্বদা সমস্ত গৃহকার্য নিজে করতেন। অবসর সময়ে চিরজীবন তিনি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন এবং নিজে যা বুঝতেন অন্যকে তা সহজে বোঝাবার জন্য বহু দুরূহ সংস্কৃত বইয়ের টীকা লিখেছেন। এই সব টীকার মধ্যে 'মদালসা উপাখ্যানের' দার্শনিক টীকা এবং মহাভারতের শান্তিপর্বের মোক্ষধর্ম বিষয়ক সুবিস্তৃত টীকা বিখ্যাত। 'শ্যামরহস্য' নামক ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ লিখেও ইনি যশস্বিনী হয়েছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এমন কি দাক্ষিণাত্যেও তাঁর কবিত্ব খ্যাতি পৌঁছেছিল, 'রসবতী' প্রিয়ম্বদা নামে তিনি ভারতবিখ্যাতা হয়েছিলেন।

মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যের সাধনসহচর নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবা দেবী ষোড়শ শতাব্দীর এক জন শ্রেষ্ঠা বিদুষী ছিলেন। দক্ষিণ পশ্চিমে উড়িষ্যা থেকে পূর্বে আসাম এবং উত্তর পশ্চিমে বৃন্দাবন পর্যন্ত গৌড়িও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্য যে বিরাট

আন্দোলন চ'লছিল তিনি তার অন্যতমা পরিচালিকা ছিলেন। তিনি বহু নর নারীকে দীক্ষা দিয়েছেন এবং ধর্মজীবনের প্রেরণা দিয়েছেন, তাঁর ভক্তি, পাণ্ডিত্য, প্রচার-কুশলতা, সংগঠনসামর্থ্য সবই অনন্যসাধারণ ছিল। এই মহীয়সী নারীর মৃত্যুর পর তাঁর উপযুক্ত পুত্রবধু বীরচন্দ্র-পত্নী সুভদ্রা দেবী শ্বাশুড়ির উদ্দেশ্যে 'অনঙ্গকদম্বাবলী' নামে একশত শ্লোকাত্মক স্তোত্ররচনা করেন। তার একটি শ্লোক উদাহরণ স্বরূপ তুলে দিচ্ছি:

"বন্দে হহং তব পাদপদ্মযুগলং মৎপ্রাণ দেহাস্পদম
সত্যংব্রূমি কৃপাময়ি ত্বদপরং তুচ্ছং ত্রৈলোক্যাস্পদম্॥
শ্রীল শ্রীচরণারবিন্দমধুপো মন্মানসং নেচ্ছতি
হা মাতঃ করুণালয়ে তব পদে দাস্যং কদা যাস্যতি॥"

শাশুড়ির প্রতি পুত্রবধুর এই ভক্তি আজকের দিনে বাড়াবাড়ি ব'লে অনেকের মনে হতে পারে, কিন্তু জাহ্নবা দেবী এই ভক্তির যোগ্যা পাত্রী ছিলেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, অপর দিকে বাঙ্গালীর মেয়ে তখনও শ্রদ্ধেয়াকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে লজ্জিত হ'ত না এও সত্য। অবশ্য সুভদ্রা দেবী নিজে গুণী ছিলেন বলেই গুণীর মর্য্যাদা বুঝেছিলেন। পরবর্তী যুগে খড়দার মা গোঁসাইনামী বৈষ্ণব ধর্মনেত্রীদের মধ্যে ভক্তিশাস্ত্রের এবং দর্শনের চর্চা অব্যাহত ভাবে কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত চ'লে এসেছে। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে শিক্ষিতা বৈষ্ণবীদের পাঠিয়ে এই 'মা গোঁসাইরা' সে দিন পর্যন্ত বাংলার অন্তঃপুরে জ্ঞানের দীপ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। এঁদের ঋণ আজকের শিক্ষিতা নারীরা যদি ভুলে যান তা'হলে শুধু অকৃতজ্ঞতা হবে না, মহাপাপ হবে। এই বৈষ্ণব বিদুষীদের বিস্তৃত পরিচয় এখনও হয়ত সংগৃহীত হ'তে পারে, কিন্তু সে জন্য সম্যক চেষ্টা হয়নি। আমরা তাঁদের মধ্যের সবচেয়ে সুপ্রসিদ্ধা হেমলতা এবং গঙ্গা দেবীর নাম শুধু জানি। হেমলতা প্রখ্যাতা ধর্মগুরু ছিলেন, সুবিখ্যাত কবিকর্ণপুর ছিলেন তাঁর শিষ্য। সুপ্রসিদ্ধা স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর জীবন-স্মৃতিতে এমনই একজনের কথা উল্লেখ করেছেন, যিনি ঠাকুর-পরিবারের মেয়েদের শিক্ষা দিতে তাঁদের অন্তঃপুরে যেতেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় দেননি।

সপ্তদশ শতাব্দীর সবচেয়ে বিখ্যাতা সংস্কৃত নারী কবি বৈজয়ন্তী দেবীর জন্ম আনুমানিক ১৫৫০ শকাব্দে পদ্মাতীরে ধানুকা গ্রামে এক অধ্যাপক ব্রাহ্মণের ঘরে হয়ে ছিল। কোটালিপাড়ার বিখ্যাত কবি কৃষ্ণনাথ সার্বভৌমের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। পিতার শিক্ষার ফলে বৈজয়ন্তী বাল্যেই কাব্য ব্যাকরণ এবং ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর শ্বশুর তাঁর গুণ দে'খে তাঁকে নিজেদের চেয়ে নীচু ঘর থেকে নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর পুত্রের আভিজাত্য গর্ব ছিল পিতার চেয়ে অনেক বেশী। তিনি রূপ'হীনা এবং কৌলীন্যহীনা বৈজয়ন্তীকে দীর্ঘকাল অনাদর ক'রে পিতৃগৃহে ফেলে রেখেছিলেন। শেষে বহু দিন অপেক্ষার পর বৈজয়ন্তী কৃষ্ণনাথকে নিম্নলিখিত দুই ছত্র কবিতা লিখে পাঠান।

“জিত-ধূমসমূহায় জিত-ব্যজন-বায়বে।
মশকায় ময়া কায়ঃ সায়মারভ্য দীয়তে॥”

“সন্ধ্যা থেকে সারারাত মশারা আমার দেহকে কষ্ট দিচ্ছে, তারা ধোঁয়াও মানে না, পাখার হাওয়াও মানে না।” এর নিগূঢ় অর্থ “আমি তোমার জন্য সারারাত জেগে ব’সে থাকি, তুমি না এলে কে আমার দুঃখ দূর করবে?” কৃষ্ণনাথ কবির এই ব্যঞ্জনাপূর্ণ চিঠি পেয়ে তাঁর নিজের অপরাধ বুঝতে পারলেন, পত্নীর কবিত্বের জন্য গর্ব অনুভব করলেন। একটি প্রণয়লিপিতে তিনি উপেক্ষিতা পত্নীকে সম্বর্ধিত করলেন, বৈজয়ন্তী তার উত্তরে লিখলেন:

“পুন্নাগ চম্পক লবঙ্গ সরোজমল্লি
মাতঙ্গযুথিরসিকস্য মধুব্রতস্য।
যৎ কুন্দবৃন্দ কুটজেষঘপি পক্ষপাতঃ
সদ্বংশজস্য মহতোহি মহত্বমেতৎ॥”

“হে মধুকর, তোমার ব্রত হচ্ছে নাগকেশর, চাঁপা, লবঙ্গ, পদ্ম, মল্লিকা, যুঁই প্রভৃতি সুন্দর ফুলের মধুপান করা, আজ যে কুন্দ এবং কুর্চি ফুলের প্রতি তুমি পক্ষপাত দেখাচ্ছ, এ তোমার মতো সদ্বংশজাত মহতেরই মহত্ব।” এই অভিমান পূর্ণ ব্যাজ-স্তুতি কৃষ্ণনাথকে অনুতপ্ত এবং মুগ্ধ ক’রল, তিনি কবির কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁকে বাড়া নিয়ে এলেন। এই কবি দম্পতীর লেখা ‘আনন্দ লতিকা ঐযুগের একখানি বিখ্যাত বই। তাতে বৈজয়ন্তী দেবীর লেখা বহু শ্লোক আজও পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। “আনন্দ লতিকা” রচনা কালে একদিন পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ সন্ধ্যা হইতে শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া নায়িকার রূপ বর্ণনা করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া বৈজয়ন্তী দেবী তাঁহার স্বামীকে বল্লেন,—“এত সময় ধ’রে তুমি স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণনা ক’রছো! দেখ আমি একটা শ্লোকে তোমার নায়িকার তিন অঙ্গ বর্ণনা ক’রে দিচ্ছি।” এই বলে তিনি “আনন্দ লতিকা”র জন্য এই শ্লোকটী লিখে দিলেন:

“অহিরয়ং কলধৌতগিরিভ্রমাৎ
স্তনমগাৎ কিল নাভিহ্রদোত্থিত।
ইতি নিবেদয়িতুং নয়নে হি যৎ
শ্রবণ সীমনি কিং সমুপস্থিতে॥”

পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ উক্ত গ্রন্থের সহকারিণী বলে তাঁর স্ত্রীকে স্বীকার করেছেন। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"আনন্দ লতিকা গ্রন্থো যেনাকারি স্ত্রিয়া সহ।"

শুনা যায় একদিন কৃষ্ণনাথ তাঁর ছাত্রদের একখানি প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র পড়াতে গিয়ে তার এক স্থানে লিখিত,—"অত্রতু নোক্তং তত্রাপি নোক্তম্"-এর ব্যাখ্যা করলেন,—"এ স্থানেও বলা হয় নাই ও স্থানেও বলা হয় নাই।" কিন্তু এই পাঠটী সুসঙ্গত না হওয়াতে, তিনি এই অর্থে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। যথার্থ অর্থ নির্ণয় করবার জন্য তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। এদিকে বৈজয়ন্তী ছাত্রের মুখে শুনামাত্র পাঠের যথার্থ অর্থ বুঝে ছিলেন। তিনি পুস্তকখানি খুলে এর পদচ্ছেদ করে—"অত্রতু ন উক্তং তত্র অপি ন উক্তম্" এইরূপ লিখে রাখলেন। এইরূপে সেই দুর্ব্বোধ্য পদটী পদচ্ছেদ দ্বারা সহজবোধ্য হয়েছিল।

বাংলায় বৈজয়ন্তীর পরবর্তী বিখ্যাত বিদুষী উত্তরবঙ্গের মহামহোপাধ্যায় ইন্দ্রেশ্বর চূড়ামণির কন্যা মানিনী দেবী। তাঁর ভাই ধনেশ্বরকে বর্ণমালা শিখতে দেখেই তাঁর বর্ণশিক্ষা হয়, তাঁকে ব্যাকরণ প'ড়তে দেখেই তিনি ব্যাকরণ শেখেন, এজন্য কাউকে আলাদা কোনো পরিশ্রম ক'রতে হয়নি। পরবর্তী কালে তাঁর পিতার ছাত্রেরা তাঁকে পূজার ফুল তুলে দিয়ে অনেক দুরূহ প্রশ্নের অর্থ জেনে নিত। মানিনী সংস্কৃতে অনেক শ্লোক লিখে গেছেন, এক সময় সেগুলি অনেকের কণ্ঠস্থও ছিল, আজ ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে! তাঁর বিখ্যাত শিবস্তোত্র থেকে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি:

"তরণির্ধরণি সলিলং পবনো, গগনঞ্চ বিরিঞ্চি পুতন্বতনোঃ।
শশলাঞ্ছন ভূষণ চন্দ্রকলা স্তনবস্তব ঘোযয়তে-সচতে॥
তমসি ত্বমসীশ্বর তেজসি চ, প্রমথেশ গিরৌ জলধৌ বসসি।
অবনৌ গগনে চ গুহাসু পিত হৃদয়েহসি বহিশ্চ দধাসি জগৎ॥
করুণাজলধে হরিণাঙ্কশিরো গিরিরাজসুতা-দয়িত প্রণতাং।
তবপদসরোরুহ-কিঙ্করিকাং সকলাদ্ধরমেত্য সমুদ্ধর মাং॥"

একুশদিনের শিশুপুত্র রেখে পূর্ণযৌবনে তিনি যখন স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যান তখন তাঁর পিতৃব্য তাঁকে শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়ে নিরস্ত ক'রতে চেয়েছিলেন, মানিনী শাস্ত্রীয় উদাহরণ দিয়েই তাঁকে পরাস্ত ক'রে হাসিমুখে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করেন। তাঁর সেই শিশুপুত্র ভবিষ্যতে রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক এবং মহাপণ্ডিত হয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর সুবিখ্যাতা বিদুষী জপসা গ্রামের আনন্দময়ী দেবীর

কথা অন্যত্র বলেছি, তাঁর শাস্ত্রীয় বিধান সেদিন বাংলা দেশের রাজারাজড়ারা পর্যন্ত মান্য করতেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফরিদপুর নিবাসিনী সুন্দরী দেবী ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন।

অধ্যাপক চণ্ডীচরণের বিদুষী কন্যা দ্রবময়ী দেবী পিতার চতুষ্পাঠীতে অনেক ছাত্রকে ব্যাকরণ পড়াতেন। এই যুগেই হঠী বিদ্যালঙ্কার বা লক্ষ্মীদেবী হিন্দু আইনের টীকা রচনা করেছিলেন। তদানীন্তন সমাজে তাঁর এতদূর সম্মান ছিল যে বড় বড় তর্কসভায় তাঁর নিমন্ত্রণ হ'ত এবং সর্বত্র সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের সমান দক্ষিণা তাঁকে দেওয়া হ'ত। গৃহকার্যের অবসরে শাস্ত্রচর্চা কঁরে তিনি শেষে কাশীর মতো পণ্ডিত প্রধান স্থানে নিজে টোল খুলে ছাত্রদের সকল শাস্ত্রের পাঠ দিতেন এবং সেখানকার জনসাধারণ এবং অধ্যাপকদের দ্বারা সম্মানিতা হতেন।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দক্ষিণ ভারতে অনন্ত আচার্যের কন্যা ত্রিবেণী অল্পবয়সে পতিপুত্রহীনা হ'য়ে দীর্ঘজীবন একান্তে শাস্ত্র এবং কাব্য চর্চায় কাটিয়েছিলেন। তাঁর 'লক্ষ্মীসহস্র' 'রঙ্গনাথসহস্র' ভক্তিবিষয়ক, 'শুকসন্দেশ' 'ভৃঙ্গসন্দেশ গীতিগাথা জাতীয় এবং 'রঙ্গাভ্যুদয়' 'সম্পৎ-কুমারবিজয়' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ, 'তত্ত্বমুদ্রাভদ্রোদয়' এবং 'রঙ্গরাট সমুদয়' নাটক দক্ষিণ ভারতে সুপ্রসিদ্ধ। এই শতাব্দীর সুপণ্ডিতা নারীদের মধ্যে সুনন্দা দেবী বা "মাতাজীর" নাম ভারতবিখ্যাত। ভারতীয় নারীদের ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষা ক'রে সুশিক্ষিতা করবার জন্য তিনি বহু বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, মহাকালীপাঠশালা তাদেরই অন্যতম। ধর্মপ্রাণা নারীদের কথা বলবার সময় তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা উচিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বিখ্যাতা বিদুষী এবং সংস্কৃত কবি পণ্ডিতা রমাবাই নিজে বাঙ্গালী না হ'লেও বাংলার বধূ। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ম্যাঙ্গালোরে পণ্ডিত অনন্তশাস্ত্রীর গৃহে তাঁর জন্ম হয়। তিনি বাল্যে পিতার কাছে সংস্কৃত এবং ভারতের কয়েকটি প্রাদেশিক ভাষায় সুশিক্ষিতা হন। ষোলো বছর বয়সে মাতৃপিতৃহীনা হ'য়ে ভাইয়ের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ ক'রে তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বক্তৃতা দেন। কলকাতার এবং ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরা তাঁর বাগ্মিতায় এবং কবিত্বে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে সরস্বতী উপাধি দেন। দ্বারভাঙ্গার রাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহের দ্বারা সম্মানিতা হ'য়ে রমাবাই সংস্কৃতে "লক্ষ্মীশ্বর চম্পুকাব্য" রচনা ক'রে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন, ঐ কাব্যে তাঁর অসাধারণ ছন্দোজ্ঞান এবং অলঙ্কার-নৈপুণ্যের সম্যক্ পরিচয় আছে। ভ্রাতার মৃত্যুর পর নিঃসহায়া রমাবাই শ্রীহট্টের উকিল বিপিনবিহারী দাসকে বিবাহ করেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর স্বামী মারা যান। অতঃপর এই বিদুষী বিধবা একা ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত নারী শিক্ষা সম্বন্ধে সভা করে বক্তৃতা দিয়ে হিন্দু-সমাজকে সচেতন ক'রে তুলতে লাগলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি 'আর্য মহিলা সমাজ' স্থাপন করেন, একান্ত পরিতাপের বিষয় যে সেই বৎসরই তিনি খৃষ্টধর্মে দীক্ষিতা হন। উত্তেজনার বশে ধর্মত্যাগ ক'রলেও ভারতের অতীত সংস্কৃতির প্রতি আজীবন তাঁর

অসীম শ্রদ্ধা ছিল, পর বৎসর ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি ভারতের অতীত গৌরব সম্বন্ধে বহু গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা দেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রমাবাই চেলটেন্‌হামের নারী কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপিকা নিযুক্তা ছিলেন। সেখান থেকে আমেরিকায় গিয়ে কিণ্ডারগার্ডেন প্রণালী শিখে এবং বোষ্টন নগরে হিন্দু বিধবাদের সাহায্যের জন্য 'রমাবাই সমিতি' গঠন করে বোম্বাইয়ে ফিরে আসেন। বোম্বাইয়ে একটি বিধবাশ্রম স্থাপন ক'রে সেইটির পরিচালনার ভার নিয়ে তিনি অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। ১৯২৭ সালে এই সুপণ্ডিতা নারীর কর্মময় জীবন শেষ হয়। ইংরেজীতে 'উচ্চ জাতীয়া হিন্দু নারী' তাঁর বিখ্যাত বই।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে কুম্ভকোণমের দেব-নর্তকী জ্ঞানসুন্দরী কয়েকটি সংস্কৃত কাব্য রচনা ক'রে মহীশূর রাজদরবার থেকে 'কবিরত্ন' উপাধি পেয়েছিলেন। মাদুরার শৈব ধর্মের জয়গান ক'রে তিনি 'হয়শালা চম্পূ কাব্য' লিখেছেন। শ্রীদেবী বালরাজ্ঞীর 'চম্পূ-ভাগবৎ', ভাগবৎপুরাণের সংক্ষিপ্ত গদ্যপদ্যময় সংস্করণ। মহীশূরের বিখ্যাত সংস্কৃত কবি 'সুন্দর বল্লী'র ছয়সর্গে লেখা তেলুগু অক্ষরে ছাপা 'রামায়ণ চম্পূকাব্য' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃত কবিদের মধ্যে মারাঠী বিদুষী অনসূয়া কমলাবাই বাপটের "শ্রীদত্তপঞ্চামৃত" নামক দত্তাত্রেয়দেবের পূজাবিধি বিশেষ করে মহারাষ্ট্র দেশের জন্যই লেখা। তা'তে প্রথম দু'সর্গ তাঁর নিজের লেখা, বাকি অংশ অন্য লেখকদের লেখা থেকে সঙ্কলন।

বর্তমান কবিদের মধ্যে তামীলদেশীয়া বালম্বিকার লেখা বিভিন্ন কাব্যের মধ্যে 'সুবোধ রামচরিতে' রামায়ণের উত্তর কাণ্ড বাদ দেওয়া হয়েছে। বালাম্বিকা 'আর্য-রামায়ণ' নামক রামায়ণের একটি সংক্ষিপ্তসার 'গণ-কদম্ব' এবং 'দেবীত্রয়ত্রিংশন্মলা' লিখে খ্যাতিলাভ করেছেন। হনুমাম্বা ভেন্নেলকান্তি তাঁর গুরু ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর বন্দনায় 'ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী স্বামীপাদুকাপূজন' নামক গদ্যপদ্যময় কাব্যছাড়া 'শঙ্কর ভগবৎপাদ সহস্রনামাবলী' গ্রন্থে শঙ্করাচার্যের তপস্যা, পাণ্ডিত্য, দিগ্বিজয় এবং দৈবশক্তির দ্যোতক তাঁর সহস্র-নামকরণ করেছেন। বহু রাগরাগিণীসমন্বিত গীতিকবিতায় দত্তাত্রেয় পূজাবিষয়ক 'দত্ত-পূজা গীত-কদম্ব' রচনা ক'রে তিনি প্রসিদ্ধা হয়েছেন।

উড়িষ্যার সামন্তরাজা বিশ্বনাথ দেববর্মনের পত্নী রাধাপ্রিয়া দেবী স্বামীর সঙ্গে একত্রে 'রাধাগোবিন্দ শরৎরাত্র' কাব্য লিখেছেন। এ ছাড়া তাঁর স্বামীর রুক্মিণী-পরিণয়' কাব্যের তিনি একটি পাণ্ডিত্য পূর্ণ টীকা রচনা করেছেন। তাঞ্জোরের মুথুকৃষ্ণ আয়ারের পত্নী 'কামাক্ষী' কালিদাসের ব্যবহৃত বহু শব্দ সুকৌশলে নূতন ভাবে সাজিয়ে ব্যবহার ক'রে 'রামচরিত' রচনা করেছেন, তাঁতে তার অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

‘মণ্ডয়ম্ ধাতি আলমেলম্মা’ উদ্ভট-নাম্নী কোন মহিলা সহজভাষায় ‘বুদ্ধচরিতামৃত’ লিখে প্রশংসালাভ করেছেন।

কাশীতে মহারাষ্ট্রে এবং দক্ষিণ ভারতে আজও সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞা বহু বিদুষী নারী দেখতে পাওয়া যায়, বাংলা বিহার উড়িষ্যাতেও সংস্কৃতজ্ঞা এবং সংস্কৃত উচ্চ উপাধিধারিণী নারী কয়েকজন আছেন, তাঁদের সকলের সন্ধান আমাদের সঠিক জানা নেই। মাত্র একটী সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিতা বালিকার সংবাদ ও দর্শন আমরা পেয়েছি, তাঁর নাম শ্রীমতী সরলা দেবী, সাত বৎসর বয়সে ঐ বালিকা মাতৃভাষার মত সংস্কৃতে অনর্গল কথা বলতে পারতো, সম্প্রতি চৌদ্দ বৎসর বয়সে কাশীধামে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-শান্তি মহা-যজ্ঞ সভায় তাঁকে ভারতীয় সর্ব্ব-দর্শনজ্ঞানসম্পন্না এবং দার্শনিক বর্ক্তৃতা সংস্কৃত ভাষায় অন্যূন এক ঘণ্টাকাল ধরে দিতে দেখা গেল। ইনি বোম্বাই প্রদেশের কোন সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা।

সংস্কৃত কবিদের সম্বন্ধে আলোচনা দীর্ঘ হ’ল। উপায় নেই! একদিন সমস্ত ভারতের বিদ্বজ্জনকে যে ভাষা একসূত্রে বেঁধেছিল, আ-চণ্ডাল জনসাধারণকে ধর্মশিক্ষা দিয়েছিল,—গঙ্গা-যমুনাগোদাবরী-সরস্বতী-নর্মদা-সিন্ধু-কাবেরীর জলে পুণ্যস্নান করিয়ে, অযোধ্যা-মথুরা-মায়া-কাশী-কাঞ্চী-উজ্জয়িনী-পুরী ও দ্বারাবতীতে তীর্থভ্রমণ করিয়ে সমস্ত ভারতভূমিকে—মনীষী ভূদেবের ভাষায় ‘সতীদেহরূপা জননীকে প্রতিদিন প্রভাতে সন্ধ্যায় শ্রদ্ধা নিবেদন ক’রতে শিখিয়েছিল,—আজও ভূদেবের দেশাত্ম-বোধের মন্ত্র-শিষ্য বঙ্কিম বাংলার সাহিত্য-সম্রাট হ’য়েও যার কৃপায় ‘বন্দেমাতরম্’ মহামন্ত্রের রচয়িতা ব’লে জগদ্বিখ্যাত (যে মন্ত্রের সাধনায় লক্ষ লক্ষ নারীপুরুষ কারাবরণ করেছে, শত শত নরনারী মৃত্যুকে তুচ্ছ করেছে) সেই সংস্কৃত ভাষাকে অন্তরের অন্তর দিয়ে একান্তরূপে শ্রদ্ধা করি। তার সম্বন্ধে আলোচনা শিক্ষিতা নারীদের মধ্যে ক্রমশঃ কমে আসছে ব’লেই এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন বোধ হ’ল। সংস্কৃত সাহিত্যে নারী কবিদের দান সম্বন্ধে আলোচনা ক’রলে আমরা দেখতে পাই ঋগ্বেদের যুগ থেকে অতি আধুনিক যুগ পর্যন্ত দেবভাষা চর্চার ধারা নারীরা অব্যাহত রেখেছেন। উত্তরভারতে পারস্য ও গ্রীকসভ্যতার প্রভাব এর ক্ষতি ক’রতে না পারলেও অনুলোমবিবাহের ফলে বহু অনার্য নারী আর্যসমাজে স্থানলাভ ক’রে সংস্কৃতচর্চার প্রতি অবহেলা দেখানোর ফলে তাঁদের প্রভাবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও শিক্ষিত পুরুষের ভাষা সংস্কৃত এবং নারীর ভাষা প্রাকৃত দাঁড়িয়ে গেছল, প্রাচীন নাটকে আমরা সর্বত্র এর দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। ‘নারীর মুখে সংস্কৃত ভালো শোনায় না’ এমন কথাও সে যুগে শোনা গেছে। নারীর সংস্কৃত জ্ঞানের কিছু কিছু প্রমাণ আমরা দিয়েছি, নারীর মুখে সংস্কৃত স্তব কত সুন্দর শোনায় তা দক্ষিণী সংস্কৃতজ্ঞা গায়িকাদের গান যাঁরা শুনেছেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন। মুসলমান যুগে উত্তর ভারতে অবরোধপ্রথার বৃদ্ধি নারীর সংস্কৃতচর্চায় বাধা দিলেও তাকে সমূলে নির্মূল ক’রতে পারেনি, কিন্তু দক্ষিণ ভারতের স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন রাজাদের সভায় এবং দেবমন্দিরে অবরোধহীনা নারীরা চিরদিনই অবাধে সংস্কৃত ভাষায় কাব্য চর্চা ক’রে রাজসম্মান লাভ করে এসেছেন। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে

সংস্কৃত চর্চা দেশে ক'মে আসায় আমরা আজ তার মূল্য সম্বন্ধে সত্য দৃষ্টি হারিয়েছি, আমাদের অতীতকেও সেই সঙ্গে ভুলে যেতে বসেছি।

ভারতীয় সংস্কৃত কবিদের পর বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার কবিদের সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে প্রাকৃত ভাষার কবিদের সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। এঁদের অনেকেরই সময় নির্ণীত হয়নি। খৃষ্টের পাঁচ ছ'শ'বছর আগে 'থেরী কবিরা' যখন অন্যতম মাগধী প্রাকৃত 'পালি' ভাষায় কাব্য রচনা করেন সেই যুগেই অন্যত্র অন্যান্য নারীরা প্রাকৃতে কাব্যরচনা করতেন ব'লে মনে হয়। নিম্নোল্লিখিত কবিদের মধ্যে একমাত্র অবন্তিসুন্দরী ছাড়া আর সকলের কথাই রাজা শাতবাহনের লেখায় পাওয়া যায়, অর্থাৎ তাঁরা গুপ্তযুগের পূর্ববর্তী কালে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। যাঁদের লেখা পাওয়া গেছে তাঁরাই প্রাকৃত কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা ছিলেন কিনা সে কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না, তবু তাঁদের রচনা থেকেই আমরা প্রাকৃত কবিতার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারি। তাঁদের নাম অনুলচ্ছী (অনুলক্ষ্মী) অসুলদ্ধী (?), ওন্দিসুন্দরী (অবন্তিসুন্দরী) মাহবী (মাধবী) পহআ (প্রহতা) সসিপ্পহা (শশিপ্রভ), রেবা, রোহা, (রোহিণী?) বদ্ধাবহি (?)। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাতা ছিলেন কাব্যমীমাংসা-লেখক ব্রাহ্মণ রাজশেখরের ক্ষত্রিয়া-পত্নী চৌহানকুল-মুকুটমণি বিদুষী অবন্তিসুন্দরী। রাজশেখর তাঁর অনুরোধে কর্পূরমঞ্জরী নাটক লিখেছিলেন, তাঁর ভাই ধনপালকেও তিনি প্রাকৃতে কাব্যরচনায় উৎসাহ দিয়েছিলেন। কাব্যমীমাংসায় রাজশেখর প্রামাণ্য ব'লে তিনবার উল্লেখ করেছেন, হেমচন্দ্র 'দেশীনামমালায়' অবন্তিসুন্দরীর সঙ্গে তাঁর মতভেদের কথা বলেছেন। তখনকার পণ্ডিত সমাজে তাঁর মত শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত এবং বিবেচিত হ'ত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর কবিতার একটি উদাহরণ দিচ্ছি:

"কিং তং পি বীসরিয় নিক্কিব জং গুরু অণস্ম মজ্ঝভি।
অহিধাবিউন গহিও তং ওছর-উত্তরীয়াএ ॥"

(বিরহিণী ব'লছেন) "হায় নিষ্ঠুর, তুমি কি ভুলে গেছ (লজ্জাহীনার মতো) গুরুজনদের মধ্য দিয়ে স্রস্ত-উত্তরীয়ে ছুটে গিয়ে (একদিন) আমি তোমাকে ধরেছিলুম।"

অনুলক্ষ্মীর কয়েকটি বিখ্যাত কবিতার মধ্যে একটিতে তিনি, মানুষ মিথ্যা আশার দ্বারা কি ভাবে প্রবঞ্চিত হয় তার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন:

"হসিঅং সহৎথ-তালং সুক্থবডং উবগ-এহিং পহিএ হিং।
পত্তঅ-ফলানং সরিসে উড্ডীণে সুঅ-বিন্দস্মি ॥"

পত্রহীন শুক্‌নো বটগাছে এক ঝাঁক টিয়া পাখী বসেছিল; দূর থেকে শ্রান্ত পথিকেরা গাছের পাতা এবং ফল মনে ক'রে (সবুজ দেহগুলি পাতার এবং লাল ঠোঁটগুলি ফলের মতো দেখানোয়) (বিশ্রামের আশায় উৎফুল্ল হ'য়ে) হাততালি দিয়ে হেসে উঠতেই পাখীরা (গাছ খালি করে) উড়ে গেল। অনুলক্ষ্মীর কবিতায় অন্ততঃ দেড় হাজার বছর আগেকার অতিআধুনিকা নায়িকা পরের স্বামীকে প্রলুব্ধ করার জন্য তোষামোদের ছলে আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন:

"জং তুজ্‌ঝ সই জ্যাআ অসইও জং চ সুহঅ অম্‌হেবি।
তা কিং ফুট্টউ বীঅং তুজ্‌ঝ সমানো জুয়া নৎথি॥"

"হে সুপুরুষ, তোমার স্ত্রী যে সতী আছেন আর আমরা যে অসতী হচ্চি, তার কারণ সুস্পষ্ট; তোমার মতো (সুন্দর) যুবক আর নেই (সেই জন্যই তাঁর মন অন্যকে দেখে টলে না।)।

মাধবীর লেখা নিম্নলিখিত কবিতাটিতে দূতী নায়িকার পক্ষ হয়ে এসে কাঠখোট্টা প্রণয়ীকে প্রণয়ের উপযুক্ত রীতি শেখাচ্ছেন:

"ণুমেন্তি যে পহুতং কুবিঅং দাসাধ্বজে পসার অন্তি!
তেবিবয়ং মহিলাণ পিআ সেসা সামিব্বিঅং অরাআ॥"

যারা প্রভুত্ব গোপন ক'রতে জানে, প্রণয়িনী কুপিতা হলে তাকে দাসের মতো (সেবা ক'রে) সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করে, তারাই মহিলাদের প্রকৃত প্রণয়ী, অন্যেরা কেবল বর্বর স্বামী মাত্র।"

প্রহতার পতিসোহাগিনী চণ্ড-নায়িকা কি ভাবে তিনি স্বামীকে বশে রাখেন, তারই গল্প বান্ধবীদের কাছে ব'লে গর্ব ক'রছেন:

"একং পহরুবিন্নং হৎথং মুহমারু এ ণ বীঅন্তো।
সো বি হসন্তীএ মএ গহিও বীএন কণ্ঠম্মি॥"

"এক হাতে তাকে চড় মারলুম (হাতটা জ্বলে উঠল) হাতে ফুঁ দিতে দিতে আর এক হাত দিয়ে হাসতে হাসতে তার গলা জড়িয়ে ধরলুম, (সে কৃতার্থ হ'য়ে গেল)।"

রেবার কবিতায় অপরাধী নায়ক নায়িকার কাছে ক্ষমা চাইছেন: নায়িকা চ'টে আগুণ হ'য়ে বলছেন:

“কিং দার কঅ অহবা করেসি কারিস্‌সি সুহঅ এত্তাহে।
অবরাহাণঁ অলজ্জির সাহসু কহএ খমিজ্জন্ত ॥”

“হে নির্লজ্জ, তোমার কোন অপরাধ আমি ক্ষমা ক'রব? যে অপরাধগুলি তুমি আগে করেছ, না যে অপরাধগুলি তুমি এখন ক'রছ, না, যে অপরাধগুলি তুমি ভবিষ্যতে করবে?”

শশিপ্রভার কবিতায় অত্যন্ত সেকেলে নায়িকা স্বামীর অবহেলা সহ্য ক'রেও তাঁকে ভালো না বেসে থাকতে পারেন না। তিনি ব'লছেন:

“জহ জহ বা এই পিত্ত অহ তহ নচ্চামি চঞ্চলে পেম্মে।
বল্লী বলেই অঙ্গং সহাব-যদ্ধে বিরুক্‌খস্তি ॥”

“প্রিয় যেমন বাজান, তার প্রেম চঞ্চল জেনেও আমি তেমনি নাচি। গাছ স্বভাবতঃই স্তব্ধ (সাড়া দেয় না) তবু লতা তাকে জড়িয়ে থাকে।”

প্রাকৃত কবিদের কবিতার ভাব অনেক সময় খুব গভীর এবং মধুর হ'লেও সংস্কৃত কবিতার মতো গম্ভীর এবং উদাত্ত ধ্বনির অভাবে সেগুলি বিশেষ করে বর্তমান যুগের আমাদের কানে বেসুরো এবং দুর্বল লাগে। যে যুগে ভারতবর্ষের সভ্যতা গৌরবের চরম শিখরে উঠেছিল, সেই যুগেই ভারতবর্ষের সর্বত্র মেয়েদের প্রাকৃতে কথা ব'লতে দেখা যায়, অবন্তিসুন্দরীর মতো সংস্কৃতজ্ঞা নারীরাও কাব্য রচনার সময় প্রাকৃত ব্যবহার করতেন। জনসাধারণের সঙ্গে নিজেদের ঐক্য স্থাপনের জন্য এই ব্যবহার সমর্থনযোগ্য হ'লেও একই বাড়ীতে শিক্ষিত পুরুষ সংস্কৃতে এবং নারী প্রাকৃতে কথা কইতেন, এটা যেন কেমন অস্বাভাবিক লাগে। বলা বাহুল্য সংস্কৃত যেদিন থেকে ঘরের মধ্যে প্রাকৃতকে আসন ছেড়ে দিয়ে নিজে দরবারে গিয়ে বসল, সেদিনই তার অধঃপতনের সূত্রপাত আরম্ভ হ'ল। আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে বাংলা ভাষা প্রাকৃতের থেকে নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ‘ভিন্ন’ হ'তে আরম্ভ করে, গত শতাব্দীর প্রথম দিকেও বাংলা গদ্যে প্রাকৃতের প্রভাব দেখা যায়। গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে প্রধানতঃ বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বঙ্কিম, মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় বহু সংস্কৃত শব্দ আহরণ করে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ এবং সবল হয়েছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। বাংলায় বর্তমান যুগের নারী কবিদের লেখায় ভাষার গভীরতা যেমনই থাক না থাক, ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য গাম্ভীর্য এবং মাধুর্য প্রাকৃত কবিদের লেখার চেয়ে বেশী। এই সংস্কৃতের সংস্কৃতি ভেঙে দিয়ে নূতন

ক’রে বাংলায় প্রাকৃত প্রভাব এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক প্রয়োজনে বিদেশী শব্দের নির্বিচার প্রয়োগ ফিরিয়ে আনার যাঁরা সমর্থন করছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য যতই সাধু হোক, তাঁদের দ্বারা মাতৃভাষার কল্যাণ সাধিত হবে না।

বাংলা দেশে যে সব বিদুষী এবং কবি বাংলা ভাষার সেবায় খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের কথা ব’লবার আগে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার মুসলমান যুগে যেসব লেখিকা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা জনসাধারণের কাছে খ্যাতিলাভ করেছিলেন তাঁদের কথা কিছু কিছু বলা দরকার। প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে দক্ষিণ দেশীয় তামিল তেলুগু প্রভৃতি ভাষায় বারো শ’ বছর আগেও ভালো ভালো কাব্য রচিত হয়েছে, সে-কথা পূর্বে বলেছি। তামিল সাহিত্যে আণ্ডাল এবং অভ্ভয়ার এবং তেলুগু সাহিত্যে মল্লা বা মল্লীর নাম সব চেয়ে বিখ্যাত।

সংস্কৃতের সমবয়স্ক সুপ্রাচীন দ্রাবিড় ভাষাগুলির কথা বাদ দিলে, মোটের ওপর দেখা যায়, দ্বাদশ শতাব্দীর পর অর্থাৎ মধ্য যুগে ভারতের তত্ত্বালোচনার এবং রসসৃষ্টির কাজ সংস্কৃত ভাষার চিরপরিচিত খাত ছেড়ে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার খাত দিয়ে প্রবাহিত হ’তে আরম্ভ ক’রল। এই সময়ে পরাধীনতার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ সমাজে এবং ধর্মে অনেক সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা এবং মূঢ়তা প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল, যার প্রভাব আজও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। পৌরাণিক যুগে এবং বৌদ্ধ যুগে মানুষকে দেবতার উপরে স্থান দেবার যে চেষ্টা চলেছিল, তার পরিবর্তে স্বেচ্ছাচারী প্রণতপ্রতিপালক রাজগণের আদর্শে সে যুগের ধর্মের হিংস্র দেবতার পূজা লোভে মানুষের ওপর অন্যায় অত্যাচার করতে আরম্ভ করলেন, সমাজে যে নিরীহ নিপীড়ন চলছিল, সাহিত্যেও তার ছাপ পড়ল। শীতলা, মনসা, ঘেঁটু থেকে আরম্ভ করে বন-বিবি, সত্যপীর, গাজী প্রভৃতি অমঙ্গলের দেবতা,—বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়, কুমীরের দেবতা কালুরায়,—ক্ষেত্রপাল পঞ্চানন্দ, হাজরা প্রভৃতি তথাকথিত প্রেতযোনি,—সে সময়ে ছলে বলে, কৌশলে অসহায় অশিক্ষিত লোকের কাছে পূজা আদায় কর’তে লাগলেন। দেব দেবীদের ভক্তেরা ব্যভিচার বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি করেও নিষ্কৃতি পেল, আর যাঁরা তাঁদের পূজা দিতে সম্মত হলেন না, তাঁরা ভালো লোক হলেও তাদের দুর্দ্দশার সীমা রইল না। এই তিমিরাচ্ছন্ন যুগেই আবার নানক, চৈতন্য, কবীর, দাদু, সুরদাস প্রভৃতি মহাপুরুষেরও জন্ম হয়, তাঁদের সৃষ্ট ধর্মপ্লাবনে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ভেসে যায়। এই যুগে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে সব নারী সাহিত্য-চর্চা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন উচ্চস্তরের সাধিকা, তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে ভক্তি-তত্ত্বই প্রধান। এই সব নারী সাহিত্যিকা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় তাঁদের দান রেখে গেছেন, তার সবগুলির সঙ্গে পরিচয় আমাদের নেই। কিন্তু অনবদ্যরসসৃজন-বৈশিষ্ট্যে যাঁর রচনা প্রাদেশিক গণ্ডী এমন কি ভারতের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশ্বের ভক্তি-সাহিত্যের অমরাবতীতে স্থান পাবার যোগ্য ব’লে বিবেচিত হয়েছে তাঁর নাম জানে না এমন সাক্ষর ও নিরক্ষর নরনারী বাংলাদেশে অল্পই আছেন। আমরা মীরাবাইয়ের কথা বলছিলাম। রাজপুতনার এক পরম বৈষ্ণব রাঠোর ভূস্বামীর গৃহে আনুমানিক ১৫০৪

খৃষ্টাব্দে এই পরম ভক্তিমতী নারীর জন্ম হয়। তাঁর অলৌকিক সৌন্দর্যখ্যাতি শুনে মেবারের রাণা সংগ্রামসিংহ তাঁকে পুত্রবধূরূপে নিয়ে আসেন, কনিষ্ঠ পুত্র কুমার ভোজের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে। বৈষ্ণব মীরার শৈব শ্বশুর-কুলে এসে তখন থেকেই বহু নির্য্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল, দশ বছর পরে স্বামীর অকালমৃত্যুতে তাঁর সংসারের সব সুখই ফুরিয়ে গেল, শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন পরম ভক্তিমতী, পার্থিব স্বামীকে হারিয়ে তিনি বিশ্বের স্বামীর সন্ধানে যেদিন ভক্তির উদার রাজপথে যাত্রা করলেন সেদিনও আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাঁকে ধিক্কার দিল, কিন্তু কোন বাধা মানবার মতো মনের অবস্থা তাঁর তখন ছিল না। রাজগৃহে বহু সাধু সজ্জনের সমাগম আরম্ভ হ'ল, তাঁর ভাসুর বিক্রমসিংহ তাঁকে লজ্জাহীনতার জন্য তিরস্কার করেন, শেষে হত্যা করবার জন্য বিষও পাঠান, ননদ উদাবাই তাঁকে অনেক রকম করে বোঝাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। অতিরিক্ত নির্যাতনে বিদ্রোহী মীরা শুধু বললেন:

"হেরী ম্যাঁয় তো প্রেমদিওয়ানী, মেরা দরদ না জানে কোঈ।"

সখি, আমি যে প্রেমে পাগল হয়েছি, আমার ব্যথা কেউ বুঝ্‌বে না।

"প্যারে দরশন দীজ্যো আয়,
তুম বিন রহ্যো ন জায়।
জল বিন কঁবল চন্দ বিন রজনী;
ঐ সে তুম দেখ্যা বিন সজনী"

হে প্রিয় এসে দেখা দাও, তুমি বিনা যে আর থাক্‌তে পারি না, জল বিনা যেমন কমল, চন্দ্রহীন যেমন রাত্রি, হে প্রিয় তোমা বিনা আমারও যে সেই অবস্থা।

হরির বিরহে উন্মাদিনী মীরার আকুল প্রার্থনা আজও লক্ষ লক্ষ নরনারীর পথের পাথেয়, সেদিন মীরার কণ্ঠের গান যারা শুনেছিল তাদের সৌভাগ্যের তুলনা নেই!

বহু সাধনায় অবশেষে তাঁর সিদ্ধি এল, মীরা অন্তরের মধ্যে 'হরি আওয়ন কি আওয়াজ' শুন্‌তে পেলেন। নিশীথ রাত্রে 'শ্যামল বনে' তাঁর 'শ্যামলের বাঁশি' শুনে মীরা গৃহত্যাগ করলেন। তারপর দীর্ঘজীবন তাঁর কেটেছে পথে, আশ্রমে, মন্দিরে—বৃন্দাবনে, দ্বারকায়। নিজের ব'লতে তিনি কিছুই রাখেন নি, ঈশ্বরপ্রেমে ঐশ্বর্য, লোক-লজ্জা, গৃহসুখ সবই তিনি ছেড়েছিলেন। তাঁর প্রিয়তমের সেবায় যে আনন্দ তিনি পেয়েছিলেন, তাঁর গানগুলি আজও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে:

তাঁর ‘মহারো’ জনম মরণ কি সাথী, তাকে নহিঁ বিসরূ দিনরাতী।
তুম দেখ্যা বিন কলন পরত হ্যায়, জানত মেরী ছাতি’।

আমার জন্ম-মরণের সাথী, তোমাকে দিনে রাত্রে কখনও ভুলব। আমার হৃদয় জানে তোমাকে না দেখ্‌লে সময় কাটে না।

“মহাঁনে চাকর রাখো জী”—প্রভু আমায় চাকর রাখো।
“জো তুম তোড়ে। পিয়া ম্যাঁয় নেহি তোড়ু”

প্রিয় তুমি এ বাঁধান ছিঁড়তে হয় ছেঁড়ো, আমি ছিঁড়ব না। “চিতনন্দন আগে নাচুঁংগী”—চিতনন্দনের সাম্‌নে আমি নাচব। “মেরে তো গিরধর গোপাল দুসরা ন কোঈ”—আমার তো আছেন শুধু গিরিধারী গোপাল, আর কেউ নেই।

“বরষে বদরিয়া সাওয়ন-কী মন ভাওয়ন-কী।
শাওয়ন মে উমগ্যো মেরী মনোয়া ভনক সুনী হরি আওয়নকী।”

শ্রাবণের বাদল বর্ষণ ক’রেছে, আমার মন ভরানো শ্রাবণের মেঘ! আজ শ্রাবণে আমার মন উন্মুখ হ’য়ে প্রিয়তমের আগমন ধ্বনি শুন্‌ছে—“মেহা বরসি ওয়ো করেরে, আজ তো রসিয়ো মেরে ঘরে রে,” মেঘ বর্ষণ করছে, আজ প্রিয়তম আমার ঘরে প্রভৃতি গানের সমকক্ষ গান পৃথিবীর যে কোনো দেশের সাহিত্যে দুর্লভ।

“তেরে ভূবণ বৃন্দাবনসে বলিয়াকে সুর বাজি”।

রবীন্দ্রনাথের যে কোনো শ্রেষ্ঠ রচনার পাশে সমান আসন পেতে পারে। এই রাজ তপস্বিনীর অলৌকিক সৌন্দর্য, কণ্ঠস্বরের মোহিনীশক্তি, সর্ব্বভূতে সমভাব-সূচক বিনয় নম্র ব্যবহার, সর্ব্বোপরি তাঁর অন্তরের অনাবিল নিঃস্বার্থ ঈশ্বরপ্রেম সে যুগের মানুষকে কতখানি প্রভাবান্বিত করেছিল, আজ তা আমরা কল্পনা ক’রতে পারব না। মেবারের রাজবংশ অবশেষে একদিন তাঁর গৌরবে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করেছিল, তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্য দ্বারকায় দূত গেছল। মীরা সে দিন শ্রীমন্দিরে গেয়েছিলেন: “প্রিয় যদি আমায় শুদ্ধ জেনে থাকো তবে আমায় তুলে নাও, তুমি ছাড়া আমার যে কেউ নেই।...হে মীরার প্রভু, গিরিধর নাগর, একবার যখন তুমি মিলেছ, আর আমায় ছেড়ে যেয়ো না।” কথিত আছে মীরা নাকি তখন রণ্‌ছোড়জীর মূর্তিতে মিলিয়ে যান। অনুমান ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর তিরোধান ঘটে।

মীরাবাইয়ের পরই বিদুষী করমেতি বাই ভারতীয় ভক্তিসাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। দাক্ষিণাত্যের খাজল গ্রামে পরশুরাম পণ্ডিতের কন্যারূপে তিনি জন্মেছিলেন, শৈশবে বৈষ্ণব সাহিত্যে পারদর্শিনী হ'য়ে যৌবনে ধর্মানুরাগে ইনি পতিগৃহ ত্যাগ করেন। নানা বিপদ উত্তীর্ণ হ'য়ে অবশেষে তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর পিতা তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসে তাঁর উন্নত জীবনের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে ফিরে যান এবং তাঁদের দেশের রাজাকে সেই সংবাদ দেন। রাজা করমেতিবাইকে দেখতে এসে তাঁর জন্য যে কুটির তৈরি করিয়ে দিয়ে গেছলেন, আজও বৃন্দাবনে তার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। তাঁর ধর্মোপদেশ আজও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বহু বৈষ্ণবের মুখে শোনা যায়।

হিন্দী ভাষায় কবিতা রচনা ক'রে মুসলমান রাজত্বকালে যে কয়জন নারী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সহজীবাই, দয়াবাই, চম্পাদেই, প্রবীণাবাই, শেখ এবং তাজ নাম্নী কবিদের নাম উল্লেখযোগ্য। সহজীবাই রাজপুতানার 'দুসরকুল' নামক স্থানে জন্মেছিলেন, মহাযোগী চরণদাসের শিষ্যত্ব নিয়ে তিনি দীর্ঘকাল যোগসাধনা ক'রে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর রচিত বহু দোঁহা এখনও উত্তর ভারতে প্রচলিত! ভক্তিমতী দয়াবাইয়ের সরস ভক্তিপূর্ণ দোঁহাগুলিও হিন্দী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

ষোড়শ শতাব্দীতে বুন্দেল খণ্ডের রাজা ইন্দ্রজিৎসিংহের সভায় প্রবীণাবাই নাম্নী বিখ্যাত নারীকবি বহু হিন্দী কবিতা রচনা করেন। তাঁর খ্যাতি শুনে বাদশাহ আকবর তাঁকে দিল্লীতে ডেকে পাঠান। প্রবীণার গমনে বাঁধা দেওয়ায় ইন্দ্রজিৎসিংহের দশ লক্ষ টাকা জরিমানা হয়, অবশ্য তাঁর সভাকবি কেশবলাল এবং আকবরের সভাসদ বীরবলের অনুনয়ে আকবর পরে সেই অর্থদণ্ড থেকে তাঁকে মুক্তি দেন। প্রবীণাবাই মোগলদরবারে গিয়ে পাণ্ডিত্যে এবং কবিত্বে সকলকে মুগ্ধ করেন এবং প্রচুর অর্থ এবং যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন। আকবরের সভাসদ রাজপুত রাজবংশীয় কবি পৃথ্বীরাজের পত্নী চম্পাদেই (দেবী)র বীররসাত্মক কবিতাগুলি ঐ যুগেরই লেখা।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত হিন্দীকবি আলমের পত্নী 'শেখ' প্রেমের কবিতা লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন। হিন্দু আলম তাঁর কবিত্বে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে বিয়ে করবার জন্য মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ব'লে প্রসিদ্ধি আছে। ঐ শতাব্দীর অন্যতমা সুবিখ্যাতা হিন্দীকবি তাজ তাঁর বৈষ্ণব কবিতাগুলির জন্য অমর হয়ে আছেন।

ইসলামের অসি ঝণৎকারের মধ্যে ভারতের ভাগ্যবিধাতার ক্রূর বক্র হাসি স্ফুরিত হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু শিল্প এবং জগতে অতুলনীয় বৌদ্ধ বিহার, স্তূপ, সঙ্ঘারাম, শিল্পসারভূত মূর্তিরাজি চূর্ণবিচূর্ণিত ও মহাকালের নর্তিত চরণক্ষেপের রুদ্রতালে ধূলিকণায় পরিণত হয়ে গেল। সহস্র সহস্রাব্দীর সমস্ত সাধনা তার প্রগতি হারালো। সমাজ, সাহিত্য, শিল্প এবং এদের যে একত্রিত ক'রে রেখেছিল সেই সংযোগসেতু ধর্ম এক সঙ্গে সমস্তই বিপর্যস্ত হয়ে গেল এবং তার সঙ্গে চিরদিন যা' হয়ে

এসেছে এবারও তাই ঘট্‌ল! এই বিপর্যয়ের মহাহবে উৎসর্গিতা হ’ল ভারতের নারী;—একান্ত রূপেই তার দশা বিপর্যয় ঘটে গেল। সর্ব সত্ত্ব হারিয়ে সে হ’ল অন্দরের বন্দিনী। পূর্ব পূর্ব আক্রমণকারীদের ভারত আক্রমণে তার এ দশা হয়নি। তবে কথা এই, পুরুষের যখন দাসত্ব ঘটে, তখন নারীরও সেই সঙ্গে সঙ্গে দাসীত্ব ঘটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। অধীনতার প্রথম ফল দুর্বল পাত্রতেই ফলে। ক্ষয়রোগের মতই পলে পলে তাকে জীবনী শক্তি হারা করে।

গিরিশৃঙ্গ-বিদারী উন্মত্ত নির্ঝরধারা ক্রম-নিম্নভাগে যতই প্রবাহিত হয়ে গেল ততই তার উন্মাদনা হ্রাস পেল। অবশেষে প্রায়-শান্ত সরিৎ দেশমাতৃকার যুগল সন্তানরূপে সরিৎপতির সঙ্গ লাভে পাশাপাশি যাত্রাও করল। কিন্তু ঝড় থামলেও তার রুদ্রতাণ্ডবের ক্ষত ও ক্ষতি সঙ্গে সঙ্গেই কিছু মিলিয়ে যায় না। যদিও এর ফলে এক দিক দিয়ে কাবুল, কান্দাহার, নালন্দা, মথুরা, সারনাথের অতুলনীয় কীর্তিসমূহ বিধ্বস্ত হ’ল, আবার আর এক দিক দিয়ে দিল্লী, আগ্রা, সেকেন্দ্রা, ফতেপুরসিক্রি, লাহোরের সুরম্য হর্ম্য, মিনার, মসজিদে আরব, পারস্যদেশাগত শিল্পসম্ভারে বিচিত্র চিত্রকলায় ভারতবক্ষ বিভূষিতও হ’ল। হিন্দুনারীর প্রতি অত্যাচার এ সময় খুব কম ঘটেনি এ কথাটা স্বীকার ঐতিহাসিক কারণে করতেই হয়, এবং তারই ফলে বাল্যবিবাহ, পর্দাপ্রথা, নারীর নাম বাহিরে প্রচার হওয়া, এমন কি এই ভয়ে বিদ্যাশিক্ষা পর্যন্ত মেয়েদের পক্ষ থেকে বন্ধ হয়ে যায়, লজ্জাকর হ’লেও ইহাই ঐতিহাসিক সত্য। একে চাপা দিলেও চাপা পড়ে না এবং আজকের দিনে এর জন্য বিধাতার ইচ্ছা অনিচ্ছা ব্যতীত অপর কাহাকেও দায়ী করাও চলে না। পূর্বপুরুষের কোনও ভালমন্দ কাজের কৈফিয়ৎ উত্তর পুরুষরা দিতে বাধ্য নয়, শুধু সেই ভুলকেই সে শুধরে নিতে পারে।[৫]

ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনে নারীর অধিকার খুব বেশী সঙ্কুচিত হয়েছিল এ কথা সত্য, কিন্তু তার প্রধান ক্ষেত্র ছিল রাজধানী এবং বড় বড় সহর। সুদূর পল্লীতে, যেখানে মুসলমান রাজপুরুষদের যাতায়াত ছিল না, সেখানে অবরোধ-প্রথারও ততদূর কড়াক্কড়ি হয়নি। ছেলে মেয়ে সেখানে দশ এগার বছর বয়স পর্যন্ত এক সঙ্গেই পড়ত এবং আজও পড়ে। বাংলার নানা উপকথায়, ‘সখী সোনার গল্পে’ এবং ‘চন্দ্রাবতী জয়চন্দ্রে’ পাঠশালায় বাল্যপ্রণয়ের ব্যাপারে আমরা এর প্রমাণ পাই। সহরের সম্ভ্রান্ত হিন্দু ঘরে তখন জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন পূর্বে উক্ত “খড়দার মা গোঁসাইদের” নেতৃত্বে শিক্ষিতা বৈষ্ণবীরা এবং মুসলমান ঘরে ‘আতুন’ বা গৃহশিক্ষয়িত্রীরা। এই যুগের রাজা বাদশাদের অন্তঃপুরে যে সব বোরখা-ঢাকা পর্দানসীন মেয়েরা বাস করতেন, তাঁদের সকলের সংবাদ আমরা পাই না, তবে যেটুকু পরিচয় পাই, তাতে এ কথা জোর ক’রে বলা চলে যে তাঁরা নিতান্ত অশিক্ষিতা ছিলেন না। পাঠান রাজত্বে অবরোধ প্রথা অগ্রাহ্য ক’রে বাইরে এসেছিলেন সুলতানা রজিয়া। তিনি যে শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তা নয়, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, চরিত্রবলে রাজনীতি এবং শাস্ত্রজ্ঞানে তিনি সেই কুৎসা দলাদলি ষড়যন্ত্রের যুগেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি চৌগান (পোলো) খেলতেন, বাজপাখী নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেন, প্রকাশ্য দরবারে বসে পুরুষের

বেশে সাম্রাজ্য শাসন করতেন, আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখতেন, অত্যাচারীকে দণ্ড এবং গুণীকে পুরস্কার দিতেন। তিনি নিজে বিদুষী ছিলেন, সাহিত্য আলোচনায় এবং সাহিত্যিকদের উৎসাহ দানে তাঁর অসামান্য পারদর্শিতা ছিল; ফেরিস্তার ভাষায় "তাঁর একমাত্র অপরাধ যে তিনি স্ত্রীলোক।"

এই যুগে আলাউদ্দীন জাহানসোজের দৌহিত্রী 'মাহ্‌মালিক' বিদুষী ব'লে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। 'তবকাৎই-নাসিরী'র লেখক মিন্‌হাজ তাঁর দয়ায় লালিত পালিত হয়েছিলেন, তিনি 'মাহমালিকের' পাণ্ডিত্যের এবং সুন্দর হস্তাক্ষরের বহু প্রশংসা করেছেন। মালবাধিপতি সুলতান গিয়াসুদ্দীনের প্রাসাদে পঞ্চদশ শতাব্দীতে পঞ্চদশ সহস্র(?) নারী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কবি, শিল্পী, শিক্ষয়িত্রী, গায়িকা, নর্তকী, ধর্মজ্ঞা সকল স্তরের নারীর সমাবেশ হয়েছিল।

মোগল আমলে শাহ্‌জাদীদের সতেরো আঠারো বছর বয়সের আগে বিয়ে হ'ত না, অনেকের আজীবন বিয়েই হ'ত না, তাঁরা লেখাপড়া, রাজনীতি বা ধর্মনীতি চর্চা ক'রেই জীবন কাটাতেন। এঁদের মধ্যে বয়সের দিক দিয়ে অগ্রণী সম্রাট্ বাবরের মেয়ে গুলবদন বেগম। তাঁর লেখা 'হুমায়ুন নামা' মোগল আমলের একখানি শ্রেষ্ঠ ইতিহাস। বর্তমান পুঁথিটি খণ্ডিত (আনুমানিক ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে লেখা) বাবরের সময় থেকে আরম্ভ হয়ে হুমায়ুনের দ্বিতীয়বার ভারত বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইতিহাস ঐ বইটিতে পাওয়া যায়। 'হুমায়ুন নামা' ছাড়া অনেক ফার্সী কবিতা তিনি লিখেছিলেন। তাঁর একটি কবিতার একটি চরণ এই:

"হর্ পরী কে উ বা-আশিক-ই-খুদ ইয়ার নীস্ত।
তু ইয়াকীন্ মীদান্ কে হেচ্ অজ্

উমর বর্‌খুর্‌দার নীস্ত॥"

প্রত্যেক পরীই নিজের প্রেমিকের প্রতি বিমুখ। নিশ্চয় জেনো, জীবনরূপ ফল কেউ পূর্ণরূপে আস্বাদন করে না। অর্থাৎ নশ্বর জীবনে যেটুকু পারো সুখভোগ ক'রে নাও।

গুলবদনের নিজের একটি গ্রন্থাগার ছিল, তার জন্য নানা স্থান থেকে তিনি অনেক বই সংগ্রহ করেছিলেন। আকবরের সময়ে শাহ্‌জাদীদের আলাদা পড়বার ঘর ঠিক থাকতো, ফতেপুরশিক্রীতেও এই বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট স্থান ছিল। সম্রাট আকবরের সময়ে তাঁর অন্তঃপুরে সব চেয়ে বিদুষী এবং বুদ্ধিমতী নারী ছিলেন তাঁর পিস্‌তুতো বোন এবং পত্নী সলীমা সুলতানা বেগম। অপুত্রকা সলীমা সপত্নীপুত্র সলীমকে নিজ সন্তানের মত ভালো বাসতেন, সলীম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রলে তিনি নিজে এলাহাবাদে গিয়ে তাঁকে সুপরামর্শ দেন এবং আকবরের কাছে ফিরিয়ে আনেন। সলীমা বহু বিচিত্র বিষয়ের বই সংগ্রহ ক'রেছিলেন এবং পড়েছিলেন।

সম্রাট আকবরের ধাত্রী 'মাহম্ আন্‌গা' এই যুগের একজন বিখ্যাতা বিদুষী ছিলেন। শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি দিল্লীতে নিজের নামে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন, সেই বিদ্যায়তন দীর্ঘকাল বহু দরিদ্রকে বিদ্যাদান ক'রে তাঁর নাম স্মরণীয় করেছে। পরবর্তী সম্রাট জাহান্‌গীরের পত্নী নুরজাহান শুধুই অলোকসামান্যা রূপবতী এবং বীর্য্যবতী শাসনকর্ত্রী ছিলেন না, সুকবি এবং কাব্যের পৃষ্ঠপোষিকারূপে তাঁর নাম অমর হ'য়ে রয়েছে। তার সব চেয়ে বিখ্যাত কবিতা লাহোরে তাঁর সমাধি-গাত্রে ক্ষোদিত আছে:

"বর্ মজারে মা গরীবাঁ না চিরাঘে না গুলে,
না পরে পর্‌ওয়ানা সুজদ্ না সদায়ে বুল্‌বুলে।
'দীন আমি, পতঙ্গের পক্ষ দহিবারে,
জ্বেলো না প্রদীপ মম সমাধি-আগারে।
আকর্ষিতে বুল্‌বুল্ আকুল সঙ্গীত
কোরো না কুসুমদামে ইহারে ভূষিত ॥'

এক জীবনে পতন-অভ্যুদয়ের সঙ্গে এরূপ নিবিড় ঘনিষ্ঠতা তাঁর মতো পৃথিবীর ইতিহাসে অল্প নারীরই হয়েছিল। তিনি একদিন মরুভূমির মধ্যে সদ্যোজাত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়েছিলেন, আর একদিন দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাজ্ঞীরূপে বসেছিলেন; শুধু তাই নয়, সম্রাটকে হাতের পুতুল ক'রে বিশাল ভারতবর্ষের ভাগ্য-বিধাত্রীরূপে সাম্রাজ্যের শাসনকার্য দীর্ঘকাল ধরে সগৌরবে চালিয়েছিলেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর সপত্নীপুত্রের রাজত্বে অবহেলিত উপেক্ষিত অস্তিত্বের সায়াহ্নে রূপ, যৌবন, ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্যের ক্ষণস্থায়িত্ব মর্মে মর্মে অনুভব ক'রে তিনি তাঁর বিদায় অনুরোধ ঐভাবে জানিয়ে গেছেন! নুরজাহান আরবী এবং ফারসী সাহিত্যে সুপণ্ডিতা এবং সুগন্ধি দ্রব্যসমূহের ও বহুবিধ বিচিত্র শিল্পকলার ও অলঙ্কারের আবিষ্কর্ত্রী ছিলেন। তাঁর প্রভাব তাঁর মৃত্যুর পরেও মোগল অন্তঃপুরকে দীর্ঘকাল স্ত্রীশিক্ষার অনুকূল ক'রে রেখেছিল।

পরবর্তী সম্রাট সাহজাহানের বিশ্ব—বিখ্যাতা পত্নী মমতাজমহল শুধু আদর্শ পত্নীই ছিলেন না, পারস্য সাহিত্য-রসজ্ঞা রূপে এবং ফার্সীতে কবিতা রচনার জন্য তার খ্যাতি ছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা জহান্-আরা সিত্তী-উন্নিসা নাম্নী এক বিদুষী শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে শৈশবেই ফার্সী ভাষায় এবং ইস্‌লামীয় ধর্মশাস্ত্রে অধিকার লাভ করেন, পরবর্তী জীবনে এই চিরকুমারী নারী পিতার সেবা এবং ধর্মচর্চা ও কবিতা-রচনাই জীবনের ব্রতরূপে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর রচিত ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে 'মুনিস্-উলআর্‌ওয়া'র মধ্যে আজমীরের ফকির মুইন্-উদ্দীন-চিশ্‌তীর ও তাঁর শিষ্যদের জীবনকাহিনী পাওয়া যায়। জাহান্-আরা বহু প্রাচীন লেখা থেকে সঙ্কলন করে বইটি লিখেছিলেন। তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল, অনাবশ্যক বাগাড়ম্বরহীন। জাহানারা উদারপন্থী সূফীমতের সাধিকা ছিলেন। নিজাম উদ্দীন আউলিয়া-সমাধি ভবনের প্রচীরবেষ্টনীর একপাশে তার তৃণাচ্ছাদিত

সমাধিশীর্ষে শ্বেত মর্মরফলকে ক্ষোদিত তাঁর নিজের লেখা এই কবিতাটি আজও দর্শকের চোখে অশ্রু প্রবাহিত করে:

‘বঘাএর্ সব্জ্যা ন পোশদ্ সসে মজার্-ই-মরা
কে কব্রপোষ-ই-ঘরিবান্ হামী গিয়া বস্ অস্ত।
আল্-ফকীরা আল্ ফাণীয়া জহান-আরা
মুরীদ্-ই-খ্বাজ্-গাম ই-চিশ্ত বিন্ত্-ই-শাহ্-জহান।’

‘আমার সমাধি তৃণ ভিন্ন কোনো (বহুমূল্য) আবরণে আচ্ছাদিত কোরো না, দীন-আত্মাদের পক্ষে তৃণই শ্রেষ্ঠ সমাধিআবরণ। সাহজাহান-দুহিতা চিশ্তী সাধুদের শিষ্যা বিনশ্বর ফকীরা জাহান-আরা।

আওরংজীবের বড় মেয়ে জেব-উন্নিসা ছিলেন তাঁর সময়ের সুবিখ্যাতা বিদুষী। শৈশবে হাফিজা মরিয়মের কাছে তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন, পিতার কাছে একদিন সমস্ত কোরাণখানা স্মৃতি থেকে আবৃত্তি ক’রে তিনি ত্রিশ হাজার মোহর পুরস্কার পেয়েছিলেন। আরবী এবং ফার্সী উভয় ভাষাতেই তিনি কবিতা রচনা এবং শাস্ত্র আলোচনা ক’রে গেছেন। মুল্লা সফীউদ্দিন প্রভৃতি বহু কবি তাঁর দয়ায় নিশ্চিন্ত সুখে সাহিত্যচর্চা ক’রে গেছেন। আওরংজীব পাণ্ডিত্য এবং ধর্মচর্চা ভালো বাসলেও কবিদের ঘৃণা করতেন, জেব-উন্নিসা তাই ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। ‘মখ্ফী’ এই ছদ্মনাম বহু নারীকবিই সে যুগে নিয়েছিলেন, তার মধ্যে জেব-উন্নিসার কবিতা অন্যের কবিতা থেকে পৃথক্ করে নেওয়া শক্ত। ‘দিউয়ান-ই-মখফী’র মধ্যে নিঃসন্দেহ জেব-উন্নিসার বহু কবিতা আছে। ছোটো ভাই আকবরের শ্রদ্ধা ছিল তাঁর প্রতি অসীম, তিনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক’রলে আজমীরের কাছে তাঁর শিবিরে যে-সমস্ত চিঠি পাওয়া যায়, তাতে আওরংজেব জেব-উন্নিসার গুপ্ত চিঠি পান এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে কন্যাকে আমরণ সলিমগড় দুর্গে বন্দী ক’রে রাখেন। সুদীর্ঘ বাইশ বছর বন্দীজীবন যাপন ক’রে ১৭০২ খৃষ্টাব্দে তিনি বন্দী অবস্থাতেই ইহলোক ত্যাগ করেন। নিষ্ঠুর পিতার হাত থেকে সদয় মৃত্যুর হাত এসে তাঁকে মুক্ত ক’রে নিয়ে যায়। তাঁর বন্দীদশার একটি দীর্ঘ কবিতার শেষ কয়টী ছত্র এই:

‘এ বিষাদ-কারা হ’তে মুক্তি তরে বৃথা চেষ্টা তোর,
ওরে মখ্ফী, রাজচক্র নিদারুণ বিরূপ কঠোর;
জেনে রাখ্ বন্দী তুই, শেষদিন না আসিলে আর
নাই নাই, আশা নাই, খুলিবে না লৌহ কারাগার।’(ব্র-ব)

জেব-উন্নিসার ব্যর্থ প্রেমের বহু কবিতার মধ্যে একটির মর্মানুবাদ দিচ্ছি: "প্রেমিকা লায়লি যেমন প্রিয়তম মজনুর জন্য পাগলিনী হ'য়ে মরুপ্রান্তরে ছুটে বেড়িয়েছিল, আমার ইচ্ছা হয়, আমিও তেমনি ক'রে ছুটে বেড়াই; কিন্তু আমার পায়ে সরমের শৃঙ্খল বাধা। এই যে বুল্‌বুল্ সারাদিন গোলাপের কাছে কাছে ঘুরে কানে কানে চুপে চুপে প্রেমালাপ করছে, এ আমারই কাছে প্রেম শিখেছে। এই যে আমার সামনে কাঁচের ফানুসের ভিতর উজ্জ্বল আলোর জ্যোতিতে মুগ্ধ হয়ে শত শত পতঙ্গ আত্মবিসর্জন দিচ্ছে,—সে আত্মত্যাগ তারা আমার কাছেই শিক্ষা করেছে। মেহেদি পাতার বাইরের স্নিগ্ধ শ্যামলতা যেমন তার ভিতরের রক্তরাগ লুকিয়ে রাখে, তেমনি আমার শান্ত মূর্তি আমার মনের আগুনের দীপ্তরাগ গোপন ক'রে রেখেছে, আমার হৃদয়ের দুঃখভারের একটুখানি আকাশকে দিয়েছি, আকাশ তারই ভারে অবনত এবং তারই বেদনায় নীল হয়ে আছে। আমি বাদশার মেয়ে, কিন্তু প্রাণ আমার ফকিরের মতো, ধন-ঐশ্বর্য আমার ভালো লাগে না। আমি সুন্দরীশ্রেষ্ঠা (জেব-উন্নিসা) এই গৌরবই আমার পক্ষে যথেষ্ট!"

জেব-উন্নিসার ছোট বোন বদরউন্নিসাও সমস্ত কোরাণ কণ্ঠস্থ করেছিলেন কিন্তু জেবের মতো তিনি উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন না। আওরংজীবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শাহ আলম বাহাদুর শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাহাদুর শাহের পত্নী নুর উন্নিসা সুন্দর হিন্দী কবিতা রচনা করতে পারতেন। এর পরেও মোগল অন্তঃপুরে বিদ্যা-চর্চা এবং কাব্য-চর্চা নিশ্চয়ই বন্ধ হয়নি, কিন্তু আমাদের তার সম্পূর্ণ পরিচয় জানা নেই। মোগলপুর-বাসিনীদের লেখাপড়া এবং গান শেখাবার জন্য সম্ভ্রান্ত এবং মধ্যবিত্ত ঘরের বিদুষী শিক্ষয়িত্রীদের বৃত্তি দিয়ে রাখা হ'ত, প্রতিদিন রাত্রে সম্রাটকে দৈনন্দিন সংবাদ-লিপি (ও কা এ) পড়ে শোনানোও ছিল এঁদেরই কাজ। সম্রাটের দেখাদেখি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সর্বত্রই অন্তঃপুরে বিদ্যাচর্চা হ'ত, মধ্যবিত্ত ঘরেও শিক্ষয়িত্রীর কাজ করবার জন্য বহু নারী লেখাপড়া শিখতেন। আজকের তুলনায় তাঁদের শিক্ষার ক্ষেত্র অনেক সঙ্কীর্ণ ছিল সত্য কিন্তু তাঁদের শক্তি এবং জ্ঞান-পিপাসা কম তা' ব'লে একটুও ছিল না। হাতে লেখা পুঁথির যুগে যে কঠিন পরিশ্রম ক'রে তাঁরা রাশি রাশি বই নিজেরা আগাগোড়া নকল করেছেন, আজকের দিনে তার তুলনা সত্যই দুর্লভ।

রাজপ্রাসাদ এবং ধনী ও মধ্যবিত্ত-সমাজের বাইরেও এই যুগে সার্বজনীন শিক্ষার জন্য যে সুব্যবস্থা ছিল, তার কথা উল্লেখযোগ্য। মুসলমানের মসজিদ, হিন্দুর মন্দির এবং বৌদ্ধদের বিহারগুলিতে বিনা পয়সায় প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত, ছেলেরা এবং মেয়েরা শৈশবে সেখানে সমভাবেই শিক্ষার সুযোগ পেত। বহু মসজিদের সামনে দিয়ে যেতে গেলে আজও অনেক সময়ে পাঠনিরত ছেলেমেয়েদের দেখতে পাওয়া যায়। উত্তর-ভারতে এবং মধ্যপ্রদেশে আজও বহু মন্দির-প্রাঙ্গণে এবং বাংলা দেশের হরিসভায় বা কালীবাড়ীতে ছেলেমেয়েদের পাঠশালা বসে। ব্রহ্মদেশের ফুঙ্গিদের কৃপায় সেখানে নিরক্ষরতা ইংরাজরাজত্বের পূর্বে খুবই কম ছিল। ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে রাজ-সাহায্যপ্রাপ্ত চতুষ্পাঠী, দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তরভোগী অধ্যাপক ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার জন্য 'ধান দিয়ে লেখাপড়া শিখবার' পাঠশালা ছিল, যেখানে বালক-বালিকারা নিয়মিত

প্রাথমিক শিক্ষা লাভ ক'রত। এই সব স্থাবর শিক্ষায়তন ছাড়া যাত্রা, কীর্তন, কথকতা প্রভৃতি সচল শিক্ষায়তন গ্রামে গ্রামে বর্তমান থেকে সেদিন নিরক্ষর জনসাধারণকে উচ্চতম ধর্মতত্ত্ব ও নীতিশিক্ষা দিত এবং দেশের অতীতের সঙ্গে তাদের বিশিষ্টরূপে পরিচিত করত।

পূর্বেই বলেছি, সংস্কৃত ভাষাকে একদিন ভারতীয়েরা শুধু দেবভাষা এবং ধর্মের ভাষা নয়, শিক্ষিতের ভাষা ব'লে জ্ঞান ক'রতেন। ভারতের সকল প্রান্তের এবং সকল প্রদেশের শিক্ষিত ব্যক্তি সেদিন সংস্কৃতে পরস্পরের সঙ্গে তর্ক আলোচনা করতেন, রাজসভায় এবং শিক্ষিত সমাজে সংস্কৃত না জানলে সম্মান লাভ দূরে থাক, কোনো কাজই হ'ত না। এর দ্বারা একদিকে যেমন সর্বভারতীয় শিক্ষিত হিন্দুর মধ্যে একটা ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তেমনি অপরদিকে যে সব দরিদ্র অশিক্ষিত অনার্য-প্রধান জনসাধারণ গ্রামের বাইরে যাবার প্রয়োজন অনুভব ক'রত না এবং ভারত বা পৃথিবীর চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাত না, যাদের মুখ দিয়ে সংস্কৃতের সুস্পষ্ট উচ্চারণ হওয়া শক্ত ছিল, তাদের জ্ঞান এবং ধর্মচর্চার পথে সংস্কৃত ব্যাকরণের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর বাধাস্বরূপ ছিল। তাই দেখতে পাওয়া যায় বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি যে সব মহাপুরুষ ধর্মকে আচণ্ডালের বোধগম্য ক'রতে চেয়েছিলেন এবং দেশের অজ্ঞতম ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তির এবং ধর্মপ্রাণতার বিকাশ সাধন করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা প্রাদেশিক প্রাকৃতে অর্থাৎ নিজ নিজ মাতৃভাষায় ধর্ম প্রচার করেছিলেন। একদিকে অতীত মহিমার এবং ঐক্যের স্মৃতি, আর একদিকে বর্তমানের প্রয়োজন, এই দুই বিরোধী শক্তির যখন সঙ্ঘর্ষ চলছে, অষ্টাদশ পুরাণ এবং রামায়ণ ভাষায় শুনলে মানুষকে নরকে যেতে হয় ব'লে ভয় দেখিয়ে যখন প্রবীণ দল নবীন দলকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন, সেই সময়ে মুসলমান রাজশক্তি প্রাদেশিক ভাষার পক্ষ নিয়ে সমস্ত বিরোধের শেষ ক'রে দিল। তারপর দরবারে ও আদালতে ফারসী এবং শিক্ষিত অশিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবনে বাংলার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। এর বহু পূর্বেই বাংলা ভাষায় সাহিত্য ও ধর্মচর্চা আরম্ভ হয়েছিল, চর্যাপদ প্রভৃতিতে তার আদি রূপ আমরা দেখতে পাই। বৈদিক যুগে বাংলাকে যারা 'পক্ষীর দেশ' ব'লে অবজ্ঞা দেখিয়েছিলেন, বাঙ্গালীর ভাষাকে পাখীর কিচির-মিচির শব্দের মতো দুর্বোধ্য ব'লে অবজ্ঞা করতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁদের বংশধররাই এদেশে এসে যখন বাস ক'রলেন, তখন দেশের ভাষাকে মাতৃভাষা ব'লে স্বীকার করলেও প্রথম প্রথম তাকে শ্রদ্ধা ক'রতে পারেন নি। বাংলা ভাষাকে ধর্মের ভাষারূপে ব্যবহার করবার প্রথম প্রেরণা এল, বৌদ্ধ, জৈন, নাথপন্থী এবং সহজিয়াদের কাছ থেকে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুদয়ে বাঙালী বৌদ্ধেরা এবং জৈনেরা অনেকে বৈষ্ণব সহজিয়া এবং তান্ত্রিকতার আড়ালে বৌদ্ধবাদকে লুকিয়ে হিন্দুধর্মে ফিরে এলেন, অনেকে নবাগত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ক'রে রাজার আশ্রয় পেলেন। প্রাচীনতম বাংলা চর্যাগুলির পর ময়নামতীর গান, শূন্য পুরাণ প্রভৃতির সময় নিয়ে মতভেদ চলছে। তার পরের যুগকে পাঁচালির যুগ বলে, এই যুগে কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস প্রভৃতির লেখায় একদিকে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিধারা অব্যাহত রাখবার চেষ্টা এবং অপরদিকে মঙ্গলকাব্যে অশিক্ষিত জনসাধারণের স্থানীয় লৌকিক দেবদেবীকে তাদের সমস্ত দেহমনের দৈন্য সমেত

প্রাধান্য দেবার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। এই যুগে বাংলায় যে সব নারী কবি জন্মেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের ওপরেই তাঁদের সময়ের ছাপ কমবেশী পড়েছে। প্রাক্-চৈতন্যযুগে সহজিয়া প্রভাব, চৈতন্যের এবং তাঁর পরবর্তী যুগে বৈষ্ণব-প্রভাব এবং তার পরের শতাব্দী থেকে মঙ্গলকাব্যগুলির প্রভাব, সে যুগের নারীর লেখায় সুস্পষ্ট দেখা যায়। ধর্মের কাহিনী ছাড়া একেবারে ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ নিয়ে কাব্য রচনাও নারীর দ্বারা আরম্ভ হয়েছে, তার প্রথম নিদর্শন পাই বাংলা দেশের সর্বপ্রথম বাঙ্গালী কবি রামীর রচনায়। তাঁর আগের যুগের যে সব ছেলে-ভুলানো ছড়া, গাথা প্রভৃতি নারী-রচিত লোক-সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে ভাবের গভীরতার এবং পদলালিত্যের অভাব নেই, সহস্রাধিক বৎসর ধরে যোগিপাল, ভোগিপাল এবং মহীপালের গান মেয়েরা গেয়েছে, 'ধান ভানতে শিবের গীত' গাওয়াও কম হয়নি, কিন্তু সেগুলির রচয়িতা বা রচয়িত্রী যে কে, তা' কেউ জানে না এবং জানা সম্ভবও নয়, সুতরাং তাঁদের প্রাপ্য সম্মান তাঁরা বোধ হয় ব্যক্তিগতভাবে কোনো দিনই পাবেন না। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রজকিনী রামী, রামতারা বা তারার রচিত পদগুলির পূর্বে লেখিকার ভণিতাযুক্ত কোনো লেখা আমরা বাংলায় পাইনি। চণ্ডীদাস যে রজক-কুমারীকে বাগ্বাদিনী এবং গায়ত্রীর সঙ্গে তুলনা ক'রতে দ্বিধা করেননি, যাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, শত শত বাশুলী তাঁকে যে প্রেম শেখাতে পারতেন না, রামী তা শিখিয়েছে, স্বয়ং ব্রহ্মা এসে যে জ্ঞান দিতে পারতেন না, রামী তাই দিয়েছে, সেই রমণী শুধুই রূপের দ্বারা তাঁর চিত্ত হরণ করেননি, সে যুগের পক্ষে আশাতীত কবিপ্রতিভা দ্বারা রবীন্দ্র-পূর্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বঙ্গ-কবির হৃদয় তিনি বিজয় করেছিলেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। জীবিতকালে রামীকে চণ্ডীদাসের আত্মীয়েরা বিশেষ প্রীতির চোখে দেখেন নি, তাঁর রচিত পদ বাঁচিয়ে রাখার উপযুক্ত সশ্রদ্ধ মনোভাব সে যুগে কম লোকেরই ছিল। তাঁর কয়েকটি পদ থেকে দু'এক ছত্র ক'রে উদাহরণ দে'ব। চণ্ডীদাসের অদর্শনের দুঃখ জানাবার জন্য তিনি বলছেন:

"তুমি দিবা ভাগে লীলা অনুরাগে
ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ না দেখিয়া দুখ
পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে॥...
তুমি সে আমার আমি সে তোমার,
সুহৃৎ কে' আছে আর?
খেদে রামী কয় চণ্ডীদাস বিনা
জগৎ দেখি আঁধার।"

প্রবাদ আছে, নবাবের বেগম চণ্ডীদাসের গান শুনে, তাঁর অনুরক্তা হন, সেই সংবাদ পেয়ে নবাব তাঁকে হত্যা করেন। চণ্ডীদাসের মৃত্যু সময় রচিত রামীর কবিতার

কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি:

> "নাথ, আমি যে রজকবালা।
> আমার বচন না শুনে রাজন, বুঝিনু কৃষ্ণের লীলা॥
> শুদ্ধ কলেবর হইল জর্জর দারুণ সঞ্চান ঘাতে।
> এ দুখ দেখিয়া বিদরয়ে হিয়া, অভাগীরে লহ সাথে॥...
> রাজা সে যবনজাতি, কি জানে রসের গতি,
> চণ্ডীদাস করি ধ্যান, বেগম ত্যজিল প্রাণ।
> শুনি ত্রস্তা ধরিনী ধায়, পড়িল বেগম পায়॥"

বলা বাহুল্য, রামীর কবিতায় চণ্ডীদাসের প্রভাব খুব বেশী চোখে পড়ে।

রামীর পরবর্তী বৈষ্ণব নারী কবিদের মধ্যে ইন্দুমুখী, মাধুরী, গোপী এবং রসময়ী দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের পরিচয় কিছুই আমাদের জানা নেই, কেবল তাঁদের রচিত পদের শেষে তাঁদের নামটুকু পাওয়া যায়। গোপীর রচনার একটু নমুনা দিচ্ছি:

> "দণ্ডবৎ হইয়া মা'য় সাজিল যাদবরায়,
> সঙ্গহি রঙ্গিয়া রাখাল।
> বরজে পড়িলা ধ্বনি, শিঙ্গা বেণু রব শুনি,
> আগে ধায় গোধনের পাল॥
> গোঠেরে সাজল ভাইয়া, যে শুনে সে যায় ধাঞা,
> রহিতে না পারে কেহ ঘরে।
> শুনিয়া মুখের বেণু, মন্দ মন্দ চলে ধেনু,
> পুচ্ছ ফেলি' পিঠের উপরে॥
> নাচিতে নাচিতে যায়, নুপূরে পঞ্চম গায়,
> পাঁচনী ফিরায় শিশুগণে।
> হৈ হৈ রাখাল বলে, শুনি সুখ সুরকুলে,
> গোপী বলে নাথ যায় বনে॥"

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কবি এবং বিদুষী মাধবী দেবী তাঁর অন্যতম ভক্ত শিখি-মাইতির ভগ্নী ছিলেন। তাঁর রচিত অনেক পদ 'পদ-কল্পতরু'তে পাওয়া যায়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ঐতিহাসিক, ভাষা সরল এবং মর্মস্পর্শী। সমসাময়িক অনেক ঘটনার নিখুঁত ছবি তাঁর লেখায় অমর হ'য়ে আছে। চৈতন্যদেব নারীর মুখ দর্শন করতেন না ব'লে মাধবী দেবীকে আড়াল থেকে লুকিয়ে তাঁর ভাবে ভোলা মূর্তি দেখতে হ'ত। গুরুর

কাছে বসবার অধিকার তিনি কোনো দিন পান নি, সে দুঃখ তাঁর জীবনে যে যায়নি, নিম্নলিখিত পদটিতেও তার সেই বঞ্চিত জীবনের মর্মবেদনাটুকু ফুটে উঠেছে।

“যে দেখয়ে গোরা মুখ সেই প্রেমে ভাসে।
মাধবী বঞ্চিত হ’ল নিজ কর্মদোষে॥”

প্রেমাবতার গুরুকে নারী-বিদ্বেষী ব’লে তিরস্কার করতে তাঁর মন চায়নি, কারণ নারীর সঙ্গ সন্ন্যাসীর পক্ষে ক্ষতিকর হ’তে পারে তা’ তিনি জানতেন, সেই জন্য নিজের কর্মকেই তিনি দোষ দিয়েছেন, তাঁর নারীজন্মের জন্য। চরিতামৃতের মতে চৈতন্যদেব ‘রাধিকার গণ’ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠভক্ত বলে সাড়ে তিনজনকে ধরতেন। স্বরূপ, দামোদর, রামানন্দকে পুরো তিনজন আর মাধবীদেবীকে নারী ব’লে আধ জন ধরা হ’ত।গুরু এতবড় সম্মানের মধ্যেও অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ ভক্তের মধ্যে চারজনের অন্যতম ব’লে ধরেও নারী ব’লে তাঁকে সম্পূর্ণ সম্মানদিতে পারেননি কিন্তু উড়িষ্যাধিপতি প্রতাপরুদ্র তাঁকে বহু পুরুষের চেয়ে যোগ্যতম বিবেচনা কর’তেন, তার প্রমাণ রাজসভায় বহু পণ্ডিত থাকতেও জগন্নাথ-মন্দিরের দৈনিক বিবরণ লেখার ভার তাঁর উপর দিয়েছিলেন। মাধবীর সুন্দর স্বভাব, অগাধ পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান এবং নিরাড়ম্বর জীবন সে যুগের বৈষ্ণব নারীদের আদর্শ ছিল। তাঁর রচনার নমুনাস্বরূপ:

“কলহ করিয়া ছলা, আগে পহু চলি গেলা,
ভেটিবারে নীলাচল রায়।

যতেক ভকতগণ, হৈয়া সকরুণ মন,
পদচিহ্ন অনুসারে ধায়॥’

আজও প্রায়ই সংকীর্ত্তন আসরে উদ্ধৃত হয়। জগদানন্দ নীলাচল থেকে শচীকে দেখতে আসছেন, সে ছবিটিও বড় করুণ:

‘ভাবয়ে পণ্ডিত রায়।
পাই কি না পাই শচীরে দেখিতে এই অনুমানে চায়॥
লতা তরু যত দেখে শত শত, অকালে খসিছে পাতা।
রবির কিরণ হয় স্ফুরণ মেঘগণ দেখে রাতা॥
ডালে বসি’ পাখী মুদি দুটি আঁখি ফুলজল তেয়াগিয়া।
কান্দয়ে ফুকারি ডুকরি ডুকরি গোরাচান্দ নাম লইয়া॥

ধেনু যুথে যুথে দাঁড়াইয়া পথে কারো মুখে নাহি রা’।
মাধবী দাসীর পণ্ডিত ঠাকুর পড়িলা আছাড়ি গা।’

মৈমনসিংহের পাটবাড়ী গ্রামের বংশীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (উপাধি চক্রবর্তী) মনসামঙ্গল রচনা ক’রে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর লেখা ‘কথা রামায়ণ’ এ পর্যন্ত যত পৌরাণিক ছড়া বা গাথা পাওয়া গেছে, তার মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন। দরিদ্র পিতার ঘরে চন্দ্রাবতীর জন্ম—তাঁর নিজের ভাষায়:

“ঘরে নাই ধান চাল, চালে নাই ছানি।
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পাণি ॥
ভাসান গাহিয়া পিতা বেড়ান নগরে।
চাল কড়ি যাহা পান আনি’ দেন ঘরে ॥
বাড়াতে দারিদ্র্যের জ্বালা কষ্টের কাহিনী।
তার ঘরে জন্ম নৈল চন্দ্রা অভাগিনী ॥

চন্দ্রাবতীর বাল্যবন্ধু তাঁর স্বগ্রামবাসী ব্রাহ্মণের ছেলে জয়ানন্দ পাঠশালায় তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে পড়তেন, চন্দ্রাবতী অল্পবয়সেই তাঁকে ভালোবেসেছিলেন, দু’জনের বিবাহেরও সমস্ত স্থির হ’য়ে গেছল, এমন সময় জয়ানন্দ একটি মুসলমানের মেয়ের প্রেমে পড়ে মুসলমান হ’য়ে যান। চন্দ্রাবতী জীবনে আর বিয়ে করেন নি।

রামায়ণ গাথায় ইনি সীতাকে মন্দোদরীর কন্যা ব’লে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, ভরতের কনিষ্ঠা ভগিনীর অনুরোধে সীতাকে দিয়ে রাবণের ছবি আঁকিয়ে রামের কাছে কুকুয়াকে দিয়ে মিথ্যা অভিযোগ করিয়ে ননদের কুটিলতার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কাব্যের গল্পাংশ রামায়ণের সঙ্গে মেলে না, তবে ভাষা মধুর এবং অনেক জায়গায় অত্যন্ত মর্মস্পর্শী।

কথা রামায়ণ ছাড়া চন্দ্রাবতীর লেখা বহু গীতিকবিতা একদিন উত্তর ও পূর্ববঙ্গে লোকের মুখে মুখে ফিরত। পূর্ববঙ্গগীতিকার কয়েকটি পালা তাঁর লেখা।

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবির রচনা কয়েক শত অর্থাৎ দুই শতাধিক বর্ষ ত বটেই; স্থান পেয়ে গেছে। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে অনেক মুসলীম কবির কাব্য কবিতা স্থান লাভ ক’রে এসেছে। অবশ্য এতদিন ধ’রে সাহিত্যক্ষেত্রে জাতিভেদের গণ্ডী এমন সংকীর্ণ না হওয়ায় সে সব রচনা, মুসলীম সাহিত্য বা ‘মোহম্মদীয়’ সাহিত্যরূপে মূল সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি। মুসলমান লেখকের দ্বারা লিখিত সাহিত্য বস্তুকেও যদি হিন্দু-সাহিত্যের সঙ্গে অপাংক্তেয় করা হয়, তা’ হ’লে সাহিত্যের শব্দ, অর্থ ও

প্রয়োজনীয়তা সমস্তই নিরর্থক হ’য়ে যায়। সে-দিনে এসব বিষয়ে মানুষের মনে সংকীর্ণতা কম থাকায় তার মধ্যে শ্রেণীবিভাগ থাকলেও ভাগ-বাঁটোয়ারায় এসে পৌঁছায়নি। হয়ত এই কারণেই সে দিনের মুসলমান কবিদের রচিত পদের মধ্যে কোন নারী রচিত পদাবলী বা ছড়া গান, রূপকথা, উপকথা মিশিয়ে মিলিয়ে পর্দা বজায় রেখে আজও বেঁচে আছে কিনা তা’ নিশ্চয় করে বলা যায় না। হিন্দু মুসলমান মেয়েদের কারুই বাইরে নাম জাহির করবার মত চিত্তবৃত্তি তখন অল্পই ছিল, বাদশা হারেমের মখ্‌ফিদের মত হয়ত কেউ কেউ তাঁদের বিশিষ্ট দানে নিষ্কাম দাতৃত্বও করে রেখে গেছেন, তাঁরা জানতেন সাহিত্যিক সাহিত্যরস সৃষ্টি করে নিজের মনের অনুভূতি দিয়ে। সেই সাহিত্য অথবা অপর কোন ললিত কলা শিল্পীর রচিত সৃজিত বস্তুজাতকে নিজের অন্তরের রসবস্তু দিয়ে, সৌন্দর্য্য উপলব্ধি দিয়ে এবং হৃদয় দিয়ে। রূপে রসে গন্ধে বর্ণে ছন্দে শোভায় সে হয় একটী প্রস্ফুটিত সুরভি পুষ্পের মত, সুরভরা বীণার ঝঙ্কারের মত, জাতি নীতি কুল গোত্র বিহীন ও সার্ব্বজনীন। এ বিষয়ে সহরের বাইরে মুক্ত মানবতার উদার ক্ষেত্রে হিন্দুনারী এবং মুসলিম নারী বড় বিশেষ ভেদ রাখেননি। তাঁদের দান একই পারাবারে সম্মিলিত নদীদ্বয়ের মতই মিলে মিশে এক হয়ে থেকে গেছে, সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ ক্ষুদ্র চিত্তের পরিচয় রক্ষা করে চলেনি।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের ও উনবিংশ শতকের প্রথমদিকের নারী লেখিকাদের কয়েকজনের নাম এবং তাঁদের রচিত কবিতা বা গান এখনও খুঁজে পাওয়া যায়। আনন্দময়ী দেবী, গঙ্গামণি দেবী, যজ্ঞেশ্বরী দেবী, সুন্দরী দেবী, দ্রবময়ী দেবী, লক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি বিদুষীদের নাম আমরা এই সময়েই পাই। লোক-সাহিত্যের মধ্যে “ছেলে ঘুমোলা পাড়া জুড়োলো বর্গী এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে।” প্রভৃতি আলীবর্দী খাঁর সময়ের বাংলায় বগীর অত্যাচারের স্মারক ছড়া নিঃসন্দেহে অষ্টাদশ শতাব্দীর রচিত। এই সমস্ত ছড়াগান যে ছেলের মায়েদেরই রচনা তা’তে সন্দেহ করবার কিছু নেই। আগডম্ বাগডম্ প্রভৃতির আগড়ম বাগড়ম অনেক কিছুই দজ্জাল ছেলেদের ভুলিয়ে রাখবার জন্য তাঁদের তৈরি করে নিতে হয়েছিল।[৬]

“রামকুণ্ডু, সীতাকুণ্ডু, গিরি গোবর্ধন।
মধুর মধুর বংশী বাজে, এই তো বৃন্দাবন।”

নিঃসন্দেহ চৈতন্য দেবের সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নূতন ক’রে বৃন্দাবনে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টার স্মারক। পলাসীর যুদ্ধের স্মারক একটি কবিতা একসময়ে খুব বিখ্যাত ছিল, তার এক অংশ এই:

“কি হোলোরে জান! পলাসীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ।...
ছোটো ছোটো তেলেঙ্গাগুলি লালকুর্ত্তি গায়,

হাঁটু গেড়ে মারছে তীর মীরমদনের গায়।
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলি পড়ে র'য়ে।
একলা মীরমদন সাহেব কত নেবে সয়ে?"...

এই ধরণের ঐতিহাসিক কবিতায় সিরাজউদ্দৌলার ক'লকাতা আক্রমণ, নন্দকুমারের ফাঁসি প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। এগুলির সমস্তই মেয়েদের রচনা না হ'তে পারে, তবে কয়েকটি যে মেয়েদের রচনা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অনেকগুলি ছড়া যে নারীর রচনা তার প্রমাণ আছে: একটি উত্তরবঙ্গের ছড়ায় নারী কবি মির্জাপুর ও রহিমনগরের দাঙ্গার বিবরণ দিয়েছেন, তার একটু উদাহরণ দিচ্ছি:

'খবরিয়ায় খবর কয়, ছমির চকিদার।
তোমার দুই পুত মারা যায়, ভরসা কর কার?
শুইনা বেকরার হুঁস হইয়া বান্ধিল কমর।
ডাইন হাতে লইল লাঠি, বাঁও হাতে ফল।
মার মার কইরা ছমির গোঁস্বায় জ্বলিল।
আল্লা নবীর নাম কিছু স্মরণ না করিল॥...

ঐতিহাসিক কবিতা ছাড়া পালা গান, পাঁচালী, ব্রতকথা প্রভৃতিতে নারীর দান প্রচুর আছে। ছেলে ভুলানো ছড়া, ব্রতকথা, রূপকথা প্রভৃতির রাজ্যে তো নারীর একচ্ছত্র অধিকার! সেগুলির ধারা খুব পুরাণো হ'লেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে নবতম রূপ পেয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

'ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো'
'দোল দোল দোলানি, রাঙা মাথায় চিরুনি,'
'অন্নপূর্ণা দুধের সর, কাল যাবি মা পরের ঘর,'
'আতা গাছে তোতা পাখি, ডালিম গাছে মৌ,
কথা কওনা কেন বৌ?'
'তালতলা দিয়ে জল যায় মা' ডুবে মনুগো,
পাটের শাড়ী বার করো মা দখিন যাবোগো।'
'ওপারেতে কালো রং, বিষ্টি পড়ে ঝমাঝ্ঝম'।

'ওপারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক্‌টুক্ করে।
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।'

ইজল বিজল কাজলনাতা, ঝড়ে কাঁপছে গাছের পাতা।
আয় ঝড় আয়, খোকা আমার নাইতে যায়।'

অথবা 'আয় ঘুম ঘুম, যায় ঘুম ঘুম, ঘুমোলো গাছের পাতা।' প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে বহু সতীনের খোয়ার, বৌয়েদের ছিদ্র, শাশুড়ী ননদের কলহের ছড়া এই যুগের লেখা। মধুমালা, শঙ্খমালা, কাঞ্চনমালা প্রভৃতির গল্পও এই যুগে তার শেষরূপ ধরেছে।

এ যুগের নারী কবিদের মধ্যে যাঁদের নাম জানা যায় তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে বিখ্যাতা বিদুষী আনন্দময়ী।

বিক্রমপুরের অন্তর্গত জপ্‌সা গ্রামে বৈদ্যবংশীয় লালা জয়নারায়ণ ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ীর সঙ্গে একত্রে হরিলীলা নামক সত্যনারায়ণের লীলাবিষয়ক কাব্য রচনা করেন। আনন্দময়ীর পিতা রামগতি রায় 'মায়াতিমিরচন্দ্রিকা'র লেখক এবং সুপণ্ডিত এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। ন' বছর বয়সে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয় পয়গ্রামের অযোধ্যারাম সেনের সঙ্গে। তাঁর অধ্যাপক ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ। গুরুপুত্র হরিদেব বিদ্যালঙ্কারের লেখার অশুদ্ধি ধরে আনন্দময়ী অধ্যাপককে ছেলের লেখাপড়ার সম্বন্ধে অমনোযোগী হওয়ার জন্য তিরস্কার করেন। রাজা রাজবল্লভ এক সময় আনন্দময়ীর পিতা রামগতি রায়ের কাছে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ও প্রতিকৃতি চেয়ে পাঠান, রামগতি সে সময় পূজায় ব্যস্ত থাকায় আনন্দময়ী সেগুলি লিখে এবং এঁকে পাঠান এবং তা' পণ্ডিতসমাজে গ্রাহ্য হয়। যাই হোক, আমরা এখানে তাঁকে সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞা এবং বিবিধ-শাস্ত্র-পারদর্শিনী ব'লে ধরবো না, বাঙালী কবি হিসাবেই ধরবো। তাঁর রচনায় সে যুগের দোষ ও গুণ দুই আছে। তাঁর সরল রচনার একটি উদাহরণ দিচ্ছি; পতি বিরহে সুনেত্রার শোক:

'যে অঙ্গে কুঙ্কুম তুমি দিয়াছ যতনে,
সে অঙ্গে মাখিব ছাই তোমার কারণে।
যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বেঁধেছ আপনি।
তাহে জটাভার করি হইব যোগিনী॥
শীত ভয়ে যে বুকেতে লুকায়েছ নাথ।
বিদারিব সে বুক করিয়া করাঘাত।...
মনে করি হরি স্মরি হই দেশান্তরী।
তাহে মাতা প্রতিবন্ধ বাহিরিতে নারি॥
আর তব স্থাপ্য ধন বিষম যৌবন।
লুকাইয়া নিয়া ফিরি দরিদ্র যেমন।"

আনন্দময়ীর সংস্কৃত শব্দবহুল তৎকাল প্রচলিত অর্থহীন অনুপ্রাসপূর্ণ, সঙ্কর ভাষায় ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে রচিত কবিতার নমুনা:

“পুরী পূরিতা সুন্দরী জাল মালে।
বলেগো উঠগো চলগো সকালে॥...
হেরে চৌদিকে কামিনী লক্ষে লক্ষে।
সমক্ষে পরোক্ষে গবক্ষে কটাক্ষে॥
কতি প্রৌঢ়রূপা ওরূপে সজন্তি।
হসন্তি স্খলন্তি দ্রবন্তি পতন্তি॥

কত চারুবক্ত্রা সুবেশা সুকেশা।
সুনামা সুহাসা সুবাসা সুভাষা।”

এই জাতীয় লেখা ভারতচন্দ্রের যুগের বিশেষত্ব, এজন্য লেখিকা একা অপরাধিনী নন। এই কাব্য কর্ণের তৃপ্তি সাধন করলেও মর্ম স্পর্শ করে না। তাঁর মতো শক্তিমতী লেখিকাও নিজ যুগের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এই বিদুষী নারী পিতৃগৃহে স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে তাঁর খড়ম বুকে নিয়ে চিতানলে প্রাণ বিসর্জন করেন। আনন্দময়ীর পিস্তুতো বোন গঙ্গামণি দেবীর লেখা অনেক গান একসময়ে বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এখনও তার কতকগুলি ওদেশের বিয়ের সময় গাওয়া হয়। আনন্দময়ীর বোন দয়াময়ীও বিদুষী ছিলেন, গঙ্গা এবং দয়াময়ীর অনুরোধে জয়নারায়ণ তাঁর চণ্ডিকামঙ্গলের তৃতীয় উপাখ্যানটি রচনা করেন। গঙ্গামণির কবিতায় বর্ণনা-বাহুল্য ছিল কিন্তু প্রসাদগুণের অভাব ছিল না। তাঁর কবিতার দু’ছত্র উদাহরণ দিচ্ছি:

‘জনক নন্দিনী সীতে হরিষে সাজায় রাণী।
শিরে শোভে সিঁথি পাটি হীরা মণি চুণী॥”

বর্দ্ধমান জেলায় কলাইঝুটী গ্রামে অনুমান ১১৮২ সালে রূপমঞ্জরীর জন্ম হয়। ইনি জাতিতে বৈষ্ণব ছিলেন। ইহার মাতার নাম সুধামুখী। পিতা নারায়ণ দাস ইহাকে বাল্যকালে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করেন। নারায়ণ দাসের আর কোন সন্তান হয় নাই। রূপমঞ্জরীর বিদ্যাশিক্ষায় এত অনুরাগ জন্মিল যে, নারায়ণ দাস বুদ্ধিমতী দুহিতাকে ব্যাকরণ পড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু রূপমঞ্জরী তাঁর অধ্যয়ন অধ্যাপনার সীমা অতিক্রম ক’রল। তার পিতা তাঁকে তখন শব্দশাস্ত্র পড়াবার জন্য বাহাদুর পুর নিবাসী বদনচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে প্রেরণ করেন। তখনকার ভদ্রপরিবারস্থ বালিকাগণ টোলে কিংবা পাঠশালায় বালকদিগের সঙ্গে একত্র পাঠাভ্যাস করত। এই

সময় নারায়ণ দাসের মৃত্যু হয়। পরে রূপমঞ্জরী সর্ নামক গ্রাম নিবাসী গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কারের নিকট কাব্যপাঠে বশেষ পারদর্শিতা লাভ ক'রে শেষে এঁর কাছে বৈদ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

রূপমঞ্জরীর চরিত্র অতি নির্মল ছিল। ইনি বিয়ে করেননি, মস্তক মুণ্ডন ক'রে কেবল একটী শিখা রেখেছিলেন এবং কোনও স্থানে গমন করবার সময় পুরুষের মত উত্তরীয় ব্যবহার করতেন।

বহু লোক রূপমঞ্জরীর নিকট ব্যাকরণ, চরক ও নিদান প্রভৃতি দুরূহ শাস্ত্র সমুদয় অধ্যয়ন করেছিলেন। মানকর নিবাসী বিখ্যাত চিকিৎসক ভোলানাথ কবিরাজ মহাশয় অনেক সময় ইহার নিকট চিকিৎসা সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করতেন।

চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের পর বাংলার বৈষ্ণব সমাজের জীবনে এবং সাহিত্যে যে জোয়ার এসেছিল তার ফলে বাংলার গ্রামে গ্রামে হরিসঙ্কীর্তন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান শোনা বা রচনা করা অত্যন্ত অশিক্ষিত এবং নিরক্ষর লোকের পক্ষেও অসম্ভব হয়নি। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্ত্রী পুরুষে লোকের বাড়ী বাড়ী হরিনাম গান শুনিয়ে ভিক্ষা ক'রত এবং এখনও করে। সেই সব গানের মধ্যে অনেক সময়ে তাদের নিজেদের রচনাও থাকত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বহু নীচজাতীয়া নারী, তাঁদের মধ্যে বৈষ্ণবী এবং প্রবীণা পতিতার সংখ্যাই বেশী, কবির দল ক'রে গান গেয়ে এবং কবির লড়াইএর অনুকরণে সদ্যোরচিত কবিতায় প্রতিপক্ষের সঙ্গে কথা কাটাকাটি ক'রে, জীবিকা উপার্জন করতেন। বিখ্যাত কবি দাশরথি রায়ের প্রণয়িনী অকাবাই এই রকম এক কবির দল খুলেছিলেন, তাঁর দলের জন্য ফরমাস মতো গান লিখতে গিয়েই দাশরথি রায় কবিতায় হাত পাকিয়েছিলেন এবং নীলকুঠির চাকরী ছেড়ে স্বাধীনভাবে পাঁচালীর দল খুলেছিলেন। এই যুগের যজ্ঞেশ্বরী নাম্নী এক কবির সখী-সংবাদ থেকে একটু উদাহরণ দিচ্ছি:

"এখন অধীনী বলিয়া ফিরে নাহি চাও,
    ঘরের ধন ফেলে প্রাণ পরের ধন আগুলে বেড়াও।
নাহি চেন ঘর বাসা, কি বসন্ত কি বরষা,
    সতীরে ক'রে নিরাশা অসতীর আশা পুরাও॥"

এইজাতীয়া কবিরা অনেক সময়েই শ্লীলতার গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতেন, রাজধানী এবং বড় বড় সহরের বিকৃতরুচি শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করাই ছিল তাদের জীবিকার্জনের উপায়। কিন্তু ভাষার ও ছন্দের ওপর অসামান্য অধিকার না থাকলে ঐ রকম মুখে মুখে কবিতা রচনা করে প্রতিবাদ করা যায় না, সেদিক দিয়ে এঁদের প্রশংসা করতেই হবে। রজনী

প্রভৃতি মেয়ে কীর্তনীদের দল এক সময় খুব সমাদর লাভ ক'রেছিল, এখন আর ততটা নেই।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে গোলোকমণি, দয়ামণি এবং রত্নমণি নাম্নী তিনজন 'নেড়ি কবি' অর্থাৎ বৈষ্ণবী কলকাতায় গাওনা ক'রতে এসে প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছিলেন। এই যুগে রাধাকান্ত দেবের লেখায় পণ্ডিতা শ্যামাসুন্দরী, হঠি বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি বিদুষীদের কথা এবং রেভারেণ্ড লং সাহেবের বাংলা বইয়ের তালিকায় ফরিদপুরের সুন্দরী দেবীর লেখা বাংলা বইয়ের কথা পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাংলাদেশের, সেই পরম অমঙ্গলময় রাষ্ট্রপরিবর্তনের তামসিক যুগে 'মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়', এ ধারণা পর্যন্তও মেয়েদের অনেকের মনে বদ্ধমূল হ'য়ে ছিল, সেই যুগেও সহর থেকে দূরে সুদূর পল্লীগ্রামের মেয়েরা সেই নিবিড় অন্ধকারে যে একেবারে ডুবে যাননি, পূর্বোক্তা বিদুষীরাই তার প্রমাণ। এই সব থেকে জানা যায় আমাদের প্রপিতামহীরা সকলেই অশিক্ষিতা ছিলেন না। সেদিন বাংলার গ্রামে গ্রামে যত চতুষ্পাঠী এবং পাঠশালা ছিল, আজ তার অধিকাংশই নেই, কথক ঠাকুর এবং পাঁচালী গায়কেরা কথকতা ক'রে পালা গান শুনিয়ে গ্রামে গ্রামে লোকেদের ধর্মনীতি কর্মনীতি, সদাচার এবং অনেক উচ্চ আদর্শের বার্তা শোনাতেন। যে শিক্ষা আজ আমরা পয়সা দিয়ে স্কুল, কলেজে গিয়ে পাই না, তেমন অনেক শিক্ষা আমাদের প্রপিতামহীরা বিনামূল্যে গ্রামে বসেই পেতেন। সত্যিকারের যে শিক্ষা নারী জীবনের, এমন কি; নর জীবনেও সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতা প্রদান করতে পারে, সেই ধর্মভৌমিক মহত্তম শিক্ষাই সে যুগের প্রত্যেক হিন্দুনারীর পাবার সুযোগ ছিল। হিসাব ক'রে দেখতে পারলে দেখানো যেত, অন্ততঃ ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থের ঘরে আজকের চেয়ে ঢের বেশী মেয়ে সেদিন অশিক্ষিতা থাকতেন না, নিম্নতম শ্রেণীর নারীর মধ্যেও উচ্চতম আদর্শ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পাঁচালি যাত্রার কৃপায় দৃঢ়তর হয়ে যেত। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের মেয়েদের অনেকের বাড়ীতে চতুষ্পাঠী থাকার সুযোগে এবং পূজাপাঠ নিয়মিত দেখা এবং করার জন্য উচ্চ শিক্ষার সুযোগ খুবই বেশী ছিল। অনেকে কেবল সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং পুরাণ পড়েই শিক্ষা সমাপ্ত করতেন, কোনো কোনো শক্তিমতী দর্শন-শাস্ত্রের গভীরতার মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়েও প্রমাণ করতেন, অনুকুল অবস্থায় নারী পুরুষের চেয়ে বিদ্যার ক্ষেত্রে অন্ততঃ হীন নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর মধ্যে অনেকেই তাদের পাণ্ডিত্যের লিখিত নিদর্শন রেখে যাননি, সকলে আবার বাংলা ভাষাতেও লেখেননি, লিখলেও সাধারণের সামনে ধরতে সাহস করেননি। তাদের এবং তাদের পূর্বযুগের মেয়েদের লেখা জনপ্রিয় গান ও ছড়াগুলি ছাড়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ অল্প পরিচিত অনেক লেখাই মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের পূর্বযুগে নিঃশেষে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। পরের যুগেও সবাকার ঘরের আবহাওয়া, সামাজিক অবস্থা এবং অর্থানুকূল্য এবং আত্মজনের সহানুভূতি না থাকায় কত লেখিকার লেখা উই ইঁদুরের ভক্ষ্য হয়েছে তার কি হিসাব পাওয়া সম্ভব!

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে শ্রীহট্টের 'হরিভক্তি তরঙ্গিণীর রচয়িতা' সহজিয়া সাধক শ্যামকিশোর ঘোষের সাধনসঙ্গিনী 'শ্রীমতী' কতকগুলি আধ্যাত্মিক পদ

রচনা করেছিলেন, রঘুনাথ লীলামৃতে এই রকম কয়েকটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। এই সময়ে সাহিত্যে এবং সমাজে বাংলার চরম অবনতির দিন চলছিল। মিথ্যাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি সামাজিক দুর্নীতির ছাপ তদানীন্তন সাহিত্যে পড়েছিল, কবির লড়াই, তর্জা, হাফ্ আখড়াই পাঁচালী, টপ্পাগান প্রভৃতিতে শ্লীলতার বালাই ছিল না; ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময় পর্যন্ত কোনো ভদ্রমহিলার প্রকাশ্যে সাহিত্যক্ষেত্রে নামবার উপায় ছিল না। ভারতচন্দ্রের উত্তরাধিকারীদের প্রাবল্যে নীতিপরায়ণ শিক্ষিত ব্যক্তিরা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত বাংলা বই বা সংবাদপত্র প'ড়তে ভয় পেতেন।

বাংলার শক্তিমতী লেখিকাদের আবির্ভাব আরম্ভ হ'ল প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে। পাশ্চাত্য ভাবধারার যে প্রবল বন্যাস্রোত একদিন ভারতের জাতীয় সংস্কৃতিকে, বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার উপক্রম করেছিল, তার প্রথম আক্রমণের বিপদ-বিহ্বলতা দেশ তখন কাটিয়ে উঠেছে। পূর্ব ভারতে রাজা রামমোহন রায়-প্রবর্তিত এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ তাকে বাধা দিয়ে হীন করবার পর উত্তর ভারতে দয়ানন্দ প্রবর্তিত আর্য সমাজ এবং বাংলার ঋষিকল্প মনীষী ভূদেব কর্তৃক অনুপ্রাণিত বঙ্কিম, রমেশ, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র প্রভৃতি প্রতিভাশালী লেখকদল দ্বারা সেবিত নবজাগ্রত হিন্দুসমাজ দেশকে সেদিন স্বপ্রতিষ্ঠ করেছে। ভারত তার অতীতকে নূতন ক'রে ফিরে পেয়েছে, তার পরাধীনতার এবং বর্তমানের দৈন্যের লজ্জাকে ছাড়িয়ে উঠেছে তার অতীতের গর্ব, তার প্রাচীন ধর্মের এবং সাহিত্যের অসীম ঐশ্বর্যের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনা। ইংরেজী সাহিত্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ দান তাকে আমরা তখন গ্রহণ করতে শিখেছি নিজের দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে। মুসলমান রাজত্বের শেষ যুগে যে সঙ্কীর্ণতা এবং পঙ্কিলতা সমাজে এসেছিল, তাকে অতিক্রম করতে অন্ততঃ অশ্রদ্ধা করতে শিখেছি। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে পুরুষ লেখকদের মধ্যে যে কয়েক জন মহারথের আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁদের সঙ্গে সমান পদবাচ্য না হ'তে পারলেও নারী সাহিত্যিকারা তাঁদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা ব্যবস্থার হিসাব ধরলে বহু পুরুষ লেখকের চেয়ে অধিকতর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন সে কথা নিঃসঙ্কোচেই বলা চলে। তাঁদের জীবনের গণ্ডী ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ, বহির্জগতের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক আজকের দিনের চেয়ে অনেক কম ছিল। তথাপি যে তাঁরা নির্ভয়ে এমন ক'রে সাহিত্যক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে ভরসা ক'রেছিলেন সেই ত একটা বিস্ময়! পল্লীগ্রামের মেয়েরা যেটুকু স্বাধীনতা পেতেন, অধ্যাপক পণ্ডিতের বাড়ীর মেয়েরা শাস্ত্রজ্ঞান লাভের যেটুকু সুযোগ পেতেন, সহরের নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মেয়েদের প্রায়ই তা' মিলত না। অতীতের কল্যাণ স্পর্শ তাঁরা হারিয়েছিলেন, অথচ বর্তমানের কল্যাণ তখনো তাঁদের স্পর্শ করেনি। জীবনের দুঃখ-দ্বন্দ্বের ভাগ পুরুষের সঙ্গে সমভাবেই তাঁদের নিতে হ'ত, কিন্তু বাইরের আনন্দে তাঁদের কোনো অংশ ছিল না। যে দেশের শ্রেষ্ঠতম পুরুষের মাথা পরাধীনতায় বিকিয়ে আছে, সেখানে মেয়েদের অবস্থা কত ভালোই বা হ'বে! তবু এই বাধা-বিপত্তির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেও সেদিন নারী যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তা নিতান্ত ন-গণ্য নয়, সেদিনে অল্প ও মধ্যশিক্ষিতা মেয়ে লেখিকাদের

সংখ্যা নেহাৎ কমও ছিল না। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত আসতে আমরা ইতিমধ্যে সমাজের এবং সাহিত্যের অনেক পরিবর্তনও দেখলুম, পাঠক সমাজের রুচির এবং জীবনযাত্রার প্রথা বদলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক লেখকলেখিকাকে উঠতে পড়তেও দেখা গেল, কিন্তু সাহিত্যিকের সৃষ্টি যেখানে বাস্তবের প্রতি সজাগ দৃষ্টির সঙ্গে অন্তরের সত্য অনুভূতি মিলিয়ে তৈরি, সেখানে তার ভয়ের কারণ নেই। একদিন পাঠকের বিচারে মাঘ কালিদাসের উর্দ্ধে এবং ভারতচন্দ্র চণ্ডীদাসের উর্দ্ধে স্থান পেয়েছিলেন, মধুসূদন ইলিয়াডকে রামায়ণমহাভারতের চেয়ে উপরে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হননি, কিন্তু আজ দিন ফিরেছে। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী লেখিকাদের সম্বন্ধে আজকের পাঠকের মত যাই হোক, তাঁদের মধ্যে ভালো জিনিষ যাঁর লেখায় যা' আছে, মহাকালের নিরপেক্ষ দরবারে সেগুলি একটা স্থায়ী স্থান পাবেই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

যাই হোক, খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব প্রথম প্রত্যক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যের কর্ণধারদের প্রভাবিত ক'রল, সমাজে নীতিজ্ঞান এবং সাহিত্যে সুরুচি ফিরে এল। উপন্যাস, নাটক প্রভৃতির রূপ দেশের সঙ্গে মিল রেখে বিদেশী ছাঁচে ঢালাই হ'য়ে সুনির্দিষ্ট হ'ল, বাংলায় কবিতার এবং গদ্যের সমভাবে উন্নতির সূচনা দেখা গেল। অবশ্য নারী লেখিকাদের মধ্যে তখনো সকলে এই পরিবর্তনকে মেনে নেননি, অজ্ঞাতনাম্নী নারী কবি তখনো এইভাবে শ্যামা-বিষয়ক গান লিখছেন:

"কাপড় নেই ব'ললে হ'ত, না হয় আমি দিতেম কিনে।
ছি ছি, কি লাজের কথা! বসন-বিহীনা নবীনে।"

ফরিদপুরের অবলা সেন তখনো চিরপরিচিত ভাষায় অন্তরের বেদনা দেবতাকে জানাচ্ছেন:

"দীননাথ, শুন নিবেদন,
সংসার পূজিয়া মোরা, নিশিদিন, আত্মহারা
খোয়াইনু জীবন জনম॥"

ভারতচন্দ্র থেকে দাশরথি পর্যন্ত বিখ্যাত কবিদের অনুকরণের চেষ্টা তখনো মেয়েদের মধ্যে চ'লছে।

হুগলীর একজন সরকারী উচ্চতম কর্মচারীর স্ত্রী এই যুগে একখানি কবিতার বই লেখেন। পাছে সেখানি কেউ না পড়ে সেই জন্য সহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করে ভূরিলোজনের দক্ষিণা-স্বরূপ প্রত্যেককে এক একখানি বই তিনি উপহার দেন। তাঁর লেখার একটু নমুনা দেব:

“ওগো লঙ্কা ললিতে, একবেলা যায় তোমার গুণ বলিতে।
যখন লাগে ঝাল, করি ঝালা-লাল, ঝরে লাল ঝরঝরিতে।
চারিদিকে করি দৃষ্টি, কোথায় আছে মিষ্টি,
দেখতে পেলে খাই হাপর-হাপরিতে।”

শ্রদ্ধেয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখায় এই যুগের একজন বৈষ্ণবী গৃহশিক্ষয়িত্রীর পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর নাম ছিল গৌরী দেবী। দ্বারকানাথের অন্তঃপুরে তিনি প্রতিদিন বিদ্যালোক বিতরণ করতে আসতেন, তাঁর কথকতা ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর ছাত্রীরা ছাড়াও বাড়ীর অনেকে তাঁর অধ্যাপনার সময় পাঠগৃহে সমবেত হতেন। তাঁর ভাষার একটু নমুনা দেব:

“যামিনী চতুর্যামে লগ্না হ’য়ে পড়েছেন, কিন্তু বিদায় গ্রহণ করতে পারছেন না। কেন না কৃষ্ণ রাধিকা দোঁহে দোঁহার প্রেম-বন্ধনে নিদ্রাচেতন হয়ে আছেন। আহা! সারা নিশি মানভঞ্জনে উভয়ের গত হয়েছে, নিশিভোরে তাই ঘুমে বিভোর হয়ে পড়েছেন। মরি মরি! আহা! প্রাণস্বরূপ শ্রীহরি প্রেমস্বরূপিনী শ্রীরাধার এই প্রেমমিলনে দ্যুলোক, ভূলোক বিশ্বচরাচর স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। বিহঙ্গ-বিহঙ্গীর কলরব নাই: নদনদী নিঃস্রোত, জীবজন্তু নরনারী গভীর নিদ্রামগ্ন, শুকতারা পূর্বাকাশ থেকে এখনো অস্ত যেতে পারছেন না। সূর্যদেব অরুণরথে সমাসীন হ’য়ে উদয় হ'তে ভয় পাচ্ছেন। সৃষ্টিতে প্রলয় আসে আসে।”

দেখা যাচ্ছে আজকের দিনের মতো সক্ষম এবং অক্ষম দু’রকম রচনাই সে-যুগে অনেক হয়েছিল, পিতামহীদের সিন্ধুক বাক্স ঘাঁটলে এ ধরণের লেখা কীটবিশিষ্ট হয়ে এখনও হয়তো কিছু কিছু আবিষ্কার হ’তে পারে। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ এবং বঙ্গীয় নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বহু নাটকের লেখক নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা স্বর্গীয়া ধরাসুন্দরী দেবীর অধিকাংশ লেখাই তাঁদের এডুকেশন গেজেটে ছাপা হ’লেও পুস্তকাকারে ছাপা হয়নি। তাঁর অ-মুদ্রিত ‘নন্দরাণী’ থেকে সে যুগের গদ্যের একটু উদাহরণ দেব:

‘মকরসংক্রান্তির সকালে ত্রিবেণীরঘাটে নৌকায় নৌকায় গাঁদি লাগিয়া গিয়াছে। কোনো নৌকায় কন্‌সার্টের দল গান-বাজনা লইয়া ব্যস্ত, কোনো নৌকায় চাঁদোয়া খাটাইয়া বাবুরা ঘিরিয়া বসিয়া মহা আনন্দে তবলা বাজাইতেছেন, মধ্যে খ্যাম্‌টাওয়ালির অভাবে টিপকলের নোলক নাকে মেয়ে-সাজানো ছেলের নাচ চলিতেছে।......ঘাটে কীর্তনের দল কাপড় পাতিয়া ঢোল বাজাইয়া ভিক্ষা করিতেছে। ঘাটের উড়িয়া ব্রাহ্মণগণ সিংহাসনে পিতলের ঠাকুর সাজাইয়া ছাপ লইয়া স্নানার্থিনীদের স্নানান্তে ডাকাডাকি করিয়া পয়সা লইয়া কপালে ছাপ লাগাইতেছে। বহুরূপীর দল কেহ গণেশ কেহ শিব দুর্গা সাজিয়া থালা হাতে করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভিক্ষা করিতেছে। সকলেই মহাব্যস্ত।...’

"বড়বধূ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, জানি গো জানি! ওকে বলে পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ! চল্ ভাই সেজবৌ, ওর তো জানবার আবশ্যক নেই, তবে মিছে কেন ব'সে ব'সে হায়রান হওয়া।"

দেখা যাচ্ছে, এই যুগের লেখার মধ্যে শক্তির পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া যায় না তা' নয়, এইরকম কত শক্তি ব্যক্তিগত কুণ্ঠার বা লোক-লজ্জার ভয়ে লোক লোচনের অন্তরালে আত্মগোপন করে ব্যর্থ হ'য়ে গেছে, কে' তার হিসাব রাখে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পাশ্চাত্যশিক্ষার বিস্তার এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সমাজের সহানুভূতি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বহু মহিলা লেখিকা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। তাঁদের ধারাবাহিক তালিকা দেবার পূর্বে ঐ শতাব্দীর চারজন সর্বপ্রধানা কবি এবং সর্বশ্রেষ্ঠা উপন্যাসের রচয়িত্রী ও সম্পাদিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চাই। তাদের নাম যথাক্রমে শ্রীমতী গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী, শ্রীমতী মানকুমারী বসু, শ্রীমতী কামিনী রায় এবং শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

বাংলাদেশে এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠা তিন জন কবির মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী বয়সের দিক দিয়ে সবার বড়, গিরীন্দ্রমোহিনীর জন্ম ১৮৫৮ সালে। ১৮৬৮ সালে বহুবাজারে এক রক্ষণশীল পরিবারে দশবৎসর বয়সে এঁর বিবাহ হয়। বাল্যকাল থেকে সংস্কৃত পড়ার দিকে, কবিতা লেখার দিকে এবং ছবি আঁকার দিকে তাঁর ঐকান্তিক আকর্ষণ ছিল, উত্তরকালে এই সব দিকেই তিনি শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। 'হিন্দুমহিলার পত্রাবলী' 'ভারতকুসুম' "কবিতাহার", "অশ্রুকণা", "সন্ন্যাসিনী", "শিখা", "অর্ঘ্য", "সিন্ধুগাথা", "স্বদেশিনী" প্রভৃতি তাঁর বইগুলির মধ্যে যে ভাবমাধুর্য্য ও ভাষার সারল্য দেখতে পাই, তা' আজকের দিনে দুর্লভ। রক্ষণশীল সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্তঃপুরবাসিনী নারী সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় কতদূর উন্নতি করতে পারে, তিনি তাঁর উজ্জ্বল নিদর্শন। গদ্যে এবং পদ্যে তিনি সমান স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে রচনা ক'রে গেছেন। কালিদাসের কুমারসম্ভব বাংলায় অনুবাদ করে তিনি তাঁর সংস্কৃত ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর স্বামী নরেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যুর পর থেকে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সাংসারিক শোক-সন্তাপের মধ্যেও গৃহকর্মের অবসরে সাহিত্যচর্চাই ছিল তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা। তার লেখার একটু নমুনা দিচ্ছি:

"মাটিতে নিকানো ঘর, দাওয়াগুলি মনোহর,
সমুখেতে মাটির উঠান।
খোড়ো চালখানি ছাঁটা, লতিয়া করলালতা
মাচা বেয়ে করেছে উত্থান।
..শান্ত স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে গ্রাম্য মাঠে গরু চরে:
তরুতলে রাখাল শয়ান:

সরু মেঠো রাস্তা বেয়ে পথিক চলেছে গেয়ে
মনে পড়ে সেই মিঠে তান।”

“শুভসাধনা”, “প্রিয় প্রসঙ্গ”, “বিভূতি” “বীরকুমারবধ”, ‘কাব্যকুসুমাঞ্জলি’ এবং ‘কনকাঞ্জলি’ প্রভৃতির রচয়িত্রী মানকুমারী (১৮৬৩-১৯৪৩) এঁর পরবর্তী কবি। মানকুমারীর কবিতার বিষয়বস্তুর গণ্ডী আরও সঙ্কীর্ণ, কিন্তু অত্যন্ত সাধারণ বিষয়ও তাঁর আন্তরিক সমবেদনার স্পর্শে, তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় এবং তাঁর সহজ সরল ভাষার মাধুর্যে অসাধারণ এবং অপরূপ হয়ে উঠেছে, এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব। তাঁর আঁকা বাংলার পল্লীপ্রাঙ্গণ, তুলসীতলা, শিবপূজা প্রভৃতির মধ্যে আমরা আমাদের প্রতিদিনের দেখা ছবিই দেখতে পাই, নূতন দৃষ্টিতে, অভিনব ঐশ্বর্যমণ্ডিত রূপে। তাঁর:

“নমো দেব মহাদেব নমো রাঙা পায়।
পোড়া হাড় ভস্ম ছাই, ও চরণে পায় ঠাঁই,
আকন্দ ধুতূরা ফুল গরবে দাঁড়ায়।...
এমন আপন ভোলা, এমন পরাণ খোলা,
এমন রজতগিরি শ্বেত শতদল,
পবিত্র শঙ্কর কোথাও দেখিনি কেবল।”

প্রভৃতি কবিতা “আমি চাই শিশু হেন উলঙ্গ পরাণ” “পতিতোদ্ধারিণী” প্রভৃতি কবিতা বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে ‘বীরকুমারবধ কাব্য’ রচনা ক’রে তিনি শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁকে ও বিষয়ে তাঁর পিতৃব্য মাইকেল মধুসূদনের অনুকরণকারী হেমচন্দ্র বা নবীন চন্দ্রের সমকক্ষ ব’ললে অত্যুক্তি হবে না। মানকুমারী প্রধানতঃ মধুর এবং করুণরসের কবিতায় সাফল্য অর্জন করেছেন।

কবিতার ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যিনি সব চেয়ে বেশী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর নাম শ্রীমতী কামিনী রায়। ইনি বিখ্যাত ব্রাহ্ম নেতা চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা, বরিশাল জেলার বাসন্দা গ্রামে ১৮৬৪ অব্দে এঁর জন্ম হয়। শৈশবে পিতামহের কাছে কবিতা ও স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে এঁর কবিতার স্ফুরণ হয়, আট বছর বয়স থেকে ইনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। এঁর প্রথম কবিতার বই ‘আলো ও ছায়া’ বিনা নামে প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সালে। অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবারে শৈশব কাটিয়ে ইনি সাত বৎসর বয়সে কলকাতায় এসে প্রগতিশীল সমাজের আবহাওয়ায় বর্ধিত হন এবং কবিত্ব খ্যাতির জোরে ত্রিশবৎসর বয়সে সিভিলিয়ান স্বামী লাভ করেন। “অম্বা” “পৌরাণিকী” “মহাশ্বেতা” “পুণ্ডরীক,” “একলব্য” “শ্রাদ্ধিকী,” “দ্রোণ-ধৃষ্টদ্যুম্ন” প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ বই। কামিনী রায় পূর্ববর্তী কবিদের চেয়ে বহির্জগৎকে দেখবার সুযোগ বেশী পেয়েছিলেন বাংলার যুগান্তকারী কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ে, তাঁর চিন্তার পরিধিও

তাই ব্যাপকতর। ব্যক্তিগত শোক-দুঃখকে অতিক্রম ক'রে তাঁর আশার বাণী কবিতায় রূপায়িত হয়েছে, তাঁর দেশপ্রেম শতসহস্রের বক্ষে সঞ্চারিত হয়েছে। তাঁর স্বদেশ প্রেমের কবিতার একটি নমুনা দিচ্ছি:

“যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুখিনী জনমভূমি মা আমার, মা আমার!
অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে,
ছোট খাটো দুঃখ সুখ কে হিসাব রাখে তার?
তুমি যবে চাহো কাজ মা আমার মা আমার!”

এ ধরণের কবিতা নারীর লেখনী পরে লিখেছে, কিন্তু তিনি যে তা'দের পথপ্রদর্শক একথা অনস্বীকার্য। পুত্রশোকে রচিত তাঁর করুণ রসের কবিতা: “তোমার দেহের সাথে হলো ভস্মীভূত, আমার অগণ্য আশা”; প্রভৃতি এবং তাঁর আত্মবিলোপকারী প্রেমের কবিতা: ‘হয় হোক প্রিয়তম, অনন্ত জীবন মম, অন্ধকারময়। তোমার পথের পরে অনন্তকালের তরে আলো যদি রয়।”

প্রত্যেকটিই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অতুলনীয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে সত্তর বৎসর বয়সে এঁর দেহান্তর হয়েছে। সকলের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ মিষ্ট মধুর স্বভাবের জন্য এঁরা তিনজনেই কেহ কাহারও চেয়ে কম ছিলেন না। হিন্দুসমাজের মেয়েদের সেকালের বৈশিষ্ট্য প্রথমোক্তাদের মধ্যে ত' ছিলই, আধুনিক সমাজে জীবন কাটালেও কামিনী রায়ের মধ্যেও প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সুমধুর সমন্বয় ঘটেছিল, স্নেহ প্রেমের প্রাচুর্যই সেই প্রাচীন আদর্শ, যাতে করে অপরিচিতকে মুহূর্তে আপন করে, আপনকে পর করে না।

এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালিনী লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা (১৮৫৫-১৯৩২)। তাঁহার আবির্ভাবে বাংলার নারী সমাজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল। সেই যথার্থ যুগ-সাহিত্যিকা মহীয়সী মহিলাকে তদানীন্তন সুধীসমাজ মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ দিয়েছেন। তাঁর পূর্বেও মেয়েরা কবিতা গল্প প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু মেয়েদের লেখা তখন পর্যন্ত খানিকটা কৃপার চক্ষেই দেখা হত। তিনিই প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে সকল দিক দিয়ে নারীর শক্তিকে জাগিয়ে তুললেন, নারীর রচনাকে পুরুষের কৃপাদৃষ্টি থেকে উদ্ধার ক'রে শ্রদ্ধার এবং বিস্ময়ের বস্তু ক'রে নিলেন। তাঁর পূর্বে কোনো মহিলা লেখিকা একাধারে গদ্যে পদ্যে সমানভাবে তাঁর মতো কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। শুধু তাই নয়, গল্প, উপন্যাস, শিশুসাহিত্য, গান, গাথা, ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিষয়ক প্রবন্ধ, ভ্রমণবৃত্তান্ত,

অনুবাদ,বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থ—সর্ববিধ রচনাতেই তিনি জয়যুক্ত হয়েছেন। বঙ্গসাহিত্যে নারীর দানের মধ্যে তাঁর দান যেমন বিপুল, তেমনি বিচিত্র। রচনার মৌলিকতাতেও তিনিই মেয়েদের প্রথম পথপ্রদর্শিকা ব'ললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা দীর্ঘকাল ধরে উজ্জ্বল থেকে তাঁকে দিয়ে বাংলার নারীজগতের যে উপকার সাধন করিয়েছে তার তুলনা হয় না। এ রকম সর্বতোমুখী প্রতিভা শুধু এদেশে কেন, কোনো দেশেই সুলভ নয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস "দীপনির্বাণ" পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার কাহিনী নিয়ে লেখা। তারপর একে একে "বসন্ত উৎসব" (নাটক) "মালতী" (উপন্যাস) "গাথা", "দেবকৌতুক" (নাটক) "কোরকে কীট", "ফুলের মালা", "ছিন্নমুকুল", "স্নেহলতা", "হুগ্লীর ইমাম্বাড়ী", "বিদ্রোহ", "মিবাররাজ", "বিচিত্রা", "স্বপ্নবাণী", "ফুলের মালা", "পাকচক্র", "কাহাকে", "নবকাহিনী", "বাল্যবিনোদ", প্রভৃতি উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতার বই এবং শিশুপাঠ্য পুস্তক তিনি রচনা করেছেন। খুব ছোট বেলা থেকে তিনি লিখতে আরম্ভ করেন, প্রথম দিকের লেখায় কিছু আড়ষ্টতা এবং ভাষায় কাঠিন্য থাকলেও ক্রমে তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল এবং চরিত্রবর্ণনা নিখুঁত হয়েছে। ঐতিহাসিক সামাজিক রোমাণ্টিক, সব রকম উপন্যাসই তিনি লিখেছেন, কিন্তু সামাজিক চিত্রে এবং বিয়োগান্ত গল্পে তাঁর নৈপুণ্য সব চেয়ে বেশী প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "স্নেহলতায়" তদানীন্তন সমাজে আধুনিকতার সংঘাত এবং তার সমস্যা নিয়ে তিনি গভীরভাবে আলোচনা করেছেন, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসুত্র দেখাতে চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে অতীত এবং বর্তমানের নারীর মধ্যে তিনিই প্রথম যোগসূত্র। তিনি শুধু নিজেই একজন বড় লেখিকা ছিলেন না, বড় লেখিকাদের শক্তিকে অঙ্কুরে চেনবার অদ্ভুত শক্তি তাঁর ছিল। অখ্যাত অজ্ঞাত লেখিকাদের আবিষ্কার ক'রে প্রথম থেকে তাদের সাহিত্য-সাধনায় উদ্বুদ্ধ করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল অসাধারণ। তিনি দীর্ঘকাল যোগ্যতার সঙ্গে "ভারতী পত্রিকা" সম্পাদন করেছিলেন। একবার বাংলা ১২৯১ সাল থেকে ১৩০১ সাল পর্যন্ত এগারো বছর, আর একবার ১৩১৫ সাল থেকে ১৩২১ সাল পর্যন্ত সাতবছর তিনি এই পত্রিকার সম্পাদিকার কাজ যোগ্যতার সঙ্গে চালিয়েছেন। এই সময়ে সম্পাদিকারূপে বিষয় নির্বাচনে এবং সম্পাদকীয় মন্তব্যে এবং মৌলিক রচনায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েই ক্ষান্ত হননি, বর্ত্তমান বাংলার অধিকাংশ যশস্বী ও যশস্বিনী লেখক লেখিকাকে সস্নেহ প্রেরণা দান করে এবং তখনকার দিনের সব চেয়ে নামকরা মাসিক পত্রিকায় স্থান দিয়ে নূতন লেখকলেখিকাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করেছেন। তাদের অস্ফুট শক্তিকে ফুটিয়ে তুলে অজস্র কুমুদ-কহ্লারের গাঁথা মালায় বঙ্গভারতীর পূজাবেদীকে সুশোভিত হ'বার সুযোগ করে দিয়েছেন। মনিলাল, সৌরীন্দ্রমোহন, বিভূতিভট্ট, সত্যেন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, (এঁর বড়দিদি সর্বপ্রথম ছাপা উপন্যাস ভারতীতেই প্রকাশিত হয়েছিল)। অপর দিকে অনুরূপা দেবী, ইন্দিরা দেবী, নিরুপমা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, আমোদিনী ঘোষজায়া, লজ্জাবতী বসু-কন্যা, পাকুড় রাজকন্যা হেমনলিনী বা শৈলাঙ্গিনী দেবী প্রভৃতি নারী লেখিকারাও তাঁর বহু সহায়তা লাভ করেছেন, সে ঋণ তাঁরা কোন মতেই অস্বীকার ক'রতে পারেন না।

বস্তুতঃ তাঁর পরেই বাংলা দেশে সর্ব বিষয়ে মেয়েদের সাহিত্যচর্চা ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। "ফেটালগারল্যাণ্ড" (ফুলের মালা) এবং "আন্‌ফিনিস্‌ড্‌ সং" (কাহাকে) এই দু'খানি ইংরাজী উপন্যাস তিনি নিজেই ইংরাজীতে লিখেছিলেন।

সেদিনে অবশ্য নাম গোপন করে মেয়েদের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশকারীর ভীরু-সঙ্কোচ অনেকখানিই কেটে এসেছিল, তথাপি তাঁরা তখনও সম্পূর্ণরূপে সংশয়মুক্ত হ'তে পারেননি। তখনও বহুস্থলে অভিভাবকরা বা অভিভাবিকারা কন্যা বধূদের বাইরে নাম করা-করি পছন্দ করতেন না, (সমাজ তখনও ভূতপূর্ব মোগল-পাঠান প্রভাব অতিক্রম করতে পেরে ওঠেনি) আবার অপর পক্ষে লেখিকারা নিজেরাই বহুস্থলে, উপহসিত হ'বার বা সমালোচনার ভয়ে ভীতা হতেন। 'পাছে লোকে কিছু বলে!' এ না হলে আমরা আরও দু'জন শক্তিশালিনী লেখিকার পরিচয় পেতে পারতাম। তাঁদের একজন ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা ৺বিজয়া দেবী। তিনি "কাউণ্ট অফ্ মণ্টিকৃষ্ট", "আইভ্যানহো" "ব্রাইড অফ্ লামেরমূর", "সেকেণ্ড ওয়াইফ" প্রভৃতি বহু ইংরাজী পুস্তকের অতি সুন্দর অনুবাদ করেছিলেন এবং তাঁর অকালে কাল-কবলিতা কন্যা অপর্ণা দেবীর বহু মৌলিক উপন্যাস লিখিত ছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পরবর্তী কালেও সেগুলি ছাপা হয়নি।

১৮৫৮ খৃঃ অব্দে সংবাদ-প্রভাকরে একজন বঙ্গমহিলার লেখা কবিতা প্রকাশ ক'রে কবি ঈশ্বরগুপ্ত যে মন্তব্য লিখেছিলেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করলাম,:

"সংবাদ-প্রভাকর—

মঙ্গলবার ২২শে পৌষ, ১২৬৪ সাল। ইং ৫ই জানুয়ারী

১৮৫৮ সাল। ৩য় পৃঃ। ১ম কলম।

একটী ভদ্র কুলাঙ্গনা বিরচিত পতি-বিরহ বিষয়ক কবিতা আমরা অত্যন্ত আদর ও যত্নপূর্বক প্রকটন করিতেছি, পাঠক মহাশয়েরা মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিলে সাতিশয় সন্তোষ সঞ্চয় করিবেন। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া এবং কতিপয় প্রামাণ্য লোকের প্রমুখাৎ বিশেষরূপে শ্রবণ করিয়া অবগত হইলাম, ঐ রচনাটা যথার্থই * * কামিনীর বিরচিত। স্ত্রীলোক হইতে এতদ্রূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উৎকৃষ্ট পদ্য প্ররচিত হইয়াছে; ইহা আমরা পূর্ব্বে বিশ্বাস করি নাই, এ কারণ বহুদিবস পর্যন্ত অপ্রকাশ রাখিয়াছিলাম, ইহাতে উক্তা রচনাকারিণী নিতান্তই দুঃখিনী হইয়া দ্বিতীয় একটা কবিতা পুনর্বার প্রেরণ করেন। আমরা তাহাতে সন্দিগ্ধ হইয়া এ পর্য্যন্ত তৎপ্রকাশ পরাংমুখ ছিলাম, কিন্তু এইক্ষণে বিশ্বাসী বন্ধুর বচনে বিশ্বাস জন্মিবার সন্দেহশূন্য হইয়া একটী শব্দও পরিবর্ত্তন

না করিয়া অবিকল পত্রস্থ করিলাম। কবিতায় যে সকল বিষয়ের আবশ্যক করে, ঐ রচনায় তাহাই আছে; কোনো অংশেই কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, * * * ... ...

হে স্ত্রী-বিদ্যার বন্ধুগণ! আপনারা এই পদ্যটী একবার পাঠ করুন।”—“বহুগুণালঙ্কৃত মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় বহুগুণ-মন্দিরেষু।

এ অধীনী কর্ত্তৃক পয়ার ছন্দে বিরচিত নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি সংশোধনানন্তর প্রকাশ করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধনে আজ্ঞা হইবেক।

পয়ার।

আশপথ নিরখিয়ে আছয়ে কামিনী।
যেমন চকোরী থাকে, আগতে যামিনী॥
সেইরূপ কিছুদিন করিলাম ক্ষয়।
তবু সেই প্রাণকান্ত না হলে উদয়॥

[থানা রাজাপুরের অন্তঃপাতি ইলিপুর নিবাসিনী কুলকামিনী শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী দাসী] ২৯শে কার্তিক। ১২৬৪।”

ইংরাজ আমলে বাঙ্গালী মহিলা কবির লেখা কবিতা প্রথম ছাপার অক্ষরে বার হয়, ‘সংবাদ প্রভাকর’ নামক পত্রিকায়, কিন্তু সে যুগে মেয়েদের লেখায় নাম দেওয়ার প্রথা ছিল না বলে তাঁদের পরিচয় আমরা জানতে পারিনি। সময়ের দিক থেকে বিচার ক’রলে যাঁদের নাম আমরা এ পর্যন্ত পেয়েছি সেই সব মহিলা লেখিকাদের মধ্যে অগ্রণী শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী দাসী। তাঁর “চিত্ত-বিলাসিনী” (১৮৫৬) নামক গদ্যে পদ্যে লেখা বইখানিতে তিনি কৌলীন্য-প্রথার দোষ দেখিয়েছেন। এই যুগের লেখিকাদের মধ্যে কেহ কেহ সংবাদ প্রভাকরে এবং এর পরবর্তিনীরা অনেকেই বামাবোধিনী পত্রিকায় ও এডুকেশন গেজেট পত্রিকায় কবিতা লিখতেন, প্রার্থনা এবং শোকোচ্ছ্বাসই ছিল অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু। নারীজাতির আদর্শ কর্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ এবং সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে কেউ কেউ প্রবন্ধও লিখতেন, তবে তার সংখ্যা বেশী ছিল না। যাঁদের ছাপা বই পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে কৈলাসবাসিনী দেবীর “হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা” (১৮৬৩), অজ্ঞাতনাম্নী লেখিকার “কবিতামালা” (১৮৬৫), কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী, মার্থা সৌদামিনী সিংহের “নারীচরিত” (১৮৬৬) উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালী নারীর লেখা প্রথম গার্হস্থ্য উপন্যাস হেমাঙ্গিনী দেবীর “মনোরমা” ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে লেখা হ’লেও ছাপা হয় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ‘বঙ্গবালা’ কাব্যে লেখিকার নাম নেই। ঐ বৎসর (১২৭৫ সাল) প্রকাশিত রাসসুন্দরী দেবীর “আমার জীবন” নামক

জীবন-স্মৃতির বইখানি ভাষার সারল্যে এবং মাধুর্য গুণে ঐ সময়কার নারীরচিত শ্রেষ্ঠ রচনা ব'লে বিবেচিত হ'য়েছে। কৈলাসবাসিনী দেবীর কবিতার বই "বিশ্বশোভা", কামিনীসুন্দরী দেবীর নাটক "উর্বশী" এবং দয়াময়ী দেবীর 'পতিব্রতা ধর্ম' ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর পর অজ্ঞাতনাম্নী লেখিকার 'কুসুমমালিকা' (১৮৭১), অন্নদাসুন্দরী দেবীর কবিতার বই "অবলাবিলাপ" (১৮৭২), লক্ষ্মীমণি দেবীর গার্হস্থ্য বিষয়ক নাটক "চিরসন্ন্যাসিনী" (১৮৭২) শ্রীমতী নিতম্বিনী দেবীর "অনূঢ়া যুবতী" নাটক (১৮৭২) হরকুমার ঠাকুরের সহধর্মিণী রচিত গার্হস্থ্য উপন্যাস "তারাবতী" (১৮৭৩) এবং ইন্দুমতী দাসী প্রণীত 'দুঃখমালা' নামক কবিতার বই (১৮৭৪) উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের মধ্যেই তাহেরুন্নিছা বিবি, রমাসুন্দরী ঘোষ, ক্ষীরোদা দাসী, শৈলজাকুমারী দেব্যা, মধুমতী গঙ্গোপাধ্যায়, বিন্ধ্যবাসিনী দেবী, কামিনী দত্ত, রাধারাণী লাহিড়ী, ভুবনমোহিনী দেবী, কুন্দমালা দেবী, নীরদা দেবী, সৌদামিনী খাস্তগীর প্রভৃতি লেখিকার নাম পাওয়া যায়, বসন্তকুমারী দাসীর "বোগাতুরা" কাব্যগ্রন্থও ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়। শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী কর্তৃক সম্পাদিত 'বিনোদিনী' মাসিক পত্রিকা ১৮৭৪ সালে বা'র হয়ে দু' বৎসর পরে বন্ধ হ'য়ে যায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সুরঙ্গিণী দেবীর 'তারাচরিত' নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রশংসা লাভ করে। তারপর স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম রচনা "দীপনির্বাণ" প্রকাশিত হ'বার পর থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বাংলার নারীরচিত সাহিত্যে তাঁর একাধিপত্যের যুগ ব'ললে অন্যায় হবে না। এডুকেশন গেজেটে এবং বামাবোধিনী পত্রিকায় ইতিপূর্বে বা এই যুগে যে সব নারী লেখিকা স্বনামে অনামে কবিতা লিখতেন তাঁদের সকলের নাম সংগৃহীত হয়নি, তবে কোন্নগরবাসিনী 'জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ' নাম্নী লেখিকার লেখা তখন সকলেরই খুব ভালো লাগত। মনীষী ভূদেব তাঁর গৃহকন্যাদেরও যেমন গদ্য-পদ্য রচনায় উৎসাহ দান ও সেই সব অবান্তর রচনা নিয়ে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তাদের সহায়তা করতেন, তেমনি অনাত্মীয়া মেয়েদের ভীরু প্রচেষ্টাকেও কোনো মতেই নিরুৎসাহিত করতেন না। এ বিষয়ে বামাবোধিনী পত্রিকার কাছেও মেয়েদের ঋণ সামান্য নয়। সে সময়ে প্রেম প্রণয়ের কথা নিয়ে কবিতা মেয়েরা সাধ্যপক্ষে লিখতেন না, লিখলেও তা' নির্লজ্জ হ'য়ে ছাপাতেন না। শোকগাথা, ধর্মগাথা, ভাগবতভক্তির কাহিনী এই সমস্তই সাধারণতঃ তাঁদের লেখার মর্মকথা ছিল, তবে মিলনানন্দ ও বিরহ-ব্যাকুলতা যে তাঁদের লেখায় একেবারেই স্থান পেত না তা' অবশ্য বলা যায় না। ও-বিষয়ে তো আমাদের দেশে আড়াল দে'বার সুযোগ কিছু কম ছিল না, শ্রীরাধিকার মুক্তামালা ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিয়ে শ্যাম-দর্শন করার মতো রাধাকৃষ্ণের মধ্যে দিয়েই তো যথেষ্ট হা-হুতাশ করা যায় এবং সেই সঙ্গে পরমানন্দ উপলব্ধি করাও চলে। এই সনাতন প্রথায় এ যুগেও অনেকে চলেছেন। গদ্য রচনায় নারীর কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রচলিত রীতিনীতির অনুকূলভাবে গল্প উপন্যাস রচনা হ'ত, নারীপ্রগতি তখনো আত্মপ্রকাশ করেনি। নিজেদের সমাজধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করেও অনেক বড় কাজ এবং ভালো কাজ মেয়েদের করবার আছে, সেই বোধটা তখন জাগ্রত হয়েছিল এবং তখনকার লেখিকারা জনসমাজের মধ্যে, তথা নারীসমাজের মধ্যে সেই সত্যদৃষ্টি খুলে দেবার যথোচিত সহায়তাও করেছিলেন। কতকগুলি সামাজিক কুপ্রথা যা' ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালে বা সাময়িক প্রয়োজনে

প্রতিষ্ঠা পেয়ে আলোকলতার মত আসল গাছকে মারতে বসেছে, সেই মারক- লতা উন্মূলনের প্রচেষ্টা করার অধিকার সকলেরই আছে, তাঁরাও তা' করেছেন; যেমন বিবাহ-কৌলীন্যের, যেমন পুরুষের উচ্ছৃং্খলতার, যেমন স্ত্রীশিক্ষার, যেমন কঠোর পর্দাপ্রথার, যেমন বরপণের।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বিরাজমোহিনী দাসীর কবিতাহার এবং "জনৈকা ভদ্রমহিলার" লেখা (সম্ভবতঃ লক্ষ্মীমণি দেবীরই) 'সন্তাপিনী' নাটক প্রকাশিত হয়। "সন্তাপিনী" নাটকে বঙ্গ অন্তঃপুরের চিত্র খুব জীবন্ত; ব্যঙ্গ এবং নারীসুলভ বাগ্‌বিন্যাসে বইটি সুখপাঠ্য, বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে এবং বহু বিবাহের বিপক্ষে তৎকালোচিত যুক্তিতর্কও বইটিতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। পর বৎসর স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কোরকে কীট' এবং 'মনোরমা' লেখিকা হেমাঙ্গিনী দেবীর রোমাণ্টিক উপন্যাস "প্রণয়-প্রতিমা" (১৮৭৭ খৃঃ) প্রকাশিত হয়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ভুবননোহিনী দেবীর 'স্বপ্নদর্শনে অভিজ্ঞান' নামক কাব্যগ্রন্থ এবং শ্রীমতী স্বর্ণলতার "শুরবালা" এবং "সুরবালা" উল্লেখযোগ্য বই।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে নবীনকালী দেবীর "শ্মশানভ্রমণ" নামক কাব্য, বসন্তকুমারী দাসীর "রোগাতুরা" প্রকাশিত হয়। তরঙ্গিণী দাসীর 'সুগ্রীবমিলন' যাত্রার পালাগান, স্বর্ণকুমারী দেবীর 'মালতী'গল্প এবং গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'কবিতাহার' প্রকাশিত হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'গাথা' নামক কাব্যগ্রন্থ, নয়নতারা দে'র 'মণিমোহিনী' এবং মণিমোহিনী দেবীর 'বিনোদকানন' নাটক; ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কামিনীসুন্দরী দাসীর "কল্পনাকুসুম" এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দেবকৌতুক' প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ অব্দে জ্ঞানেন্দ্রমোহিনী দত্তের "ধূলিরাশি", রাণী মৃণালিনীর "প্রতিধ্বনি"। নির্ঝরিণী এবং ১৮৮৫তে "কল্লোলিনী" উক্তা মৃণালিনী দেবী প্রণীত।

শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'ভারতী' এই ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে (১২৯১সাল) স্বর্ণকুমারী দেবীর পরিচালনাধীনে আসে এবং শরৎকুমারী চৌধুরাণী-প্রমুখ বহু লেখিকা তা'তে লিখতে আরম্ভ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে নিস্তারিণী দেবীর 'কেশবজ্যোতি' এবং ষোড়শীবালা দাসীর "পুষ্পকুঁড়ী" নামক কবিতার বই দু'টি উল্লেখযোগ্য বই। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সত্যেন্দ্র ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী কর্তৃক সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঐ কাগজে স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবীর এবং অন্যান্য কয়েকজন লেখিকার লেখা দেখতে পাওয়া যায়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে নবীনকালী দেবীর 'ষট্‌চক্রভেদ' ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নময়ী দেবীর 'নীহারিকা' কাব্যগ্রন্থ, মানকুমারী বসুর 'বনবাসিনী', ১৮৮৮ সালে প্রসন্নময়ী দেবীর 'আর্যাবর্ত' নামক ভ্রমণ কাহিনী, প্রফুল্লনলিনী দাসীর "ষষ্ঠীবাঁটা" প্রহসন, ব্রজেন্দ্রমোহিনী দাসীর 'কবিতামালা' নামক কবিতা-সংগ্রহ প্রভৃতি কয়েকখানি বই বেরিয়েছিল। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া' বিনা নামে প্রকাশিত হ'য়ে লেখিকাকে অবিলম্বে যশস্বিনী করে তুলেছিল। তাঁর সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করেছি। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের অন্যান্য বিখ্যাত বই গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'ভারতকুসুম' ও 'অশ্রুকণা' এবং প্রসন্নময়ী দেবীর, 'অশোকা'

উপন্যাস, ১৮৯০ (১৮৯৩?) খৃষ্টাব্দে ঐ সময়কার অন্যতম শ্রেষ্ঠা মহিলা কবি মানকুমারী বসুর ‘কাব্যকুসুমাঞ্জলি’ প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসরের আর কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বই গিরীন্দ্রমোহিনীর ‘আভাষ’ নামক কাব্যগ্রন্থ, প্রমীলা নাগের ‘প্রমীলা’ কাব্য, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বিনয়কুমারী বসুর ‘নির্ঝর’ এবং প্রমীলা নাগের ‘তটিনী’ কাব্যগ্রন্থ, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর ‘মীরাবাই’ নাটক, স্বর্ণকুমারী দেবীর “স্নেহলতা”। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বাংলা ১৩০০ সালে মনোমোহিনী গুহের ‘চারুগাথা’ কাব্য এবং বাংলা ১৩০০ সালের মধ্যে লেখা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই, শতদলবাসিনী দেবীর ‘বিধবা বঙ্গললনা’, বনপ্রসূন রচয়িত্রীর ‘সফলস্বপ্ন’ উপন্যাস। হিরন্ময়ী দেবী, প্রতিভা দেবী, সরলা দাসী, ইন্দিরা দেবী, অন্নদাসুন্দরী ঘোষ, লাবণ্যপ্রভা বসু, প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, বিনয়কুমারী বসু প্রভৃতি বহু লেখিকা এই সময় বিভিন্ন মাসিকপত্রে নিয়মিত নানাবিষয়ে কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লিখছিলেন। এ ছাড়া বহু লেখিকা বিশেষতঃ কবিতারচয়িত্রী, বিভিন্ন মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিকের নিয়মিত লেখিকা ছিলেন, পরবর্তী কালে তাঁরা অনেকেই সাহিত্যক্ষেত্র থেকে একান্ত অকালেই অপসৃতা হয়ে গ্যাছেন।

মোট কথা, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং শেষের দিকে নারী-বিরচিত সাহিত্যে আমরা আকাশ পাতাল পরিবর্তন দেখতে পাই। স্বর্ণকুমারী দেবীর সমসাময়িক সরোজকুমারী দেবী, অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা, স্বর্ণলতা বসু, “স্নেহলতা” ‘প্রেমলতা’রচয়িত্রী কুসুমকুমারী দেবী প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটে। তারপর কিছুদিন নারী লেখিকার সংখ্যা ও শক্তির অপ্রতুলতা দেখা যাওয়ার পর, শতাব্দীর শেষদিকে আবার নারীকে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে দেখতে পাওয়া যায়।

অন্তঃপুর নামক মহিলাদিগের জন্য বিশেষভাবে পরিচালিত মাসিক পত্রের সম্পাদিকা সুমতি-সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী বনলতা দেবীর (১৮৭৯-১৯০০ খৃঃ) কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। ঐ পত্রিকাখানিতে শুধু নারী লেখিকাগণের লেখা প্রকাশিত হতো। “বনজ” নামে একখানি পুস্তকও তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক আরও দু’জন নারী কবির মধ্যে একজন ইংরাজীতে কবিতা লিখে বিশ্ব-বিশ্রুত হয়েছেন। আর একজন বাংলায় অনুরূপ শক্তির পরিচয় দিয়ে এরই মধ্যে বিস্মৃত হ’তে বসেছেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বঙ্গবালা হলেও বাংলা জানেন না। তাঁর জন্ম নিজামরাজ্যে হায়দ্রাবাদে, শিক্ষা উর্দ্দু এবং ইংরাজীতে। বাল্যকাল থেকে তিনি ইংরাজীতে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। “ভাঙ্গা পাখা”, ‘সময়ের পাখী’, “স্বর্ণ-দেহলি” প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তাঁকে ইংরাজী সাহিত্যে যশস্বিনী করেছে। সাহিত্যসাধনা ছেড়ে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান ক’রে তিনি যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার এবং অশেষ দুঃখক্লেশ বরণ করেছেন এবং দেশনায়িকারূপে যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন,[৭] আজ তাঁকে কবি সরোজিনী নাইডু বলে অনেকেই চেনেন না, এমন কি বাঙ্গালী বলেও দাবী কর্বার মত সম্বলও তিনি আমাদের দিয়ে রাখেননি, তাঁর পিতৃ-পরিচয়টুকু ছাড়া। অবশ্য আর একদিক দিয়ে তিনি বিশ্ব-বিখ্যাতি লাভ ক’রে ঐ পিতৃপরিচয়ের দাবীতে বাঙ্গালী মেয়েদের পরম গৌরব স্থাপন করেছেন। সে কথা সর্ব্বজনবিদিত।

ঐ বৎসরে জাত দ্বিতীয় কবি এবং ঔপন্যাসিকা ইন্দিরা দেবী প্রাতঃস্মরণীয় মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী, মুকুন্দ দেবের প্রথমা কন্যা এবং অনুরূপা দেবীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। ইন্দিরা দেবীর শৈশব শিক্ষা বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার শিক্ষাগুরু ভূদেব বাবুর হস্তেই ঘটেছিল। তিনি নিজেই তাঁকে সংস্কৃত ভাষায় সযত্নে শিক্ষা দেন।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে লিখিত তাঁর কবিতাগুলি আজও যে কোন আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবির লেখার পাশে স্থান পেতে পারে। দুই একটি নমুনা মাত্র দিচ্ছি,—

"আসবে তুমি, আসবে আমি জানি।
জলে স্থলে চল্‌ছে কানাকানি।

জ্যোৎস্না রাতে ঘুমিয়ে রবে ধরা,
গগন পবন থাকবে স্বপনভরা,
তখন তুমি আমায় দেবে ধরা,
কণ্ঠে নে'বে আমার মালাখানি।"

এই কবিতার আবেগময়ী ভাষার সঙ্গে তুলনীয় অভিমানী কবিতার:

"হাসি খেলা অভিনয়ে অশ্রুজলে ঢাকি,
ভেবেছিলাম এম্‌নি করে তোমায় দেব ফাঁকি।"

'রাধার স্বপ্ন' কবিতার ছন্দমাধুর্য,—

"কোথা সে মধুনিশি গেছে মিশি সজনি,
স্বপন-শোভা ভরা মনোহরা রজনী!
স্মরণে আসে শুধু, হাসে বিধু আকাশে,
কি সুরে গাহে পাখী, অমিয়া কি, মাখা সে!
যমুনা আনমন, তীরবন লগনা।
যেন কি ধ্যান ভরে, রহিত রে, মগনা!
বাজিত নিরজনে, দূর বনে, বাঁশরী।
ডাকিত বুঝি কারে, আপনারে, পাশরি!
দক্ষিণ সমিরণ, ফুলবন, লুটিত,
মরমে সুখসাধ, আধ আধ, ফুটিত।"

তাঁর একান্ত আত্ম-নিবেদনের করুণ সুরটুকু;—

“জীবনব্যাপী সাধনা দিয়ে তোমারে আমি চেয়েছি,
হৃদয়ভরা বেদনা নিয়ে তোমারে বুকে পেয়েছি।
বেদনানলে দহন করে, দিয়েছ মান দয়িত মোরে,
ফেলিয়া পাশে যাবে না সরে, সে আশা আজ পেয়েছি।

আমার চিত-কমল-দলে, সুরভি ছিল স্বপন ছলে,
অমল মম সে পরিমলে গগনতল ছেয়েছি।”

আবার এরই পার্শ্বে তাঁর রুদ্ররসের দুন্দুভি-নিনাদ, “প্লাবন” কবিতায়;—

সংহর সংহর রুদ্র এ তব সংহার বেশ,
সম্বর তাণ্ডব নৃত্য হে শম্ভো! হে প্রমথেশ!
মৃত্যুঞ্জয় জটাজাল, রুদ্ধ কর মহাকাল,
বহ্নিধূমে ধারাপাতে শ্বাসরুদ্ধ হল শেষ।
কোন যুদ্ধ প্রয়োজনে সাজিয়াছ হে ধূর্জটি?
নবীন নীরদজালে সর্পিয়া বেঁধেছ কটি।
মেঘ ডম্বরুর রবে, সভয় কম্পিত সবে,
ছিন্ন ভিন্ন দশ দিশি, চন্দ্রসূর্য্য পড়ে টুটি।
জটামুক্ত জহ্নুসুতা চরণে পড়িছে লুটি।’

ইন্দিরা দেবীর কবিত্ব-খ্যাতি একদা রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করেছিলেন। “এডুকেশন গেজেট” পত্রে তাঁর বহু কাব্য ও কবিতা প্রকাশিত হলেও পুস্তকাকারে ছাপা হয়নি। সে যুগে ছাপা হ’লে তাঁর কাব্যগুলি “কুমারসম্ভব” “ভট্টিকাব্য” “সাবিত্রী চরিত” “বাল্মীকি রামায়ণের আদি কাণ্ডের” পদ্যানুবাদ প্রভৃতি এবং বহুতর খণ্ড কবিতার জন্য ইন্দিরা দেবী যে তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ নারী কবিদের মধ্যের অন্যতমা বলে বিবেচিত হতেন, তাতে সন্দেহ নেই। পরের দিনে তাঁর বহু কবিতা বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁর দেহান্তের পর কয়েকটী মাত্র কবিতা একত্রে গ্রথিত হয়ে কাব্যগ্রন্থ “গীতিগাথায়” স্থান পেয়েছে।

ইন্দিরা দেবীর ছোট গল্প ১৩০১ সালের প্রথম কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপ্ত হয় এবং বহু মাসিকেও পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় উচ্চস্থান লাভ করে। তিনি সর্বসমেত পাঁচখানি ছোট গল্পের বই, পাঁচখানি উপন্যাস এবং একখানি কাব্যগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যকে দিয়ে

গিয়েছেন। ছোট গল্পের বই ‘নির্মাল্য’ তাঁর সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত পুস্তক—১৩১৯ সালে বা ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ছাপা হয়েছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ “কেতকী” মুদ্রিত হয়। “সৌধরহস্য” ১৯১৬ খৃঃ সার আর্থার কোনান ডয়েলের একখানি বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদ। এই স্থলে আর একজন সর্বজন-বিস্মৃতা বঙ্গবালার কথা আমরা একবার স্মরণ করবো; —বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে আর একজন নারী কবি জন্মেছিলেন, যাঁর দান থেকে বাংলা ভাষা বঞ্চিত হয়েছে, যদিও বাঙ্গালীর নাম তাঁর দ্বারা পৃথিবীর সাহিত্য-ক্ষেত্রে স্থায়ী আসন পেয়েছে। রামবাগানের দত্ত পরিবারের শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্তের মেয়ে তরুদত্ত (১৮৫৬-১৮৭৭) মাত্র একুশ বৎসরের জীবনে ফরাসী এবং ইংরাজী ভাষায় কাব্যরচনা ক’রে বিদেশী সুধীগণের বিস্ময় উৎপাদন এবং শ্রদ্ধালাভ ক’রে গেছেন। তাঁর ইংরেজী কবিতা সমষ্টি “হিন্দুস্থানের গাথা” এবং পুরাকথার সাবিত্রী, যোগাদ্যা, লক্ষ্মণ প্রভৃতি কবিতায় তিনি ভারতীয় কাব্যের অতীত ঐশ্বর্যকে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য জগতের জনসাধারণের সামনে ধরেছিলেন। “প্রাচীন ভারত রমণী” নাম দিয়ে একখানি ফরাসী ভাষায় বই লেখা আরম্ভ করে শেষ করতে পারেননি। ইংরেজীতে ‘ফরাসী মাঠের শস্যগুচ্ছ’ এবং ফরাসীতে ‘কুমারী দার্ভেরের পত্রিকা’ ইংরেজী এবং ফরাসী সাহিত্যের অঙ্গ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। দেশে ফিরে সংস্কৃত পড়া আরম্ভ করেন, বোধ হয় ইচ্ছা ছিল এবার স্বদেশী ভাষায় বই লিখবেন। মহাভারত রামায়ণ পুরাণ প্রভৃতি যত্নের সঙ্গে পড়ছিলেন, দুরন্ত কাল অমন জীবন-রত্নটাকে নির্ম্মম হস্তে অকালে হরণ করে নিলে! এঁর ভগ্নী অরু দত্তের নামও ইংরাজী-সাহিত্যে সুপরিচিত।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বাংলা হিসাবে নূতন শতাব্দী (১৩০১) আরম্ভ হ’ল, এ বৎসরে প্রসন্নময়ী দেবীর ‘নীহারিকা’ ২য় ভাগ একখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক বলা যায়।

এ ছাড়া ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সরোজিনী দেবীর ‘সুধাময়ী’ মানকুমারী বসুর প্রবন্ধের বই ‘শুভসাধনা’ ছাপা হয়।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সরোজকুমারী গুপ্তার ‘হাসি ও অশ্রু’ এবং রাণী মৃণালিনীর ‘নির্ঝরিণী,’ কবিতার বই, “দুঃখমালা” রচয়িত্রীর লেখা ‘বিরাটনন্দিনী’ নাটক, স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘কবিতা ও গান’। এই সময় সরলাদেবী ও হিরন্ময়ী দেবী ভারতীর সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। হিরন্ময়ী দেবী ভারতীকে বহু কবিতা উপহার প্রদান করেছেন, ছাপাবই সম্ভবতঃ হয়নি।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মানকুমারী বসুর ‘কনকাঞ্জলি’, কুন্দকুমারী গুপ্তার ধর্মতত্ত্বের বই ‘প্রেমবিন্দু’।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তার ‘প্রীতি ও পূজা’ গিরীন্দ্রমোহিনীর ‘শিখা’। প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর সম্পাদনায় ‘পুণ্য’ মাসিক পত্রিকা এই বৎসর বাহির হয়। বনলতাদেবী সম্পাদিত ‘অন্তঃপুর’ পত্রিকাও এই বৎসরে প্রকাশিত হয়।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে নগেন্দ্রবালা মুস্তফীর ‘প্রেমগাথা', তরঙ্গিণী দাসীর ‘বনফুল হার,’ স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘কাহাকে’। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণভামিনী দাসীর ‘ভক্তি সঙ্গীত’ প্রকাশিত হয়।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে কুসুমকুমারী রায়ের ‘প্রসূনাঞ্জলি’ এবং রাণী মৃণালিনীর ‘মনোবীণা’ উল্লেখযোগ্য বই।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে সুরমাসুন্দরী ঘোষের ‘সঙ্গিনী,’ সরলা দেবীর ‘শতগান’ বসন্তকুমারী দেবীর ‘মজুরী,’ নগেন্দ্রবালা মুস্তফীর ‘অমিয় গাথা’, সরোজকুমারী দেবীর ‘অশোকা’ কাব্য, জগৎ মোহিনী চৌধুরীর ভ্রমণ ‘ইংলণ্ডে সাতমাস’ এবং হেমাঙ্গিনী কুলভীর ‘সূতিকা চিকিৎসা’।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবীর শিশুপাঠ্য বই ‘বাল্যবিনোদ’ ও ‘সচিত্র বর্ণবোধ’, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর ‘অর্ঘ্য’, নগেন্দ্রবালা মুস্তফীর ‘ব্রজগাথা’, ইন্দ্রপ্রভা দেবীর ‘বৈভ্রাজিকা’ এবং ‘শেফালিকা’ কাব্য।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সুরমাসুন্দরী ঘোষের “রঙ্গিণী”, মানকুমারী বসুর ‘বীরকুমার বধ’(?) সুমতি দেবীর ‘উদ্যান-প্রসূন’, চারুশীলা দেবীর ‘ভাষাশিক্ষা’, শৈলবালা দেবীর ‘পাঠশালার পাঠলেখা’।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তার ‘খোকা’, কুসুমকুমারী রায়ের ‘মর্ম্মোচ্ছ্বাস’, নিস্তারিণী দেবীর ‘মনোজবা’, লজ্জাবতী বসুর ‘টেম্পেষ্টের’ অনুবাদ ও “হোমারের ইলিয়াড”ও এরই কাছাকাছি সময়ের লেখা ও ছাপা। মৃণালিনী সেন মেরী করেলীর “থেলমার” অনুবাদ করেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবীর স্কুলপাঠ্য বই ‘কীর্তি-কলাপ’, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কবিতার বই ‘স্বদেশিনী,’ শরৎকুমারী চৌধুরাণীর ‘শুভবিবাহ’, অম্বুজাসুন্দরীর ‘প্রভাবতী’ উপন্যাস উল্লেখযোগ্য বই। এই বৎসর সরযূবালা দত্তের সম্পাদনায় ‘ভারত মহিলা’ পত্রিকা বার হয়।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর ‘সিন্ধুগাথা,’ অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তার ‘দুটিকথা’, ‘ভাব ও ভক্তি,’ এবং অনঙ্গ মোহিনী দেবীর “শোকগাথা”, প্রসন্নময়ী দাসীর ‘বিভূতি-প্রভা’।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে নিস্তারিণী দেবীর ‘রেণুকণা’ কবিতার বই, অম্বুজাসুন্দরীর ‘গল্প’।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ইচ্ছাময়ী দেবীর ‘ইচ্ছা-সঙ্গীত’ নামক ভগবদ্বিষয়ক গীতিসংগ্রহ, কনকলতা চৌধুরীর ‘উদ্দীপনা’ নামক রাজনৈতিক প্রবন্ধের বই এবং মৃণালিনী দেবীর

'পলাসী লীলা' নামক ইতিহাস।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বাল্যবিনোদ' নামক স্কুলপাঠ্য বই, নলিনীবালা ভঞ্জ চৌধুরাণীর 'রুষ জাপান যুদ্ধের ইতিহাস'।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে অনঙ্গমোহিনী দেবীর 'প্রীতি', সরোজকুমারী গুপ্তার 'শতদল', বিমলা দাসগুপ্তার মালবিকাগ্নিমিত্রের অনুবাদ, এবং ফুলকুমারী গুপ্তার "সৃষ্টিরহস্য" নামক দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ উচ্চাঙ্গের বইখানি উল্লেখযোগ্য।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে সরলা দেবীর 'বাঙ্গালীর পিতৃধন' (রাজনৈতিক প্রবন্ধের বই), অমলাদেবীর 'ভিখারিণী' নাটক, এই বৎসর কৃষ্ণভামিনী বিশ্বাসের সম্পাদনে 'মাহিষ্য মহিলা' পত্রিকা প্রকাশিত হ'তে আরম্ভ হয়, (১৩২২) ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পত্রিকাখানি চলেছিল।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে শ্রীনাথঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবীর 'আমার খাতা' এবং 'প্রবন্ধকুসুম,' প্রফুল্লনলিনী ঘোষের উপন্যাস 'মন্দারকুসুম,' বিনোদিনী দেবীর 'খুকুরাণীর ডায়েরী', লাবণ্যপ্রভা সরকারের "শ্রদ্ধার স্মরণ", হেমলতা দেবীর 'মিবার-গৌরব কথা' অনুরূপাদেবীর 'পোষ্যপুত্র' উপন্যাস ও ইন্দিরা দেবীর 'নির্ম্মাল্য' গল্পসংগ্রহের বই।

১৯১৩ খৃষ্টব্দে সরযূবালা দাসগুপ্তার 'বসন্তপ্রয়াণ' নামক প্রবন্ধ ও নক্সার বইখানি রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা নিয়ে বার হয়। ঐ বৎসর প্রকাশিত অন্যান্য বইয়ের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কৌতুক নাট্য' এবং নিরুপমা দেবীর উপন্যাস 'অন্নপূর্ণার' মন্দির প্রকাশিত হয়। এই বৎসরই তিলোত্তমা দাসীর কবিতার বই 'আক্ষেপ,' কুমুদিনী বসুর জীবনী গ্রন্থ 'মেরী কার্পেণ্টার', রত্নমালা দেবীর 'শ্রীশ্রীভগবৎলীলামৃত', শৈলজা দেবীর 'কণা' এবং কামিনী রায়ের 'শ্রাদ্ধিকী', সরলা দেবীর নাটক 'পরিণাম'।

ইতি মধ্যে প্রকাশিত যে সব বইয়ের সাল তারিখ দিতে পারা গেল না, তার মধ্যে হেমলতা দেবীর 'নেপালে বঙ্গনারী,' রাবেয়া হোসেনের 'মতিচূর', স্বর্ণকুমারী দেবীর 'প্রথম পাঠ্য ব্যাকরণ,' সরোজিনী দেবীর 'শিশুরঞ্জন নবধারাপাত,' মৃণালিণী দেবীর 'আদর্শ হস্তলিপি,' সুখলতা রাওয়ের 'গল্পের বই,' বীণাপাণি দেবীর 'ঠাকুরদাদার দপ্তর' প্রভৃতি স্কুলপাঠ্য ও শিশুপাঠ্য বই ছাড়া নগেন্দ্রবালা মুস্তফীর 'গার্হস্থ্যধর্ম,' সরোজকুমারী দেবীর 'বঙ্গবিধবা' এবং লাবণ্যপ্রভা বসুর 'গৃহের কথা' প্রভৃতি আরও অনেকগুলিই— উল্লেখযোগ্য বই। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন 'শিশুসাহিত্যে' সুখলতারাও এর পর অন্যান্য বই লেখেন এবং তাঁর চেয়ে প্রতিভাশালিনী লেখিকা আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। 'ধূপ' রচয়িত্রী এবং 'পরিচারিকা' সম্পাদিকা নিরুপমা দেবীকে এই সময়ে প্রথম দেখা যায়। ইতিমধ্যে প্রকাশিত অন্যান্য যে সব পুস্তক প্রকাশের সময় উল্লেখ করা গেল না, তার মধ্যে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর 'আমিষ ও নিরামিষ আহার', কামিনী রায়ের 'একলব্য' নাটক, বসন্তকুমারী বসুর 'উপাসনার গুরুত্ব', লাবণ্যপ্রভা বসুর 'পৌরাণিক কাহিনী',

কামিনীসুন্দরী দেবীর 'গুরুপূজা', নবীনকালী দেবীর 'ভগবদ্‌গীতা' প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ, লজ্জাবতী বসুর হোমরের 'ইলিয়ার্ড', স্বর্ণলতা চৌধুরীর স্কটের 'মার্ম্মিয়ন', মৃণালিণী সেনের মেরী করেলির 'থেলমা'র অনুবাদ, প্রসন্নতারা গুপ্তার "পারিবারিক জীবন"। বিনোদিনী সেন গুপ্তার 'রমণীর কার্যক্ষেত্র', নগেন্দ্রবালা সরস্বতীর 'নারী ধর্ম', 'সতী', নিস্তারিণী দেবীর 'হিরন্ময়ী' সরোজকুমারী দেবীর 'কাহিনী'।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত নারী রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে অনুরূপা দেবীর 'বাগদত্তা', ইন্দিরা দেবীর 'কেতকী', চারুহাসিনী দেবীর কবিতার বই 'অঞ্জলী' এবং কাঞ্চনমালা দেবীর গল্পের বই 'গুচ্ছ' ঐ বৎসরের উল্লেখযোগ্য রচনা। মনোরমা দেবীর "হেমলতা" উপন্যাসখানি সম্ভবতঃ এই বৎসরেই ছাপা হয়েছিল। ইনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ্ সার্ প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ, জাষ্টিস্ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী এবং লাহোর চিফকোর্টের জজ্ সার্ প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ছিলেন। অকালমৃত্যু এঁর প্রতিভা পূর্ণ বিকাশের অবসর দেয়নি।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সুনীতি দেবীর কবিতাবলী 'সাহানা', হেমন্ত বালা দত্তের কাব্যগ্রন্থ 'মাধবী', হরিপ্রভা তাকেদার জীবনীগ্রন্থ "ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র", অনুরূপা দেবীর 'জ্যোতিঃহারা ও 'মন্ত্রশক্তি' উপন্যাস ও "চিত্র দীপ" "উল্কা" "রাঙা শাঁখা", গল্প সংগ্রহ, ইন্দিরা দেবীর "সৌধ রহস্য", নিরুপমা দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস 'দিদি' ছাপা হয়।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে কামিনী রায়ের নাটক 'সিতিমা' বাহির হয়। সরযূবালা দাশগুপ্তার 'ত্রিবেণী সঙ্গম' বইখানিও এই বৎসরের দান। এই বৎসরে রাণী নিরুপমা দেবী নব পর্যায় 'পরিচারিকা' পত্রিকার সম্পাদনের ভার নে'ন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণপ্রভা সোমের 'সতী সঙ্গিনী' নামক কাহিনী, ইন্দিরা দেবীর 'মাতৃহীন' নামক ছোট গল্পের বই এবং অনুরূপা দেবীর 'মহানিশা' উপন্যাস ও 'মধুমল্লী' গল্পগ্রন্থ, নিরুপমা দেবীর 'আলেয়া' ও 'অষ্টক', হেমনলিনী দেবীর 'তরুতীর্থ', শৈলবালা ঘোষজায়ার 'সেখ আন্দু' পুস্তকাকারে ছাপা হয়েছিল।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে অনুরূপা দেবীর 'রামগড়' নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস, সরলা দেবীর গল্প 'নব বর্ষের স্বপ্ন', শান্তা দেবীর বড় গল্পের বই 'ঊষষী' এবং উপন্যাস "স্মৃতির সৌরভ", মণি মৃণালিনী দেবীর 'সুপ্রভা', ইন্দিরা দেবীর সর্বসমাদৃত উপন্যাস 'স্পর্শমণি' এই বৎসরে পুস্তকাকার ধারণ করে। কাঞ্চনমালা দেবীর 'রসির ডায়েরী', শৈলবালা ঘোষজায়ার 'নমিতা', 'সহধর্ম্মিনী', 'রত্নমন্দির', 'দর্প চূর্ণ' এই বৎসর বাহির হয়।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শৈলবালা ঘোষজায়ার 'আড়াই চাল', সরোজিনী দত্তের 'মাধুরী', রাণী নিরুপমার 'ধূপ', চারুবালা সরস্বতীর গল্পের বই 'সতুর মা' ও 'নূতন উপনিবেশ', হেমনলিনী[৮] দেবীর 'লাইকা', সুলেখিকা নিরুপমা দেবীর 'বিধিলিপি', কাঞ্চনমালা দেবীর 'শনির দশা' এরই কাছাকাছি ছাপা হয়েছিল।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে হেমলতা সরকারের পণ্ডিত ‘শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনী’, অনুরূপা দেবীর উপন্যাস ‘মা’ ও ‘বিদ্যারণ্য’ নাটক, হেমলতা দেবীর ‘দুনিয়ার দেনা’, প্রিয়ম্বদা দেবীর শিশুপাঠ্য উপন্যাস ‘পঞ্চুলাল’, নিরুপমা দেবীর ‘উচ্ছৃংখল’, মিসেস এ, রহমানের ‘মুক্তির মূল্য’, সরসীবালা বসুর ‘প্রতিষ্ঠা’, ঊর্ম্মিলা দেবীর ‘পুষ্পহার’। নিরুপমা দেবীর ‘শ্যামলী’ ও ‘বন্ধু’ ইহারই কাছাকাছি সময়ে ছাপা হয়েছে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে সুনীতি দেবীর ‘শিবনাথ জীবনী’ মনোমোহিনী দেবীর ‘সুষমা’ ও ‘হেলেনা’ উপন্যাস, তুলসীমণি দেবীর ‘রাইডার হ্যাগার্ড’ লিখিত ‘আয়েসার ভাবানুবাদ’ ‘আয়েসা’, শান্তা দেবীর লিখিত ‘শোক ও সান্ত্বনা’, সরসীবালা বসুর গল্পের বই ‘মিলন’, ইন্দিরা দেবীর ‘পরাজিতা’, ‘স্রোতের গতি’ ও ‘ফুলের তোড়া’, শৈলবালা ঘোষজায়ার ‘মোহের প্রায়শ্চিত্ত’, কামিনী রায়ের ‘অশোক সঙ্গীত’।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে অনুরূপা দেবীর উপন্যাস ‘পথহারা’ ‘চক্র’ ও ‘সোনার খনি’ এবং সুবর্ণপ্রভা সোমের ‘পঞ্চ সতী’, সরযুবালা ভারতীর স্কুলপাঠ্য ‘শিক্ষা সোপান’। ইন্দিরা দেবীর ‘প্রত্যাবর্ত্তন’ উপন্যাসটি তাঁর মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় লেখা ও তাঁর মাসতুত ভাই বিখ্যাত লেখক সৌরীন্দ্রমোহনের প্রযত্নে তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই ছাপা শেষ হয়। শৈলবালা ঘোষ জায়ার ইমানদার’ ও ‘অকাল কুষ্মণ্ডের কীর্তি’।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মানকুমারী বসুর কাব্য ‘বিভূতি’, অনুরূপা দেবীর উপন্যাস ‘হারাণো খাতা’, কুমারিল ভট্ট নাটক’, লীলা দেবীর উপন্যাস ‘ধ্রুবা’, উমাশশী কুমারের ‘সাকী’, প্রফুল্লময়ী দেবীর কবিতা সংগ্রহ ‘পুষ্প পরাগ’, শ্রীমতী কামিনী রায়ের ‘ঠাকুমার চিঠি’, রজ্জব উন্নিসার ‘সাহসিকা’ উপন্যাস, নিরুপমা দেবীর ‘আলেয়া’, আন্দাজ এই সময়ে ছাপা হয়। সরসীবালা বসুর ‘আহুতি’, মহারাণী সুনীতি দেবীর ‘ইণ্ডিয়ান ফেয়ারি টেলস্’ ইংরাজীতে লেখা।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শৈলবালা সেনের কবিতা পুস্তক ‘রেণুকণা’, সরসীবালা বসুর ‘গ্রহের ফের’, ‘আয়ুষ্মতী’, বিজনবালা করের উপন্যাস ‘নিগৃহীতা’, নিরুপমা দেবীর ‘পরের ছেলে’, কিরণবালা রায়ের ‘জল খাবার’, সুরুচিবালা রায়ের উপন্যাস ‘ঝরাপাতা’, প্রফুল্লময়ী দেবীর গল্প ‘প্রতিমা’, সুবালা দেবীর কবিতার বই ‘ভাব পুষ্প’, ইন্দিরা দেবীর কয়েকটি পরিত্যক্ত ছোট গল্প নিয়ে গ্রথিত ‘শেষ দান’ নামে গল্পের বইটি ছাপা হয়ে বাহির হয়। প্রভাবতী সরস্বতীর ‘বিজিতা’, লীলা দেবীর ‘কিসলয়’ ছাপা হয়ে বাহির হয়।

এই যুগে ফয়জুন্নেসা খাতুন, মাহমেনা খাতুন, মেহেরুন্নিসা খাতুন, আমিনুন্নিসা বিবি প্রভৃতি মুসলিম নারী বহু স্কুলপাঠ্য বই রচনা করেন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর ‘নারীর উক্তি’, প্রসন্নময়ী দেবীর ‘পূর্ব্বকথা’, কামিনী রায়ের বালিকা শিক্ষার আদর্শ’, কমলাবালা বিশ্বাসের ‘সচিত্র সেলাই শিক্ষা’। এই যুগের অন্যান্য যে সব বইয়ের উল্লেখ করা গেল না তার মধ্যে সরোজিনী দত্তের ‘মাধুরী’, বসন্তকুমারী বসুর ‘জ্ঞান ভক্তি ও কার্যের সামঞ্জস্য’, যামিনীময়ী দেবীর ‘সোহং সনাতন জীবন’, লীলাবতী ভৌমিকের

'ভারত ইতিহাস', বিভাবতী সেনের 'সংক্ষিপ্ত ভারত ইতিহাস', সরযুবালা দত্তের 'ভারত পরিচয়', জীবনী গ্রন্থের মধ্যে সরলাবালা দাসীর 'নিবেদিতা', সুবর্ণপ্রভা সোমের 'বিবেকানন্দ মাহাত্ম্য', মালতী দেবীর 'দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন', মহারাণী সুনীতি দেবীর 'শিশু কেশব', হরসুন্দরী দেবীর 'শ্রীনাথ দত্ত', মুসম্মৎ সারা তৈফুর প্রণীত 'স্বর্গের জোতিঃ', নলিনীবালা দেবীর 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন', অনিমারাণী দেবীর 'মহাত্মা গান্ধীর জীবনী', বিমল দাশগুপ্তার 'ত্রয়ী'। ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে বিমল দাশগুপ্তার 'নরওয়ে ভ্রমণ', হরিপ্রভা তাকেদার 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা', বিবিধের মধ্যে কিরণলেখা রায়ের 'বরেন্দ্র রন্ধন', নির্মলা দেবীর 'রন্ধন শিক্ষা', মোহিনী সেনগুপ্তার 'সুর মুর্চ্ছনা', প্রিয়ম্বদা দেবীর 'কথা উপকথা', ভক্তিলতা ঘোষের 'ছেলেদের বঙ্কিম', সুবর্ণপ্রভা ঘোষের 'খোকার পড়া', সীতা দেবীর 'আজব দেশ', শান্তা দেবীর "হুক্কা হুয়া", কানন দেবীর 'বামনের হাতে চাঁদ'। অনুবাদ সাহিত্যে নির্মলা সোমের 'সরলা', (জেন আয়ার) শান্তা দেবীর 'স্মৃতির সৌরভ' সরসীবালা বসুর 'আয়ুষ্মতী'। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কুমুদিনী বসুর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ কাব্য 'পূজার ফুল' এবং শিশুপাঠ্য 'শিখের বলিদান'। অনুরূপা দেবীর উপন্যাস 'গরীবের মেয়ে', লীলা দেবীর উপন্যাস 'রূপহীনার রূপ', মনোরমা দেবীর 'বরপণ' নিবারণের পক্ষ সমর্থক বই 'নারীর প্রতি' এবং সুরমা সুন্দরী ঘোষের স্কুলপাঠ্য সুনীতি শিক্ষা সুধা'। অনুরূপা দেবীর 'শিশুমঙ্গল', প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'দানের মর্যাদা', 'বিসর্জ্জন', বিভাবতী দেবীর 'মায়ের ছেলে', গিরিবালা দেবীর 'রূপহীনা', পূর্ণশশী দেবীর 'সুখের বাসর', শৈলবালা ঘোষজায়ার 'অবাক্'। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে নির্মলা রায়ের 'সাঁওতালী উপকথা', মনোরমা দেবীর গানের বই 'মঞ্জরী', সুনীতি বালা চন্দের প্রবন্ধ পুস্তক 'চরিত্র চিত্র', বাণী ঘোষের স্কুলপাঠ্য 'সংস্কৃত কিশলয়,' রাজবালা বসুর 'অধ্যাত্ম রামায়ণ,' বসন্তকুমারী দাসীর ধর্ম্মমূলক উপন্যাস 'সতী ধর্ম্ম,' অনুরূপা দেবীর 'হিমাদ্রি,' রত্নমালা দেবীর 'হিমালয় ভ্রমণ,' ইহার বহু কবিতা ও প্রবন্ধ পুস্তক পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে 'সীতা চিত্র' আদর্শগৃহিনী,' 'প্রবন্ধ মুকুল,' ও অন্যান্য পুস্তক। সুবর্ণপ্রভা সোমের 'দুটি প্রাণ,' পূর্ণশশী দেবীর 'স্নেহময়ী', প্রভাবতী সরস্বতীর 'নূতন যুগ', 'বঙ্গপল্লী' পূর্ণশশী দাসীর 'মধুমিলন', স্বর্ণকুমারী দেবীর 'মিলন রাত্রি', হেমমালা বসুর 'রাবেয়া', সুধা দেবীর 'ভুলের কারসাজি'।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে—রমণী দেবীর 'দেবী মাহাত্ম' ও 'সংশয় ভঞ্জন', প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতার বই অংশু, 'বঙ্গমাতা,' উমা দেবীর 'বাঙ্গালী জীবন' নামক প্রবন্ধের বই, সুরবালা দেবীর 'মর্ম্মবীণা,' সেফুরাণী দাসীর উপন্যাস 'পরিণাম', অক্ষয়কুমারী দেবীর 'বৈদিক যুগ', অনুরূপা দেবীর 'জোয়ার ভাঁটা,' 'প্রাণের পরুশ', নিরুপমা দেবীর 'দেবত্র,' বিজনবালা দেবীর 'নিগৃহিতা', সুলেখা দেবীর 'প্রজাপতির খেলা', নির্মলা দেবীর 'পূজারিণী', কমলা দেবীর 'সন্তান পালন', প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর 'জারক', প্রভাবতী সরস্বতীর 'প্রেমময়ী,' শৈলবালা ঘোষজায়ার 'অভিশপ্ত সাধনা', সরসীবালা বসুর 'প্রবাল'। শ্রীমতী হেমলতা দেবী এই বৎসর থেকে 'বঙ্গলক্ষ্মী' কাগজখানির সম্পাদনের ভার নেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে—প্রভাবতী সরস্বতীর ‘পথের শেষে’ ও ‘তরুণের অভিযান’, উপন্যাস দু’খানি ছাপা হয়ে বাহির হয়। অনুরূপা দেবীর ঐতিহাসিক উপন্যাস ‘ত্রিবেণী’ প্রকাশিত হয়। শরৎকামিনী বসুর ‘সদগুরু কথামৃত’, রাণী নিরুপমার ‘গোধূলী’। তমাল লতা বসুর ‘অমিয়’, তুষার মালার ‘সীবন ও কাটিং শিক্ষা’, তরুবালার ‘কলিকাতায় তিনটি বিবাহ’।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে—শৈলবালা সেনের ‘অনুকণা’, কনকলতা ঘোষের ‘রেখা’ কাব্য, অনুরূপা দেবীর উপন্যাস ‘উত্তরায়ণ,’ গীতা দেবীর নাটক ‘বিপর্য্যয়’, রাধারাণী দেবীর ‘প্রেমের পূজা,’ রমা দেবীর ‘নির্ম্মাল্য’, হেমলতা দেবীর ‘মেয়েদের কথা,’ কামিনী রায়ের ‘দীপ ও ধূপ,’ নীহারবালা দেবীর ‘আদর্শ রন্ধন শিক্ষা’, উমা দেবীর ‘সনাতন পাকপ্রণালী’, কনকতারা ঘোষের ‘রেখা কাব্য’, শৈলবালা ঘোষের ‘শান্তি', প্রভাবতী সরস্বতীর ‘খেয়ার শেষে’।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে—ইন্দুরেখা দেবীর ‘ধ্রুবচরিত’, গিরিবালা দেবীর উপন্যাস ‘হিন্দুর মেয়ে’, ইন্দ্রাণী দেবীর উপন্যাস ‘শুভদৃষ্টি’, চারুলতা দেবীর কাব্য ‘ব্যথিতার গান,’ বিমলা দেবীর ‘চিত্রলেখা’, কামিনী রায়ের ‘জীবন পথে’, শান্তিসুধা ঘোষের ‘শকুন্তলা’, ইন্দুসুধা ঘোষের ‘সীবনী,’ ৺সুরবালা ঘোষের ‘মধুরা’ (কবিতা সংগ্রহ) বিননাদিনী মিত্রের ‘শ্রীদুর্গাচরণ নাগ’, রাধারাণী দেবীর কবিতা পুস্তক ‘লীলা কমল’, বনলতা দেবীর ‘ব্রাহ্মণ পরিবার’, মৈত্রেয়ী দেবীর ‘উদিতা’ কাব্য, প্রভা দেবীর গীতায়ণ’, বিমল দেবীর ‘চিত্রলেখা’, লক্ষ্মীমণি দেবীর ‘অভিশপ্ত’, প্রভাবতী সরস্বতীর ‘ব্রতচারিনী।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে—মৃণালিনী গুপ্তার গল্পের বই ‘নায়িকা’, স্নেহলতা রায় চৌধুরীর শিশুপাঠ্য বই ‘পদ্মচাকী,’ স্বর্ণকুমারী দেবীর স্কুলপাঠ্য বই ‘সাহিত্য স্রোত’, প্রফুল্লময়ী দেবীর ধর্মবিষয়ক ‘অমৃত প্রসঙ্গ’, চামেলিবালা মজুমদারের উপন্যাস ‘শুকতারা’, বিমলা দেবীর ‘ক্রমশঃ’, প্রীতিকণা দত্তর ‘কৃষ্ণকুমারী’, ‘মীরাবাই’, ‘তারাবাই’, ‘পদ্মিনী’, হিরন্ময়ী সেনের ‘জলছবি’, ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা।

নিস্তারিণী দেবীর কাব্য ‘আকাশ-বাণী’, ভক্তিসুধা দেবীর কাব্য ‘রজনীগন্ধা’, উমা দেবীর উপন্যাস ‘কাজলী’ উল্লেখযোগ্য।

নীলিমা সেনের ‘মায়ামুক্তি’, প্রভাবতী সরস্বতীর ‘দুনিয়ার দান’ ও ‘প্রতিজ্ঞা’।

প্রিয়ম্বদা দেবীর ‘চম্পা ও পাটল’ কাব্য তাঁর মৃত্যুর পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাসহ এই বৎসর ছাপা হয়।

শৈলবালা ঘোষজায়ার ‘বিপত্তি’, অণিমা দেবীর ‘অবাক কাণ্ড’, কনকলতা ঘোষের ‘অনুরাগ’, স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘প্রেমগীতি স্বরলিপি’, মাহমুদাখাতুন সিদ্দিকার ‘পশারিণী’।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের—উল্লেখযোগ্য বই রজ্জব উন্নিসার উপন্যাস ‘সাহসিকা’, অনুরূপা দেবীর উপন্যাস ‘পথের সাথী’, হেমলতা রায়ের ‘কুম্ভমেলা ও সাধুসঙ্গ’, নীলিমা দেবীর ‘আগমনী’, নীহারবালা দেবীর ‘দেশের ডাক’, স্বর্ণকুমারী দেবীর স্কুলপাঠ্য ‘বালবোধ ব্যাকরণ’, বসন্তকুমারী দেবীর ‘লক্ষ্মীর পাঁচালী’, বিমলা দেবীর ‘মীমাংসা’, প্রীতিকণা দত্তর ‘গার্গী’, রাধারাণী দেবীর ‘সিঁথি মৌর’, প্রভাবতী সরস্বতীর ‘সোণার বাংলা’, ‘জাগৃহী’, ‘প্রতীক্ষায়’, ‘জীবন সঙ্গিনী’।

এই যুগে লীলা দেবীর ‘ঝরার ঝরণা’, হেমলতা দেবীর ‘শ্রীনিবাসের ভিটা’, প্রফুল্লময়ী দেবীর ‘ধাত্রীপান্না’, অনুরূপা দেবীর ‘ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মজ্ঞান’, ডাক্তার যামিনী সেনের ‘প্রসূতিতত্ত্ব’, ডাক্তার হিরন্ময়ী সেনের ‘সরল হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা’, সুখলতা রাওয়ের ‘স্বাস্থ্য’, প্রবোধশশী দেবীর ‘সহজবুনন শিক্ষা’, উমা দেবীর ‘সনাতন পাক প্রণালী’, ননী রায়ের ‘অভিনব ভূগোল’।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, কাঞ্চন মালা, ইন্দিরা দেবীর অল্প পরবর্ত্তী কালে প্রভাবতী দেবী, আমোদিনী ঘোষ, আশালতা সিংহ, আশালতা দেবী প্রভৃতি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন।

ছোট গল্পের ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে সীতা দেবী শান্তা দেবীর শক্তি নিতান্ত সামান্য নয়, দুই ভগ্নীর সাহিত্যিক দান ও প্রচুরতর।

“অন্তঃপুর” ‘পরিচারিকা’, ‘ভারত মহিলা’, ‘সাহিত্য মহিলা, প্রভৃতি অনেকগুলি মাসিক পত্রিকা উঠে গেলেও লীলা নাগ এবং তাঁর পর শকুন্তলা দেবী প্রভৃতি সম্পাদিত “জয়শ্রী” এবং হেমলতা দেবী সম্পাদিত ‘বঙ্গলক্ষ্মী’ এ সময়ে বেশ খ্যাতি লাভ করেছিল।

ইতিমধ্যে প্রকাশিত যে সব বইয়ের সময় দেওয়া গেল না, মধ্যে হেমাঙ্গিনী দস্তিদারের ‘গৃহিণীর হিতোপদেশ’, ভক্তিলতা ঘোষর ছেলেদের উপযোগী ক’রে লেখা ‘দেবীচৌধুরাণী’, ‘দুর্গেশনন্দিনী’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রতিভাশালিনী কবি ‘বাতায়ন’ লেখিকা উমাদেবীর অকালমৃত্যুতে (১৯৩২) বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর পরবর্তী যুগে কবিতার ক্ষেত্রে রাধারাণী দেবীকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা যেতে পারে। নিরুপমা দেবীর এবং মৈত্রেয়ী দেবীর নাম ও কবি হিসেবে এ সময়ে উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে লাবণ্যপ্রভা সরকারের ‘কবি কাব্যের কথা’, দেশী বিদেশী কবি ও লেখকের সম্বন্ধে সমালোচনা। লতিকা মুখোপাধ্যায়ের—“গানের বই”, বিমলাগুহর “পুনর্ম্মিলন”, সুধাংশু হালদার ও ইলাদেবীর লিখিত গল্পের বই “সপ্তক”, অনামা মহিলা লিখিত উপন্যাস “মহিলা-মঙ্গলিকা”, শকুন্তলা দেবীর ভ্রমণকাহিনী ‘স্বদেশ ও বিদেশ’, সুরুচিবালা চৌধুরাণীর “কাজের নেশা”, কনকলতা ঘোষের “পত্রলেখা”, সরলা দেবীর ধর্মবিষয়ক ‘ব্রহ্মার্পণম্’, অনুরূপা দেবীর “নাট্যচতুষ্টয়”।

প্রাচীন লেখিকা শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবীর উপন্যাস “জীবন সমস্যা”, পূর্ণশশী দেবীর “মেয়ের বাপ”, অপরাজিতা দেবীর “আঙ্গিনার ফুল”,—শ্রীমতী অপরাজিতা দেবীর “বুকের বীণা” বইএর ছাপার তারিখ জানা না থাকলেও গ্রন্থটী একটী সম্পূর্ণ নূতন ভাবের নারী লিখিত কবিতার বই, সেই হিসাবে এই পুস্তকের উল্লেখ করার প্রয়োজন। রচনায় পুরুষোচিত ভাব ও ভাষা ব্যবহৃত হওয়াতে অচেনা লেখিকাকে কেহ কেহ নাকি লেখক বলেও সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন, কিন্তু আমরা তাঁকে কোন পূর্বপরিচিতা লেখিকা বলেই স্থির করেছি। শৈলবালা ঘোষজায়ার “স্নিগ্ধ ও শুচি”।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে উমাদেবীর শিশুপাঠ্য ‘বালিকাজীবন’, সফুরা বেগম বা মিসেস্ রহমানের উপন্যাস ‘মুক্তির মূল্য’, মহামায়া দেবীর ‘শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা মাহাত্ম্য’, অনুরূপা দেবীর উপন্যাস “বিবর্ত্তন”, প্রভাবতী দেবীর উপন্যাস ‘মুক্তিস্নান’, এবং মায়ের আশীর্বাদ’, শৈলবালা ঘোষজায়ার উপন্যাস ‘থিয়েটার দেখা’, গিরিবালা দেবীর উপন্যাস ‘মুকুটমণি’, অম্বুজাসুন্দরী দেবীর ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ ‘শ্রীকৃষ্ণকেলিরসালাপ’, প্রীতিকণা দত্তজার জীবনী ‘কৃষ্ণকুমারী’ এবং ‘পদ্মিনী’, সুধা দেবীর অহল্যাবাই’, ইন্দিরা দেবীর বহু কবিতার মধ্য হ’তে কয়েকটীমাত্র নির্বাচিত করে তাঁর পুত্র সুকবি ও সুলেখক প্রভাতমোহনের সম্পাদনায় কাব্যগ্রন্থ “গীতিগাথা” প্রকাশিত হয়!

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রভাময়ী মিত্রের নাটক ‘দেউল’ বহুপরিশ্রমের ফলে কোনারক মন্দির রচনার ঐতিহাসিক তথ্যসংগ্রহ ক’রে লেখা। জগত্তারিণী দেবীর ‘কবিতা মালা’, গীতা দেবীর “বিপর্যয় নাটক এবং ‘জনা’ প্রবন্ধ, চামেলিবাল মজুমদারে ‘ত্যাগের প্রতিদান’ উপন্যাস, প্রভাবতী দেবীর ‘পথ ও পান্থ’, আভাবতী মিত্রের শিশুপাঠ্য গ্রন্থ ‘এস্কিমো’, রাজলক্ষ্মী দেব্যার ‘কেদারভ্রমণ কাহিনী’, ও অমলানন্দীর ‘সাতসাগরের পারে’ নামক ভ্রমণ কাহিনী, সরলা দেবীর গীতি নাট্য ‘চিত্রা’, গিরিবালা দেবীর উপন্যাস ‘কুড়ানো মাণিক’, কৃষ্ণভাবিনী দেবীর ‘লক্ষ্মীর পাঁচালি’, শান্তিলতা দেবীর ‘কুমারী ব্রতের ছড়া’ প্রভৃতি সংগ্রহ, অণিমা দেবীর শিশুপাঠ্য বই ‘অবাক কাণ্ড’ এবং ‘লক্ষ্মীবাই’, প্রীতিকণা দত্তজায়ার শিশুপাঠ্য জীবনী ‘কর্মদেবী রাজ্যশ্রী’, অনুরূপা দেবীর “সর্ব্বাণী”, মায়া বসুর উপন্যাস “ত্রিধারা”।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রমদাবালা সেনের স্কুলপাঠ্য ‘কিশোরশিক্ষা’, কুমুদিনী বসুর জীবনী ‘কৃষ্ণকুমার মিত্র’, প্রভাবতী দেবীর উপন্যাস ‘ছন্নছাড়া’ ও ‘হারানেস্মৃতি’, জ্যোতিঃপ্রভা দেবীর শিশুপাঠ্য ‘আনন্দের ফোয়ারা’, সুজাতা দেবীর ‘ওমরখৈয়াম’, তমাললতা বসুর উপন্যাস ‘কথার দাম’, আশালতা দেবীর ‘পাওয়ার বেদনা’, প্রীতিকণা দত্তজায়ার শিশুপাঠ্য জীবনী ‘অরুন্ধতী’, ‘দুর্গাবতী’, ‘রাণী ভবানী’, অনুরূপা দেবীর (দেরাদুন, মুসৌরী হইতে কেদার-বদরীভ্রমণের সঙ্গে মোটামুটি উত্তরাখণ্ডের সমস্ত কিম্বদন্তী এবং ইতিহাস সম্বলিত) ভ্রমণকাহিনী ‘উত্তরাখণ্ডের পত্র’ প্রকাশিত হয়। এই সময়ের খুব কাছাকাছি গল্পলেখিকাদের মধ্যের কয়েকজন লেখিকার বলিষ্ঠ পুরুষোচিত ভাষা ও নারী-অসাধারণ সূক্ষ্মদৃষ্টি ও লিপিচাতুর্য প্রশংসনীয়। এর মধ্যে একজন বাণী রায়, অপর

নিঃসন্দিগ্ধ ছদ্মনাম্নী অমলাদেবী, —“মনোরমা” “সরোজিনী” “সুধার প্রেম” প্রভৃতির লেখিকা অথবা লেখক।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে পুষ্পলতা দেবীর “পুষ্পচয়ন” নামক গল্পসংগ্রহ, প্রতিভা সেনের ‘ভারতের শাসনপদ্ধতি’, প্রভাবতী দেবীর উপন্যাস ‘বাংলার বউ', উমা দেবী কাব্যনিধির কাব্য ‘মানস বেণু’, সরলা দেবীর ‘ইন্দ্রজাল’, গিরিবালা দেবীর উপন্যাস ‘দান প্রতিদান’, ইলারাণী মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস “পল্লীর মেয়ে”, গীতা দেবীর ‘মেয়েলি ব্রতকথা’, জ্যোতির্ময়ী দেবীর ‘বারোমেসে লক্ষ্মী দেবীর পাঁচালী', সুকবি রাধারাণী দেবীর “বনবিহগী” সম্ভবতঃ এই সালেই ছাপা হয়েছিল। শ্রীমতী লীলা দেবীর “রক্তকমল মানিকের” ছাপার তারিখ জানা যায় নি, এখানি ছোট্ট একটী নাটিকা। তাঁর “ধ্রুবা” “কিসলয়” এবং রূপহীনার রূপ ইতিপূর্বেই ছাপা হয়। তাঁর লেখায় একটা মিষ্টিক ভাব দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ এবং হেমলতা দেবীর লেখার মধ্যে এই বিশেষ একটা পদ্ধতি তিনি অনুকরণ করেছেন।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী সুরজবালা দেবীর জীবন কাব্য ‘সুরাজগাথা’, রাজলক্ষ্মী দেব্যার “তীর্থচিত্র” নামক ভ্রমণ বৃত্তান্ত। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, এম-এ, (এক্ষণে ইন্দ্রাণী দেবীর) ছোট গল্প ও কবিতা ও শ্রীমতী ইলা হালদারের “যে ঘরে হলো না খেলা” এবং আরো বহু রচনা বিচিত্রা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নিষ্ঠুর কাল তাঁকে অকালে জীবন-কোরক থেকে ছিন্ন ক’রে না নিলে তিনি একজন শক্তিমতী লেখিকা বলে গণ্য হতে পারতেন। তাঁর কয়েকটী মাত্র গল্প “সপ্তকে” সন্নিবেশিত এবং দুইখানি মাত্র পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল, তা’তেই তাঁর উদীয়মান শক্তির প্রাচুর্য চাপা থাকে নি।

অনেক ছোট বড় মাঝারি লেখিকাদের সমস্ত বই প্রকাশের সাল তারিখ সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। তার জন্য দায়ী অনেকটা তাঁদের পাবলিসারেরা। কোন্ সালে কোন্ বই ছাপা হ’ল তার কোন পরিচয়ই ইদানীংকার ছাপা বইয়ে থাকে না। একে ত প্রস্তরলিপি, তাম্রশাসনের স্থান নিয়েছে একান্ত স্বল্পজীবী ছাপার কাগজ, তার উপর দু’ দশ বছরের খবর পর্যন্ত বই দেখে পাওয়া যায় না, কাজেই তাঁদের বইগুলির মধ্যে যে সব বই-এর জন্মতারিখ উল্লিখিত হয় নি, সেগুলি যতদুর সব একত্র করে এক স্থলে উল্লেখ করা হবে। বহু গল্পউপন্যাসের রচয়িত্রী ও সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী, শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, শ্রীমতী আশালতা দেবী ও আশালতা সিংহ এবং শ্রীমতী সীতা ও শ্রীমতী শান্তা দেবীদের সম্বন্ধেই আমি ত্রুটীর কথা নিবেদন করছি, যেহেতু বাংলা সাহিত্যে সংখ্যাধিক পুস্তক এঁরাই লিখেছেন। অতঃপর নূতন সংস্করণে প্রথম ছাপার তারিখটিরও যদি উল্লেখ করবার ব্যবস্থা করা হয়, তা’ হ’লে ভবিষ্যৎ সাহিত্যের ইতিহাস লেখকরা যে তাঁদের কাছে বিশেষ ঋণী হবেন তা’ বলাই বাহুল্য।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ছাপা হয় হেমলতা দেবীর গল্পের বই “দেহলী”। ইহার বহু পুস্তক পূর্বে ও পরে বাহির হয়েছে। হয়ত সবগুলির নাম সময়মত করা হয় নি, ছোট গল্পগুলি “মিষ্টিক” ধরণের এবং বাংলা সাহিত্যে সত্যই অভিনব। কবিতা, গানগুলিও সুললিত।

“মেয়েদের কথা”, “শ্রীনিবাসের ভিটা”, “অকল্পিতা”, “দুনিয়ার দেনা”, “জ্যোতি”, “দু’ পাতা”, “শিশু সাহিত্য”, “জল্পনা”, “সার কথা”, ‘কথিতা’ এইগুলি এঁর লেখা।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের উল্লেখযোগ্য বই,—আভা দেবীর নাটিকা ‘আধুনিকা’, প্রফুল্লময়ী দেবীর উপন্যাস “এষা”, “নির্য্যাতিতা ধরণী”, অমলা দেবীর “সুধার প্রেম” উপন্যাস, গীতা ঘোষের “নিজেরে হারায়ে খুঁজি”, পূর্ণশশী দেবীর ‘পথে বিপথে’, জ্যোতির্ময়ী দেবীর “রাজ যোটক”, সরলা দেবীর ‘শিবরাত্রি পূজা’, আশাপূর্ণা দেবীর “জল ও আগুন”, “ছোট ঠাকুরদার কাশী যাত্রা”, সরলা বসু রায়ের “চিত্তপ্রদীপ”, শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবীর “নীলিমার অশ্রু” সুবৃহৎ উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে অন্নপূর্ণা গোস্বামীর “সঙ্গোপনে” নামক গল্পসংগ্রহ, আশাপূর্ণা দেবীর গল্পের বই ‘রঙীন মলাট’, ‘হাফ্ হলিডে’, প্রভাবতী দেবীর উপন্যাস ‘পথপ্রান্তে’, শ্রীমতী দুর্গাবতী ঘোষের “পশ্চিম যাত্রিকী” (ইউরোপ ভ্রমণ কাহিনী) এর কাছাকাছি সময়েই ছাপা হয়। নিরুপমা দেবীর উপন্যাসদ্বয় “অনুকর্ষ” ও “যুগান্তরের কথা” এই বৎসরে কলেবর পরিগ্রহ করে।

“সাগরপারের কথাগুচ্ছ” নামক সমুদ্রপারের সাহিত্য থেকে সংগৃহীত ছোট গল্পের বইটি শ্রীমতী পুষ্পরাণী ঘোষের দ্বারা লিখিত হ’য়ে প্রকাশিত হয় এই বৎসর বা এর পূর্ব বৎসরে।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে অন্নপূর্ণা দেবীর কাব্য ‘হৃদি উচ্ছাস’, চিন্ময়ী করের গল্পসংগ্রহ ‘দুমুখী’, ‘গৌরী মা’ (নাম না থাকলেও আমরা জানি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্যা ও পরম সাধিকা সারদেশ্বরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী গৌরী দেবীর এই পুণ্যময় জীবনকথার সুরচিত কথা-চিত্রের লেখিকা তাঁর শিষ্যা ও সারদেশ্বরী আশ্রমের অধুনাতন কর্ত্রী মাননীয়া শ্রীমতী দুর্গা দেবী, এম-এ শাস্ত্রী)।

হাসিরাশি দেবী ও প্রভাবতী দেবীর একত্রে লেখা ‘দায়ী’, সুরুচিবালা চৌধুরাণীর ‘ফাঁকির নেশা’, হাসিরাশি দেবীর ‘মানুষের ঘর’, শ্রীমতী প্রভাবতী দেবীর ‘মাটির দেবতা’র জন্মতারিখ জানা যায় নি। শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবীর ‘বিনিময়’ উপন্যাস এরই নিকটবর্তী কালে মাসিক বসুমতী থেকে পুস্তকাকৃতি ধারণ করেছে।

১৯৪২ বা নিকটবর্তী সময়ে প্রকাশিত কুমারী অলোকা রায়ের “ধরা যেথা অম্বরে মেশে”, ১৯৪৩-৪৪ রবীন্দ্রনাথের “ঘরে বাইরে”, “প্রাথমিক শিক্ষা”, “সহজ পড়া” (বর্ণপরিচয় পুস্তক)।

১৯৪২ ‘ঝরা ফুল’ উপন্যাস প্রতিমা মিত্র, “পরিচিতি” মল্লিকা মিত্র।

১৯৪৩-এর প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে প্রশস্তি দেবীর গল্পগ্রন্থ “তমসাবৃতা”, অমলা দেবীর “চাওয়া ও পাওয়া”, গিরিবালা দেবীর “খণ্ড মেঘ”, আমোদিনী ঘোষের “ফস্কাগেরো”।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে স্নেহলতা দেবীর ‘অঞ্জলী’ এবং আভা দেবীয় ‘অর্চ্চনা’ কাব্য, বাসন্তী চক্রবর্তীর কুমুদিনী বসুর ‘জীবন চরিত’, অন্নপূর্ণা গোস্বামীর ‘ভ্রষ্টা”, মায়া দেবী বসুর ‘ত্রিধারা’ উপন্যাস, সুজাতা দেবীর “ওমর খৈয়াম”, মহমুদা সিদ্দিকির ‘পূজারিণী', স্নেহময়ী রায়, বি-এর “বাংলার রাণী ও বেগম”, জীবন-কথা, শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুরের ‘নির্ব্বাণ’ (রবীন্দ্র-কথা), শ্রীমতী রাণী চন্দের ‘ঘয়োয়া’ (রবীন্দ্র-কথা), শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীয় “মংপুতে রবীন্দ্রনাথ”, বীণাপাণি দেবীর “ছেলেদের পিকনিক” ও “মেয়েদের পিকনিক” এই বৎসর বা পূর্ব বৎসর ছাপা হয়েছে।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বই ডক্টর রমা চোধুরীর “বেদান্ত দর্শন”, ইতিমধ্যে “নিম্বার্ক দর্শন” লিখে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

শ্রীমতী বাণী রায়ের ‘জুপিটার’ কবিতা পুস্তক, বাণী গুপ্তা এম-এ, বি-টির ‘ছেলেদের জাহাঙ্গীর’ শ্রীমতী অপরাজিতার ‘শালবন’ ও শ্রীমতী পুষ্পলতার ‘মরুতৃষা’ উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে তাঁদের সাহিত্যিক যশ বৃদ্ধি করেছে।

কিন্তু এই বৎসর ও ইহার পূর্ববর্তী বৎসরে ছাপার কাগজের অভাবে বহু লেখক ও তথা লেখিকার পুস্তক প্রকাশের দারুণ বিঘ্ন উপস্থিত করেছে। এর মধ্যে কয়েকজন লেখিকা আছেন, যাঁদের লেখা ছাপা হ’লে বঙ্গসাহিত্য সত্যই লাভবান্ হ’তে পারত। তাঁদের মধ্যের দু’জনকার নাম উল্লেখ করবো, একজন শ্রীমতী অরুণা সিংহ ও অপরা পুষ্প মুখোপাধ্যায়। দু’জনেই ডবল এম-এ এক্ষণে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসিনী কর্মী। অরুণার একটি ছত্র মনে পড়ছে;

‘উৎসবের রাত্রিশেষে   তোমার আকাশে মেশে,
আমার বিচ্ছেদ পারাবার।”

১৯৭৫ সালে বই ছাপার বিঘ্ন বধিত হ’লেও সুলেখিকা শ্রীমতী বাণী রায়ের ‘পুনরাবৃত্তি’ গল্পের বই, বীণা দেবীর ‘পুরুষের মন’ গল্প, প্রতিভা বসুর “মনোলীনা”, “বিচিত্র হৃদয়’, ‘সুমিত্রার অপমৃত্যু’, রাধারাণী দেবের ‘মিলনেব মন্ত্রনালা”, আশাপূর্ণা দেবীর ‘সাগর শুখায়ে যায়’, প্রফুল্লবালা দেবীর ‘বয়নিকা’, সরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সুরের মায়া’ (ইহার ‘দ্বন্দ্ব’ উপন্যাস পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল) ও

শ্রীমতী প্রভাময়ী মিত্রের কবিতা পুস্তক, 'সায়াহ্নিকা' ছাপা হয়েছে। সামান্য একটু নমুনা দিচ্ছি:

"মৃত্যু, তোমারে বরিয়াছি আমি, ডরি নাই কোন দিন,
ভাবনা আমার অতি লঘুভার উন্মুখ উদাসীন।"

বিশাল ললাটে বিভূতির টিকা আননে গভীর ক্ষান্তি,
প্রসন্ন দিঠি বিতবে প্রসাদ আয়ত নয়নে শান্তি।
অঙ্গদ ভূষা, বাহুতে বনক-দণ্ড ঝলসি উঠে
বিপুল বক্ষে বৈজয়ন্তী উপবীত পড়ে লুটে,
শ্যাম সুন্দর শোভন কান্তি পীত উত্তরী ঘিরে,
শুচি সুন্দর চিত্ত পাবন এস হে কান্ত ধীরে।"

-"লোকান্তরের" লেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের সহধর্মিণীর-যোগ্য পরিচয়!

"ঘর ছেড়ে যারা বাহিরের পথে অসময়ে চলে গেছে,
ভালবেসে তারা নিশিদিন ফিরে কাছে হতে আরও কাছে।

ইহলোকের সঙ্গে "পরলোকের" আর যেন "অজানা রহস্য" নেই! উভয় জগতের অর্ধবাসী পরস্পরের মিলন-সূত্র হাতে নিয়ে যেন একান্ত কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে; তাই লেখিকা পরম আশ্বস্ত চিত্তে বলতে পেরেছেন;—

"যারা কাছে আর যারা দূরে আছে জনে জনে দিনু সঁপি।"

পূর্বেই বলেছি বর্ত্তমানযুগের লেখিকাদের মধ্যে অনেকেরই পুস্তক প্রকাশের তিথি-তারিখ জানা না থাকায় তাঁদের লেখা অনেক পুস্তকের পরিচয় যথাস্থানে হয়ত দেওয়া হয় নি, যাঁদের পুস্তক সংখ্যা বেশী তাঁদের ক'জনের মাত্র লিখিত পুস্তকের (১৯৪৫-৪৬) একটী করে তালিকা দিচ্ছি;—শ্রীমতী শান্তা দেবী ও সীতা দেবীর একত্রে "উদ্যানলতা" উপন্যাস, "নিরেট গুরুর কাহিনী","হুক্ক হুয়া",'সাত রাজার ধন'। এই "উদ্যানলতা" সেদিনে সাহিত্য-কাননে একটা নূতনত্বের সমাবেশ করেছিল। তারপর তাঁরা তাঁদের ধরণে বহু গল্প উপন্যাস বঙ্গ-সাহিত্যকে দান করেছেন এবং বলা বাহুল্য এ দান বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই গ্রহণ করেছে।

শ্রীমতী শান্তাদেবীর "উষসী", "স্মৃতির সৌরভ", "শোক ও সান্ত্বনা", "চিরন্তনা", "সিঁথির সিঁদুর", "বধূবরণ", "অলখনিরঞ্জন", "দুহিতা", "পথের দেখা', "রামানন্দ ও অর্দ্ধ

শতাব্দীর বাংলা", শ্রীমতী সীতা দেবী লিখিত পুস্তকাবলী "বন্যা", মাতৃঋণ", পরভৃতিকা", "তিনটী গল্প", "পূণ্যস্মৃতি", "জন্মসত্ত্ব", "আজবদেশ", "ছায়াবীথি", "বজ্রমণি", "সোনার খাঁচা", "সাত রাজার ধন", "আলোর আড়াল", "রজনীগন্ধা", "ক্ষণিকের অতিথি", শ্রীমতী অপরাজিতা দেবীর "আঙ্গিনার ফুল", "বুকের বীণা", পুরবাসিনী", "বিচিত্ররূপিণী", রচনাপদ্ধতি নবীনত্বে ভরা, তড়িৎ শক্তিসম্পন্ন।

শ্রীমতী অনুরাধার "কপোত-কপোতী" শ্রীমতী অপরাজিতারই অনুসরণ বা অনুরণন।

শ্রীমতী সুবর্ণপ্রভা সোমের "সতীসঙ্গিনী", "পঞ্চ সতী" 'সতীসোহাগ", "শুভমিলন", বঙ্গলক্ষ্মী", "কুলনারী", 'বৌ", 'বিবেকানন্দ মাহাত্ম্য", "শ্রীরামকৃষ্ণ"। শ্রীমতী অপরাজিতা দেবীর "শ্রীশ্রীবিশ্বকর্ম্মার জীবন-কথা"। বঙ্গশ্রীতে ধারাবাহিক উপন্যাসদ্বয় "বঙ্গরমণী" এবং "অনির্ব্বাণ" পুস্তকাকারে না দেখা দিলেও আমরা ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষা করছি। লেখিকার দৃষ্টিপ্রদীপ সমুজ্জল, তিনি একজন যথার্থ শক্তিমতী সুলেখিকা তা'তে কোনই সন্দেহ নেই। জ্যোতির্ম্মালা দেবীর 'রক্ত গোলাপ', 'বিলাত দেশটা মাটির', 'ইরাবতী' রচনাশক্তি ভাল। অনুরূপা দেবীর "ঋতুচক্র" নাটিকা এবং "সাহিত্য ও সমাজ" প্রবন্ধ পুস্তক ছাপা হ'য়ে বের হয়েছে।

শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণীর "শতগান" বাংলাদেশের বিখ্যাত লেখকদের লেখা বাছাবাছা একশোটা সঙ্গীতের স্বরলিপি। "নববর্ষের স্বপ্ন" গল্পের বই, "চিত্রা" গীতিনাট্য, 'জীমূতোৎসব" ক্ষুদ্র নাটিকা; বাংলার স্ত্রীশিক্ষা ও যুব-জাগরণে সরলা দেবীর অবদান সামান্য নয়। তাঁর "বীরাষ্টমী" ব্রত একদা তরুণসমাজকে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ ক'রে স্বদেশ সেবায় টেনে এনেছিল। শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী দাসীর প্রবর্ত্তিত "ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের" পরিচালনা তিনিই করেছেন। বাঙ্গালী মেয়েদেরও বর্ত্তমান যুগের উপযোগী কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে পথ চলবার বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করে এসেছেন, আজও এই পরিণত বয়সেও তা' থেকে নিবৃত্ত হন নি।[৯]

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষজায়ার "দীপের দাহ", "ডায়রীর দৌত্য", "চিত্রাঙ্গদা", শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর "নারীর উক্তি ও অসংখ্য স্বরলিপি"।

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর "রঙ্গিণ মলাট" "জল ও আগুন" হাফহলিডে (সচিত্র গল্প) "ছোট ঠাকুরঝি" "কাশী যাত্রা"।

শ্রীমতী সুরমা সুন্দরী ঘোষের "সঙ্গিনী" (১৩৩১), রঞ্জিনী কবিতাপুস্তক, (১৩৩৯) সুনীতিশিক্ষা (১৩৪১) সুধাপাঠ (১৩৩২) "দিদিমার কথা", "পরলোকাঞ্জলী" (১৯৩০) শ্রীমতী উমাদেবী "বাতায়ন" কবিতাপুস্তক, "ঘুমের আগে" শিশুসাহিত্য, "কাজলী" উপন্যাস (১৩৩৮)।

আশালতা সিংহের “স্বয়ম্বরা” উপন্যাস, “একাকী” “সহরের নেশা”, “বাস্তব ও কল্পনা”, “ক্রন্দসী”, “কলেজের মেয়ে”, “অভিমান”, “পরিবর্ত্তন”, “মুক্তি”, ‘অমিতার প্রেম’, ‘আবির্ভাব’।

শ্রীমতী আশালতা দেবীর মোট বই এই কয়খানি, লেখিকা অকালে ইহলোক থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন জেনে আমরা দুঃখিত হয়েছি। “পাওয়ার বেদনা”, “কাঞ্চনদীঘির মেয়ে”, “বাংলার মেয়ে”, “অনিলার প্রেম”, “যে ঢেউ ভাসিয়া গেছে”, “জনতা”, “কালের কপোলতলে”, “পুনশ্চ”, “পথ ও প্রসাদ, “বিপথের অন্তরালে”, “সাথী”, “দুইনারী”, “মন নিয়ে খেলা, “ছন্দপতন”, “অন্তঃপুরে”, “যৌবনের সিন্ধুতলে”, “কলঙ্কের ফুল"।

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত পুস্তকাবলী

১। ঘূর্ণি হাওয়া
২। তীর্থ যাত্রী
৩। পথের শেষে
৪। মরুর পথে
৫। ঘরের লক্ষ্মী (১৯৪২)
৬। পথের সম্বল
৭। ব্যথিত ধরিত্রী (১৯৩৯)
৮। প্রতিষ্ঠা
৯। যুগান্তর
১০। আমার কথা
১১। পথ ও পান্থ
১২। মুক্তিস্নান
১৩। জাগৃহি
১৪। মুক্তির আহ্বান
১৫। মুক্তির আলো
১৬। আয়ুষ্মতী
১৭। উদয় অস্ত
১৮। পারের আলো
১৯। তরুণের অভিযান (প্রথম প্রকাশিত)
২০। অন্ধা (১৯২৩)
২১। ঢেউয়ের দোলা
২২। লক্ষ্মীবরণ (১৯৪৩)
২৩। বিসর্জন
২৪। পথের উদ্দেশে (১৯৪৩)
২৫। পথের দিশা
২৬। ছন্নছাড়া
২৭। রাতের পথিক (১৯৩৮)
২৮। দূরের আশায়
২৯। প্রতীক্ষায়
৩০। প্রাণের টান
৩১। শেষের দাবী

৩২। পাথেয়
৩৩। স্নেহের মূল্য
৩৪। বিজিতা
৩৫। বোধন
৩৬। নিশীথের আলো
৩৭। জাগরণ
৫৬। পরদেশী
৫৭। মুক্তিস্নান
৫৮। মাটির মায়া
৫৯। সংসারপথের যাত্রী
৬০। মাটির প্রেম
৬১। সাঁজের প্রদীপ (১৯৪১)

৩৮। বাংলার বউ
৩৯। দীপের আলো
৪০। মানুষ ও পৃথিবী
৪১। রাতের স্বপন (১৯৪৩)
৪২। প্রেম ও পূজা (১৯৪২)
৪৩। আগে ও পরে
৪৪। ব্রতচারিণী
৪৫। মাটির দেবতা
৪৬। পথপ্রান্তে (১৯৪৩)
৪৭। প্রাণের টান
৪৮। নিশীথের চাঁদ (১৯৪৩)
৪৯। বঙ্গপল্লী
৫০। তর্পণ
৫১। নূতন যুগ
৫২। মুক্তার অতীত (১৯৪২)
৫৩। চলার পথে
৫৪। খেয়ার শেষে
৫৫। দানের মর্য্যাদা
৬২। ধূলার ধরণী
৬৩। জীবন দেবতা (১৯৪৪)
৬৪। সোণার সংসার (১৯৪০)
৬৫। মায়ের আশীর্ব্বাদ
৬৬। শতাব্দীর স্বপ্ন (১৯৪৫)
৬৭। শতাব্দীর প্রতীক
৬৮। প্রেমময়ী
৬৯। হৃদয়ের চাঁদ
৭০। জাগরণ
৭১। নীড় ও বিহঙ্গ
৭২। ধ্রুবতারা
৭৩। দায়ী (হাসিরাশি ও
প্রভাবতী দেবী)
৭৪। সুখের সংসার
৭৫। দুনিয়ার দান
৭৬। ঝড়ের পরে
৭৭। অন্তরালে
৭৮। সহধর্ম্মিণী

নাটক

১। বাংলার মেয়ে
২। ব্রতচারিণী
৩। মধুরেণ সমাপয়েৎ

ফিল্‌ম

১। সহধর্ম্মিণী
২। বাংলার মেয়ে
৩। জননী
৪। রাঙা বউ
৬। ইন্দ্রনাথ (গৃহীত)

গল্প পুস্তক

১। জীবন সঙ্গিনী
২। গৌরী
৩। অপরাধের জের
৪। লছমী চাহিতে
দারিদ্র্য বেঢ়ল
৫। ঝরা ফুলের সৌরভ
১০। পাঁকের ফুল
১১। অভিযান
১২। জীবনের স্বপ্ন
১৩। বন্ধু
১৪। শুভ্রা
১৫। নূতন অতিথি (১৯৪৫)

শিশু উপন্যাস

১। অ্যাটলাটিকের তীরে
২। আরব অভিযান(১৯৪৫)
৩। গুপ্ত ঘাতক
৪। হত্যার প্রতিশোধ
৫। বন্দী জেগে আছ?
(১৯৪৫) অপ্রকাশিত (গৃহীত)
৬। মৃত্যু মঙ্গল
৭। কংগো সীমান্তে
৮। পশ্চিম আফ্রিকায়
৯। কৃষ্ণার বাহাদুরী

৬। স্মৃতির দংশন

৭। বিধবার কথা

৮। ঘন মেঘের তলে

৯। চোখের জলের পিছল পথে

১০। অ্যাটলাটিকের মোহানায়

১১। মুক্তি দূত

প্রভাবতীর ৭৮খানি উপন্যাস, ১৫খানি গল্পপুস্তক, ৮খানি নাটক এবং ১১খানি শিশু-উপন্যাস, সর্বসমেত মোট ১১০খানি গ্রন্থ এ পর্যন্ত (১৯৪৫ খৃঃ) প্রকাশিত হয়েছে। ইহা সমস্ত পৃথিবীর নারী-সমাজের পক্ষেই গৌরবের বিষয়।

শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী প্রণীত

১। মানুষের ঘর (১৯৪১) ৩। বিতর্দিকা

অপ্রকাশিত (গৃহীত) ৪। চক্রবাল

২। রাজকুমার—জাগো ৫। প্রান্তর—কবিতা

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবীর পুস্তকগুলি এইভাবে ছাপা হইয়াছে:—

১। স্নেহময়ী (উপন্যাস) ১৩৩৩ সালে দেবসাহিত্য কুটীর হইতে প্রকাশিত।

২। মেয়ের বাপ (উপন্যাস) ১৩৩৪ সালে ভূদেব পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

৩। ফল্গুধারা (উপন্যাস) ১৩৩৪ সালে ভূদেব পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

৪। রূপহীনা (উপন্যাস) ১৩৩৫ সালে ভূদেব পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

৫। প্রেমের বায়না (উপন্যাস) ১৩৩৬ সালে ভূদেব পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

৬। অনুরাগ (উপন্যাস) ১৩৩৯ সালে দেবসাহিত্য কুটীর হইতে প্রকাশিত।

৭। দিশেহারা (উপন্যাস) ১৩৪০ সালে জ্ঞান পাবলিশিং হাউস, ৪৪, বাদুড়বাগান হইতে প্রকাশিত।

৮। নিশীথবাদল (উপন্যাস) ১৩৪১ সালে জ্ঞান পাবলিশিং হাউস, ৪৪, বাদুড়বাগান হইতে প্রকাশিত।

৯। মহিলা-মজলিস (উপন্যাস) ১৩৪১ সালে জ্ঞান পাবলিশিং হাউস, ৪৪, বাদুড়বাগান হইতে প্রকাশিত।

১০। রাতের ফুল (উপন্যাস) ১৩৪২ সালে কলিকাতা ট্রেডিং কোম্পানী হইতে প্রকাশিত।

১১। আঁধারে আলো (উপন্যাস) ১৩৪২ সালে প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

১২। অভিশপ্তা (উপন্যাস) ১৩৪৫ সালে ফাইন আর্ট প্রেস ৬০নং বীডন স্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত।

১৩। ঝড়ের পথিক (গল্পের বই) ১৩৪৬ সালে ইণ্ডিয়ান্ বুক্ ষ্টোর্স, ৯৯।১।F কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

১৪। পথে বিপথে (উপন্যাস) ১৩৪৭ সালে শিশির পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

১৫। সাদা কালো (উপন্যাস) (অপ্রকাশিত)

১৬। অভাগীর স্বপ্ন (ছোট গল্পের বই) ১৩৫১ সালে কবিতাভবন ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ হইতে প্রকাশিত।

১৭। মনে পড়ে (জীবনস্মৃতি) ১৩৫০ সাল হইতে ‘প্রভাতী’ পত্রিকায় ১ম খণ্ড ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছে এবং ২য় খণ্ড সচিত্র শিশিরে বাহির হইতেছে।

এতদ্ভিন্ন যে সকল ছোট গল্প ও কবিতা বিভিন্ন সাপ্তাহিক ও মাসিকে বাহির হয়েছে, তা’ আর পুস্তকাকারে পরিণত হয় নি এ পর্যন্ত—সুযোগ অভাবে।

আজকাল অনেক নূতন নূতন লেখিকার নাম প্রত্যেক মাসিকেই দেখা যায়, মহিলা-পরিচালিত মহিলা সঙ্ঘেই বিশেষ করে নানা বিভাগে তাঁরা লিখছেন, এ খুব আশার কথা। কয়েক জনের নাম দিচ্ছি, এ ভিন্ন বহু লেখিকা আছেন, এঁদের মধ্যে প্রতিমা গাঙ্গুলী ও অনসূয়া দেবীর গল্প-উপন্যাস লেখার হাত ভালই বলতে হবে, ভবিষ্যতের আশা যথেষ্ট।

মন্দির-সম্পাদিকা কমলা দাসগুপ্তা, অনসূয়া দেবী, ইন্দিরা গুপ্তা, চিত্রিতা গুপ্তা, আরতি দত্ত, বেলা দে, শকুন্তলা, মৃণালিনী দেবী, পূর্ণিমা বসাক, বীণা মজুমদার, সুকৃতি দেবী, ধীরা গাঙ্গুলী, সুলেখা সেন, প্রতিভা চট্টোপাধ্যায়, সুলেখা মিত্র, গৌরী দেবী, বীণা সরকার, লিলি দত্ত, ইলা দেবী, ইলা মিত্র, সুষমা মিত্র, হেনা হালদার, লীলা মজুমদার, প্রতিমা বসু, শ্রীদুর্গা গঙ্গোপাধ্যায়, শেফালী গুপ্ত, স্বর্ণময়ী দেবী, রাণী দেবী, দীপিকা

পাল, অনুকা গুপ্ত, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, কাত্যায়নী দেবী, নন্দিতা দাশগুপ্ত, অমিতা বসু, প্রমীলা রায় চৌধুরী, নীলিমা সরকার, কৃষ্ণসুচিত্রা দেব, কিরণশশী দে, ক্ষান্তিলতা দেবী, শোভা দেবী, বিভাবতী বসু, সুজাতা রায়, সুলেখা মুখোপাধ্যায়, বেলা মিত্রা, বেলা হালদার, গীতা মিত্র, সুষমা সেন। মুসলিম মহিলাদের মধ্যে আরও কয়েকটী নাম করার মত নাম আছে, যথা; সুলেখিকা সুফিয়া কামাল, এস, রহমান, বেগম সারা তৈফুর, সাকেছা খাতুন, সেলিমা বেগম, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, শামশুন্নেসা মাহমুদ, নাজমা বেগম, বেগম জেবু আহমদ, সাইদা বেগম, সুরতুন্নিসা, জামসেদ উন্নিসা, রাজিয়া খাতুন, আনোয়ারা চৌধুরী, বেগম সামসুল নাহার, মাজমাকোন লিলি আহমদ, সাহজাদী বেগম, জাহানারা আরকু, সুলতান, বেষম, আছিয়া খাতুন প্রভৃতি বহু মুসলিম লেখিকার ছোঁয়া আমরা মধ্যে মধ্যে হঠাৎ পেয়ে থাকি, এঁদের মধ্যে দু' তিন জন সত্যকারই সুলেখিকা।

দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমান যুগের বাঙালী আমরা, বিদেশী সাহিত্যের সংবাদ যতখানি রাখি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যের সম্বন্ধে তা'র দশ ভাগের এক ভাগ সংবাদও রাখি না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মহত্তম দান বাঙালীর চিন্তার ক্ষেত্রে সোনার ফসল ফলিয়েছিল, বাংলা সাহিত্য ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যকে ছাড়িয়ে আজ বহু দূর অগ্রসর হয়েছে; তবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অতীত সাহিত্যে অনেক বড় জিনিষ আছে—এ কথা অস্বীকার করা যায় না এবং সেই সব সাহিত্যে নারীর দানও উপেক্ষণীয় নয়। পূর্বেই বলেছি এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অল্প, তবু যতটুকু সম্ভব আলোচনা ক'রব। বলা বাহুল্য খুব বেশী বিখ্যাত ব্যক্তি ছাড়া অন্যের নাম উল্লেখ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

বাংলার পাশেই আসাম। প্রাচীন আসামের নাম ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা কামরূপ। পূর্বে সেখানে অসুরবংশীয় যে রাজার রাজত্ব করতেন, তাদের অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ছিল; বাণরাজকন্যা ঊষা এবং তাঁর সখী চিত্রলেখার বৈদগ্ধ্যের পরিচয় আমরা মহাভারতের যুগেও পেয়েছি। মধ্যযুগে কামরূপের তন্ত্রবিদ্যা বাংলা দেশে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল, কামরূপের ডাকিনীরা যে হতভাগ্য বাঙালী পুরুষদের ভেড়া বানিয়ে রাখত, তা'র মূলে তাদের অলৌকিক তন্ত্রমন্ত্র ছাড়া লৌকিক বৈদগ্ধ্য বিদেশীকে আকৃষ্ট ক'রতে কতটা সাহায্য করত তা' আজ বলা সম্ভব নয়। বাংলা দেশের ঝাড়ফুঁক, সাপে কামড়ানো, ভূত ছাড়ানো প্রভৃতি পল্লীগ্রামের নানা গুরুতর ব্যাপারে আজও কামরূপের কামাখ্যার দোহাই অপরিহার্য। ধর্মমঙ্গলের যুগে গৌড়েশ্বরের বাহিনীকে যিনি সম্মুখ-সংগ্রামে বাধা দিয়েছিলেন সেই রাজকন্যা কানাড়া—শুধু বীরনারী ছিলেন না, সুশিক্ষিতা এবং ধর্মপ্রাণা ছিলেন। আসামী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার প্রভেদ খুবই অল্প, আসামী বিদুষীদের মধ্যে যাঁরা বাঙালী নন, তাঁদের মধ্যেও অধিকাংশই বাংলার সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত। চৈতন্যের যুগে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের স্ত্রী রাজা নরনারায়ণের সভায় পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কথিত আছে, তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রঘুনন্দনকে স্বামীর অনুপস্থিতিতে বেদ এবং স্মৃতির বিচারে পরাস্ত ক'রে রাজার কাছে বৃত্তিলাভ করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পদ্মাবতী ফুকনানী প্রথম আসামী ভাষায় গল্প লিখে নাম করেন। তার পর যমুনেশ্বরী খাতোনিয়ার সুলেখিকা ব'লে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে তাঁর অকাল মৃত্যুতে আসামী সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে আসামের সব চেয়ে বিখ্যাত লেখিকা নলিনীবালা দেবী এবং ধর্মেশ্বরী দেবী। নলিনীবালার লেখায় মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবি এবং মরমীয়া সাধকদের প্রভাব খুব বেশী। ছোটো গল্প এবং উপন্যাস লিখে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে স্নেহলতা ভট্টাচার্য এবং চন্দ্রপ্রভা সাইখিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য।

উত্তর ভারতের সর্বপ্রধান দু'টি ভাষার নাম করতে গেলে বাংলা এবং হিন্দীর নাম করতে হয়। হিন্দী সাহিত্যে নারীর দান বাংলার তুলনায় অল্প হ'লেও একেবারে নগণ্য নয়।

মধ্যযুগের মারাঠী নারী-কবিদের মধ্যে দু'জনের নাম আমরা জানি; দু'জনেই সাধিকা এবং দু'জনেই মরমীয়া কবি। এঁদের মধ্যে প্রথম মুক্তাবাই ছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর সাধকপ্রবর জ্ঞানেশ্বরের ভগ্নী এবং সুপণ্ডিত। কখনো তার ভাষা খুব সরল, কখনো তার ভাষা হেঁয়ালিতে ভরা। মুক্তা বাইয়ের রচনার একটু নমুনা দিচ্ছি: বলা বাহুল্য প্রথম কবিতাটির অর্থ সহজবোধ্য নয়, এটি ভক্তিমার্গেরও কথা। (১) আশ্চর্য্য (মুঙ্গি উড়তি আকাশি......ইত্যাদি)

'পিপড়ে আকাশে উড়ে গিলিয়াছে সূর্য!
বন্ধ্যার হ'ল ছেলে, এ কি আশ্চর্য!
বৃশ্চিক মথিতেছে পাতালের কুণ্ডে!
শেষ নাগ তার কাছে আছে হেঁট মুণ্ডে!
মাছির উদরে হ'ল ঈগলের সৃষ্টি!
মুক্তা বাঁচে না হেসে দেখে অনাসৃষ্টি!

একবার লোকের অত্যাচারে নিন্দাবাদে বিরক্ত হয়ে জ্ঞানেশ্বর কুটীরের দ্বার বন্ধ করেছিলেন, তিনি বোনকেও ঘরে ঢুকতে দেবেন না স্থির করেছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে মুক্তা এই কবিতাটি রচনা করেন—

(২) (মজবরী দয়া করা...ইত্যাদি)

দয়া করে ভাই, দুয়ার খুলিয়া দাও মোরে ঘরে স্থান!
সেই তো সাধক, যে পারে সহিতে দুনিয়ার অপমান।
সেই তো মহান, অভিমান যার নিঃশেষে হ'ল লয়,
সেই মহাপ্রাণ যার ভালোবাসা সবার উপরে র'য়।

তুমি যে ব্রহ্ম, বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিছ অহরহ,
তোমার হৃদয়ে ক্রোধ পাবে ঠাঁই কেমন করিয়া কহ?
প্রজ্ঞা তোমার স্থির হোক ভাই, ভ্রম হোক অবসান।
খোলো খোলো দ্বার, ভগিনী তোমার দ্বারে দণ্ডায়মান।

মুক্তা বাইয়ের বহু অভঙ্গ আজও মহারাষ্ট্র দেশে প্রচলিত, সাত শ' বছরেও সেগুলির জনপ্রিয়তা কমে নি। তাঁর পরবর্তী জনাবাই খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে জন্মেছিলেন এক দরিদ্রগৃহে; ভক্ত নামদেবের কাছে তিনি স্বেচ্ছায় দাসীত্ব স্বীকার করেন তাঁর ভক্তি-সাধনার স্পর্শ পেয়ে ধন্য হ'বার জন্য। জনাবাই পণ্ডিতা ছিলেন না, সারাদিন গৃহকার্যে এবং দেবপূজায় কাটিয়ে তিনি যে কবিতাগুলি রচনা ক'রে গেছেন, তার মধ্যে গভীর ভাবদ্যোতক বহু কবিতা আছে, একটি নমুনা দিলাম:

(দেব খাতে, দেব পিতে...ইত্যাদি)

‘দেবতা খাই, দেবতা করি পান,
দেবতা মোর শয়ন উপাধান;

যা কিছু দিই, যা কিছু লই, কিছুই নহে দেবতা বই,
দিবস রাতি স্বজনসাথী আমার ভগবান।

এখানে তাঁরে সেখানে তাঁরে পাই,
দেবতাহীন নাইকো কোনো ঠাঁই।

ভরি ভুবন পাত্রখানি, তাঁহারে আমি রেখেছি আনি,
আমার মিঠা দেবতা ‘বিঠা’[১০] কোথায় তিনি নাই!’

বর্তমান যুগের মারাঠী লেখিকাদের মধ্যে শ্রীধর রাণাডের পত্নী সুকবি মনোরমা রাণাডের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তার পর আরও বহু লেখিকা সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দিয়াছেন। ছোটো গল্প রচনায় যাঁরা নাম করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণাবাই।

ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে গুজরাত। সংস্কৃত সাহিত্যে গুজরাতী নারী কবি প্রভুদেবী লাটী একদিন ভারতের শ্রেষ্ঠতম কবিদের মধ্যে অন্যতম ব'লে বিবেচিত হয়েছিলেন, সে কথা পূর্বে বলেছি। গুজরাতের চরম উন্নতির যুগে, আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে, সিদ্ধরাজ জয়সিংহের মা ‘মীনল-দেবী’ অন্‌হিল্‌বাড়ার রাজসিংহাসনে উপবিষ্টা ছিলেন। নাবালক পুত্রের নামে এই বিদুষী ধর্মপ্রাণা নারী কেবল দীর্ঘকাল রাজ্য শাসনই করেন নি, গুজরাতের শিল্পে সাহিত্যে ধর্মে তিনি যে প্রেরণা

দিয়ে গিয়েছিলেন তার জন্য গুজরাতবাসী আজও তাঁকে দেবী জ্ঞানে পূজা করে। তাঁর পর দ্বাদশ শতাব্দীতে মহারাজ অজয়পালের বিধবা মহিষী 'নায়িকা দেবী' সিহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরীকে সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত ক'রে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেন। নায়িকা দেবী শুধু অসিচালনায় সুপটু ছিলেন না, ভারতীয় এবং বহির্ভারতীয় রাজনীতির কূটকৌশল তাঁর সম্যক্ রূপে জানা না থাকলে দিগ্বিজয়ী ঘোরীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হত না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মহারাজাধিরাজ বিশালদেবের মন্ত্রী তেজপালের পত্নী অনুপমা দেবী এবং বাস্তুপালের পত্নী ললিতা দেবী তাদের ধর্মানুরাগ, শিল্পানুরাগ এবং সাহিত্যানুরাগের জন্য অমর খ্যাতি লাভ করেছেন। আবুপর্বতের মর্মর মন্দির আজও তাঁদের সৌন্দর্যজ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছে, কিন্তু তাদের অন্যান্য কীর্তির কথা অনেকেই জানেন না। তেজপালের পত্নী অনুপমা রাজ্যশাসনে স্বামীর দক্ষিণহস্তস্বরূপা ছিলেন, মুসলিম প্রজাদের জন্য মসজিদ নির্মাণ তাঁর মহাপ্রাণতার এবং সংস্কারমুক্ত সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার পরিচয় দেয়। বাস্তুপাল বিদুষী পত্নী ললিতা দেবীর অনুপ্রেরণায় আঠারো কোটি মুদ্রা ব্যয়ে তিনটি গ্রন্থাগার নির্মাণ করেছিলেন এবং শত শত পণ্ডিত এবং কবিকে বৃত্তি দিয়ে আশ্রয় দিয়ে সাহিত্যচর্চায় সাহায্য করেছিলেন। হিন্দুরাজত্বের অবসানে গুজরাতে স্ত্রীশিক্ষা কিছুদিনের জন্য ব্যাহত হয়েছিল, তবে জৈন সন্ন্যাসিনীরা শাস্ত্রচর্চার ধারা সেদিনও মঠে মঠে রক্ষা ক'রে স্ত্রীশিক্ষা অব্যাহত রেখেছিলেন। বাংলার শ্রীচৈতন্য এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রভাব ষোড়শ শতাব্দীতে যখন সমস্ত ভারতবর্ষকে অনুপ্রাণিত করে, তখন পশ্চিম ভারতের এক বিদুষী ধর্মপ্রাণা নারী বৃন্দাবন থেকে তাঁর অন্তরের হোমশিখা দ্বারকার সমুদ্রতীর পর্যন্ত নিয়ে গেছলেন, তাঁর নাম মীরাবাই। মীরাবাইয়ের কথা আমরা পূর্বে সামান্য কিছু বলেছি, তাঁর ভাষা ছিল পশ্চিম রাজস্থানী, তখনও সেই ভাষাই গুজরাতের দেশভাষা; সুতরাং মীরাবাইকে রাজপুতানা এবং গুজরাত নিজের লোক ব'লে সমভাবেই দাবী করে। মীরাবাইয়ের সম্বন্ধে এইটুকু ব'ললেই যথেষ্ট হবে যে, তাঁর চেয়ে বড় কবি পশ্চিম ভারতে আজ পর্যন্ত জন্মাননি। 'বোড়া' নামক গুজরাতী মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরবর্তী যুগে 'রতনবাই' নামক সুকবির আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁর ভজনগুলিতে মীরারই প্রভাব দেখা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে এসে গুজরাতী সাহিত্য নূতন ভাবে গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। গত শতাব্দীতে শিক্ষিতা গুজরাতী নারীদের মধ্যে শ্রীমতী বিদ্যাগৌরী নীলকণ্ঠ প্রথম গ্র্যাজুয়েট হন। তিনি নিজের বহু প্রবন্ধ রচনা ছাড়া তাঁর স্বামী রমণ ভাই নীলকণ্ঠের 'হাস্যমন্দির' রচনায় সাহায্য করেছেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীমতী সুমতি ত্রিবেদী (মৃত্যু ১৯১১) ও বিজয়লক্ষ্মী ত্রিবেদীর (মৃত্যু ১৯১৩) অকালমৃত্যুতে গুজরাতী সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুকবি 'দীপক' বা দেশাইয়ের 'স্তবনমঞ্জরী', 'কুন্দকাব্য' কবিতার বই এবং মারাঠীর অনুবাদ 'সঞ্জীবনী' নাটক খ্যাতি লাভ করেছে। 'হিন্দুস্থান' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদিকা হংস মেটার তিনটি নাটক 'ত্রণ নাটক,' গল্পচ্ছলে দেশবিদেশের ইতিহাস 'অরুণ নুঁ'—অদ্ভুত স্বপ্ন এবং গলিভারের ভ্রমণের অনুবাদ জনপ্রিয় হয়েছে। "হিন্দুকোড্" বিষয়ক একখানি পুস্তিকা তিনি ছাপিয়েছেন!

শ্রীমতী প্রিয়মতী শুক্লা ‘জ্যোৎস্না’ ছদ্মনামে ‘চেতনা’ নামক মাসিক এবং ‘সুদর্শন’ নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। তিনি বহু প্রবন্ধ এবং কবিতা রচনা করেছেন, তার মধ্যে তাঁর জাতীয় সঙ্গীতগুলি বিশেষভাবে প্রশংসা লাভ করেছে। মারাঠী থেকে গুজরাতীতে দু’খানি উপন্যাস তিনি সুন্দরভাবে অনুবাদ করেছেন। শ্রীমতী কানুবেন দাভে এবং শ্রীমতী চৈতন্যবালা মজুমদার অল্পবয়সেই গুজরাতী সাহিত্যে নাম করেছিলেন, তাঁদের অকাল-মৃত্যুতে গুজরাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শ্রীমতী লীলাবতী মুন্সী ‘গুজরাত’ পত্রিকার অন্যতমা সম্পাদিকা ছিলেন, তাঁর বহু প্রবন্ধ, নাটক, ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিকথা, গল্প, উপন্যাস গুজরাতী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। ‘রেখাচিত্র’, ‘বিজা লেখো’, ‘কুমার দেবী’, ‘জীবন মাঁখি’, ‘জাদেলি’, ‘বধূ’, ‘রেখাচিত্র-আনে’, ‘বিজুবধূঁ, প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে এবং দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করায় বর্তমানে তাঁর সাহিত্যসাধনা ব্যাহত হয়েছে। শাণিত ভাষা, “তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং সাবলীল রচনাভঙ্গীতে লীলাবতী দেবীর প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ আজ গুজরাতী পুরুষ লেখকদের মধ্যেও দুর্লভ।

পাঞ্জাবী ভাষার প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। সংস্কৃত ভাষার লেখিকাদের মধ্যে বৈদিক ব্রহ্মবাদিনীদের থেকে আরম্ভ ক’রে মধ্যযুগের বহু নারী কবির কথা ইতিপূর্বে বলাই হয়েছে। মুসলমান প্রাধান্যের সময় পাঞ্জাবে উর্দু এবং পারসীর বহু প্রচলন ছিল এবং স্ত্রীশিক্ষার বহু বাধা ছিল।

বর্তমান যুগে পাঞ্জাবী ভাষায় লেখিকার সংখ্যা অল্প হ’লেও সেই অল্পসংখ্যক লেখিকার মধ্যে কয়েকজন রীতিমত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। সুকবি অমৃত প্রীতমের লেখা থেকে আধুনিক পাঞ্জাবী কবিতার তিনটি নমুনা দিলাম:

(১) (পৃথিবী ব’লছেন):
“হে রবি, আমারে তুমি বাসিয়াছ ভালো,
মোর দেহে প্রতি রোমকূপে জ্বলে তোমার প্রেমের আলো!
তবু মোরা দূরে আছি,
কোনো দিন তবু দাঁড়াতে পা’ব না এ উহার কাছাকাছি!”

(২) “কালের প্রাচীর দর্পণ দিয়ে গড়া;
দেখা যায় তা’তে যুগযুগান্ত, দূর অতীতের সুদূর প্রান্ত,
আমাদের ছবি দেখা যায় সবি,—যায় না কিছুই ধরা!

(৩) “সহসা পেশীতে তার উন্মাদ স্পন্দন উঠে জেগে,
বন্দীর শৃঙ্খলে পড়ে টান।
শতাব্দীর মোহবন্ধ ছিঁড়ে যায় বিদ্যুতের বেগে,
অন্যায়ের হয় অবসান।”[১১]

এই ভাষার শক্তি এবং সৌন্দর্যকে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

উত্তর ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা যা'ও বা জানি, দক্ষিণ ভারতের সম্বন্ধে তা'ও জানি না। দাক্ষিণাত্যে প্রধানতঃ চারটি ভাষা চলে, কর্ণাটকে কানাড়ী, অন্ধ্রদেশে তেলুগু, তার দক্ষিণে তামিল দেশে তামিল এবং তারও দক্ষিণে, ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে কেরল দেশে মালয়ালম্। এর মধ্যে কর্ণাট এবং অন্ধ্রের সঙ্গে প্রাচীন যুগে বিশেষ ক'রে পাল এবং সেন রাজাদের আমলে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। পাল রাজাদের অনেক রাণী কর্ণাট এবং অন্ধ্র থেকে এসেছেন, সেন রাজারা তো জাতেই কর্ণাটী ছিলেন। কর্ণাটকের সুদূর অতীতের সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা বেশী কিছু জানি না, তবে সংস্কৃতে বিখ্যাত নারী কবিদের মধ্যে বহু কর্ণাটী নারীর নাম পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের ভাষাগুলিতে সংস্কৃত প্রভাব পরবর্তী যুগে পড়লেও সেগুলি মূলতঃ দ্রাবিড় ভাষা, সুতরাং উত্তর ভারতের সংস্কৃতমূলক ভাষাগুলির চেয়ে তাদের ইতিহাস অনেক পুরাতন,—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সংস্কৃত কবিদের সমসাময়িক যে সব কর্ণাটী নারী কবি কানাড়ী ভাষায় সাহিত্যচর্চা করেছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের নাম আমরা জানি না। মহিসুরে দ্বাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে হয়শালারাজ বিষ্ণুবর্ধনের মহিষী শান্তলা দেবী (নটন সরস্বতী) বেলুড়ে কেশব স্বামীর মন্দিরে দেবতার প্রীত্যর্থে প্রতিদিন গান গেয়ে নৃত্য করতেন। তাঁর নৃত্যের খ্যাতি আজও তাঁর স্বদেশে লুপ্ত হয়নি, কিন্তু তাঁর স্বরচিত গানগুলি আজ আর পাবার উপায় নেই। শান্তলার স্বামী মহারাজ বিষ্ণু বর্ধনের সভায় নারী কবি 'কান্তি' খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কানাড়ী রামায়ণের রচয়িতা নাগচন্দ্র বা 'অভিনব পম্পা' ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি, সভামধ্যে তাঁর বহু কবিতার পাদপূরণ ক'রে 'কান্তি' রাজসম্মান লাভ করেন। নাগচন্দ্রকে দেশবিদেশের লোক মহাকবি ব'লে স্বীকার করলেও কান্তি করতেন না, তিনি তাঁর সঙ্গে সমপদস্থের মতোই ব্যবহার করতেন। অবশেষে তাঁর কাছে প্রশংসা আদায়ের অন্য কোনো উপায় না পেয়ে নাগচন্দ্র একদিন সহসা সভামধ্যে মৃত্যুর ভান ক'রে মাটিতে পড়ে গেলেন। চারিদিকে হাহাকার উঠল, কান্তি দয়াপরবশ হ'য়ে সেদিন নাগচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে শ্লোক রচনা করলেন। নাগচন্দ্র বাজি জিতলেন, কান্তিকে অবাক্ করে দিয়ে সহসা তিনি বেঁচে উঠলেন। এমন অপ্রস্তুত কান্তি জীবনে কখনও হননি।

প্রসিদ্ধ কানাড়ী বৈয়াকরণ নাগবর্মা দশম শতাব্দীতে তাঁর 'ছন্দোম্বুধি' গ্রন্থ স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনচ্ছলে রচনা করেছিলেন। একাদশ শতাব্দীর কানাড়ী জ্যোতির্বিদ ভাস্করাচার্যপত্নী (কোনমতে কন্যা) লীলাবতীর মত বৈয়াকরণ পত্নী উত্তর ভারতে খ্যাতি লাভ না ক'রলেও তাঁর ছন্দ এবং ব্যাকরণ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য অল্প ছিল না, ঐ বইখানিতে তার প্রমাণ আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা চিক্কদেব রায়ের রাণীর তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী 'হোন্নি' বা 'হোন্নাম্মা' সুপণ্ডিতা ছিলেন; 'নারীর কর্তব্য' সম্বন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটি গ্রন্থ আজও পাওয়া যায়।

কর্ণাটকের বর্তমান যুগের লেখিকার মধ্যে কয়েকজন ইতিমধ্যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক কানাড়ী সাহিত্য যাঁদের রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। কুর্গের শ্রীমতী গৌরাম্মা, অঞ্জনগড়ের শ্রীমতী তিরুমালাম্মা, বাঙ্গালোরের শ্রীমতী থিরুমালাই রাজম্মা বা 'ভারতী', কলকাতা প্রবাসিনী শ্রীমতী বাসন্তী দেবী পদকোণে, বাঙ্গালোরের 'সরস্বতী' পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী কল্যাণাম্মা এবং ধারোয়ারের 'জয় কর্ণাটকের' সহ-সম্পাদিকা শ্রীমতী শ্যামলা দেবী বেলগাউমকার। এ ছাড়া 'বাণী' এবং 'জৈন মহিলা' ছদ্মনামে দু'জন শক্তিশালিনী লেখিকা কানাড়ী সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করেছেন। কর্ণাটী মেয়েদের মধ্যে প্রাচীনপন্থী লেখিকার সংখ্যা এখনও বেশী, তবে প্রগতিপন্থীরাও দেখা দিতে আরম্ভ করেছেন। 'বাল সরস্বতীর' ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস থেকে আরম্ভ করে ছোটো বড়ো গল্পে, প্রবন্ধে, কবিতায় এবং নাটকে কানাড়ী মেয়েরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

কানাড়ীর পর তেলুগু সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা দরকার। খৃষ্টের বহু সহস্র বৎসর পূর্বে অন্ধ্রদেশে বিশেষ শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব হয়েছিল ব'লে সে দেশের প্রাচীন পন্থীরা বিশ্বাস করেন, যদিও আধুনিক পণ্ডিতেরা তা বিশ্বাস করেন না। এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত এখনও কিছু হয়নি। অতীতের উল্লেখযোগ্য অন্ধ্রদেশীয় লেখিকাদের মধ্যে সংস্কৃত কবিদের বাদ দিলে প্রথমেই 'কারিকুল অম্মেয়ারে'র নাম করতে হয়। জনশ্রুতি, তিনি খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, আধুনিক পণ্ডিতেরা তাঁকে খৃষ্টের তৃতীয় চতুর্থ শতকে ফেলেন। যাই হোক, তিনি যে অন্ধ্র দেশের প্রাচীনতম যুগের একজন শক্তিশালিনী লেখিকা, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নেই। অম্মেয়ার অনেক গান রচনা করেছেন, তেলুগু গীতি-সংগ্রহগুলির মধ্যে তাঁর বহু রচনা এখনও পাওয়া যায়। এক জায়গায় তিনি বলেছেন:

"প্রভু আমাদের স্বর্গে আছেন কেহ বা বলে;
তিনি মহাদেব, দেবরাজ তিনি দেবতা দলে।
বিশ্বভুবন করিছে শাসন যে ভগবান,
আমি জানি তিনি আমারি বক্ষে বিরাজমান॥"[১২]

এমনি সরল দ্বিধাহীন ভাষায় তিনি অনেক বড়ো বড়ো ধর্মের কথা, জ্ঞানের কথা বলে গেছেন, যা চিরপুরাতন হ'য়েও চিরনূতন, দুই সহস্র বৎসরেও যার মূল্য কমে নি। অতি প্রাচীন যুগে দক্ষিণ ভারতে সুপণ্ডিত এবং সু-কবিদের একটি সমিতি ছিল, তার নাম ছিল 'সঙ্গম' বা সঙ্ঘ। এই বিদ্বন্মণ্ডলীর সভায় সমসাময়িক প্রত্যেক লেখক-লেখিকাকে তাঁদের লেখা বিচারের জন্য দিতে হ'ত। লেখা যোগ্য বিবেচিত হ'লে গ্রন্থে সঙ্গম্‌স্বীকৃতির ছাপ দেওয়া হ'ত, খুব বেশী ভালো লেখা হ'লে কবিকে মণ্ডলীতে স্থান দেওয়া হ'ত। কয়েক হাজার বছর ধরে এই 'সঙ্গম'গুলি দক্ষিণী সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, তার বাছাই করা রত্নগুলিকে কাব্যসংগ্রহের মধ্যে স্থান দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে।

বলা বাহুল্য অম্মৈয়ারের লেখাগুলি সঙ্গমের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল এবং সঙ্গমের কৃপাতেই সেগুলি দীর্ঘজীবন লাভ করেছে।

এর পর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে একজন সুকবির নাম পাওয়া যায়, তিনি বালবিধবা কুপ্পামাম্বা'। বালবিধবার জীবনে স্বভাবতঃই দুঃখ আছে, তার ওপর সমাজের অবিচার তাঁর মর্মবেদনাকে শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁর গানগুলিতে নিজের ব্যর্থ জীবনের অব্যক্ত ক্রন্দনকে তিনি সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন, আজও তার করুণ সুর শ্রোতার মর্ম স্পর্শ করে। তবে কুপ্পামাম্বার রচনায় একঘেয়ে করুণ রসের প্রবাহ এবং নারীসুলভ বিলাপ আজকালকার সকল শ্রোতার ভালো না'ও লাগতে পারে। যাই হোক, কুপ্পামাম্বা তেলুগু সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে অতীতের সম্মান পেয়ে গেছেন, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

মুসলমান আক্রমণের পর দক্ষিণ-ভারতে অবনতির যুগ আরম্ভ হয়। তেলুগু সাহিত্যে এর পর দুই শতাব্দীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নারী কবির সাক্ষাৎ আমরা পাই না। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে আরও কয়েকজন বিদুষীর রচনা পাওয়া যায়, তাঁরা সকলেই সংস্কৃতে কবিতা লিখেছেন। এ যুগের মেয়েরা লেখাপড়া শিখলেই সংস্কৃত ভাষায় কবিতা লিখতেন, তাঁদের নিয়ন্ত্রিত ক'রবার জন্য কোনো সঙ্ঘও ছিল না, দেশভাষার সমাদরও কমে গেছল। রাজসভায় তেলুগু ভাষা সমাদর লাভ করে আবার বিজয়নগরের স্বাধীন হিন্দুরাজত্বে। ঘোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে একদিকে বাংলাদেশ থেকে শ্রীচৈতন্যের ভক্তিরসের বন্যা দক্ষিণ ভারতকে চঞ্চল করে তোলে, অপরদিকে বিজয়নগরের রাজাধিরাজ কৃষ্ণদেব রায়ের সহায়তা এবং পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষিণী কবিরা নূতন প্রেরণা লাভ করেন। এই যুগের দু'জন ক্ষণজন্মা নারী তেলুগু সাহিত্যকে তাঁদের রচনাসম্ভার দ্বারা সমৃদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন গ্রামবাসিনী দরিদ্র কুম্ভকার-কন্যা, আর একজন রাজাধিরাজ-দুহিতা। একজন জীবিতকালে যেমন সুপ্রসিদ্ধা ছিলেন, আজও ঠিক তেমনি সুপ্রসিদ্ধাই আছেন, আর একজন জীবিতকালে বহু খ্যাতি লাভ করলেও আজ সে খ্যাতি নামমাত্রে পর্যবসিত। এঁদের মধ্যে একজনের নাম 'মোল্লা' আর একজনের নাম 'মোহনাঙ্গী'। নেলোর জেলায় গোপবরম্ গ্রামে এক দরিদ্র কুম্ভকার পরিবারে 'মোল্লার' জন্ম। ছোটোবেলা থেকে তিনি ছিলেন কল্পনাবিলাসিনী। সঙ্গিনীদের নিয়ে পৌরাণিক নাটক অভিনয় করায় ছিল তাঁর সব চেয়ে আনন্দ। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে তিনি সংস্কৃত রামায়ণ পড়েন এবং রামায়ণের রসধারা তাঁর দরিদ্র অশিক্ষিত দেশবাসীকে পরিবেশন করবার জন্য তাঁর চিত্ত ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। দরিদ্রের সংসারে অবসরের একান্ত অভাব, প্রতিদিন স্নানের পর চুল শুকোতে গিয়ে তিনি যেটুকু সময় রোদে বসতে পেতেন, সেইটুকু সময় লেখনী-পরিচালনা ক'রে কবিতায় রামায়ণের মত মহাকাব্যের তেলুগু অনুবাদ শেষ করলেন। মোল্লার রামায়ণ সংস্কৃতের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, তাঁর নিজের ভাষায় নিজের ভঙ্গীতে লেখা এক অপূর্ব সৃষ্টি। বিদেশী সমালোচকেরাও তাঁর প্রতিভাকে স্বীকার করেছেন। মোল্লার ভাষা সরল এবং মধুর, উপমা, ব্যঞ্জনা, বর্ণনাশক্তি সমস্তই তাঁর অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচায়ক। তেলুগু

ভাষায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী লেখিকা আজও কেউ জন্মান নি, অন্ধ্রদেশের ঘরে ঘরে মোল্লার রামায়ণ আজও পঠিত হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় বিখ্যাত লেখিকা 'মোহনাঙ্গী' মহারাজ কৃষ্ণদেব রায়ের কন্যা। স্নেহময় বিদ্যোৎসাহী পিতার চেষ্টায় তাঁর শিক্ষা সে যুগের পক্ষে যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। বিদুষী রাজকন্যা ছিলেন রাজসভার 'অষ্টদিগ্‌গজ'দের প্রিয়পাত্রী, দরিদ্র কবিদের আশ্রয়দাত্রী। তাঁর 'মরীচী-পরিণয়' কাব্য সে যুগের শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে মোহনাঙ্গীর 'মরীচী-পরিণয়' আজ লুপ্ত হয়ে গেছে, অন্ততঃ এ পর্যন্ত তার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নি।

এঁদের পরবর্তী প্রতিভাশালিনী তেলুগু লেখিকা 'মুড্ডুপলনি' অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঞ্জোরের রাজা প্রতাপ সিংহের সভায় নর্তকী ছিলেন। তাঁর 'রাধিকাসান্ত্বনম্' এবং 'এলাদেবীয়া' কাব্যে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষার আড়ম্বর কোথাও কোথাও তাঁর ভাবকে ছাড়িয়া গেছে, কোথাও কোথাও কুরুচির পরিচয়ও আছে, তবু 'মুড্ডুপলনি'কে অন্ধ্র দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতমা ব'লে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠা তেলুগু লেখিকা 'ভেস্কমাম্বা' কুড্ডাপা জেলায় তারিগোণ্ডা গ্রামে মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মেছিলেন। অল্প বয়সে স্বামী হারিয়ে তিনি ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করেন, গ্রামের মন্দিরে দিনরাত আপন মনে বসে ধ্যান ধারণা করাই ছিল তাঁর কাজ। ধর্মচর্চার মধ্যে তিনি নিজের ব্যক্তিগত শোক ভোলবার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন, তাঁর লেখায় তাই হতাশার বা বিষাদের সুর নেই, জ্বলন্ত বিশ্বাস এবং আত্মনিবেদনের জ্যোতিতে তাঁর রচনা সমুজ্জ্বল। গ্রামের কুৎসা-রটনাকারীরা শেষ পর্যন্ত তাঁর ধর্মচর্চার মধ্যে কু-অভিসন্ধি আরোপ করায় তিনি বিরক্ত হ'য়ে স্বজন-সমাজ ত্যাগ করে পুরাপুরি সন্ন্যাসিনী হলেন এবং ভেঙ্কটাচলের তীর্থে আশ্রয় নিলেন। তাঁর 'ভেঙ্কটাচল-মাহাত্ম্য' 'মুক্তিকান্তিবিলাসম্' এবং 'ভাগবত' ভক্তের অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়ে লেখা বহুপ্রশংসিত কাব্য।

বিংশ শতাব্দীর তেলুগু লেখিকাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন তামিল লেখিকাদের মধ্যে অভৈয়ারের নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। অভৈয়ার নামধারিণী কয়েকজন কবির পরিচয় আমরা পাই, তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথমা জীবনের অধিকাংশ সময় 'আদি গমান নেড়ুমান আঞ্জি' নামক রাজার সভায় কাটিয়েছেন। তিনি জাতিতে 'পানার' এবং বিখ্যাত গায়িকা ছিলেন, প্রায় দু' হাজার বছর আগে এই আকৌমার ব্রহ্মচারিণী নারী সমস্ত দক্ষিণ ভারতে খ্যাতি লাভ করেন। মহারাজ 'আঞ্জি' তাঁকে রাজদূত ক'রে কাঞ্চিরাজ 'টোণ্ডাইমানের কাছে পাঠান, কাঞ্চিরাজের সাহায্য প্রার্থনা ক'রে। চের, চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজসভায় শত্রুমিত্রের কাছে সমান সম্মান লাভ ক'রে পরিণত বয়সে 'আঞ্জি'র মৃত্যুর পর অভৈয়ার

পরিব্রাজিকা হন। দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুরে এখনও পাহাড়কাটা মন্দিরে দেবীরূপে তিনি পূজা পাচ্ছেন। দশম শতাব্দীতে আর একজন অভৈয়ার খ্যাতি লাভ করেছিলেন। 'কুরি এয়িনি' নাম্নী আর একজন লেখিকার নাম এবং লেখা পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর আবির্ভাব কাল ঠিক করে বলা যায় না। পাণ্ড্যরাজ বল্লভ দেবের সময়ে মহাসাধক পেরিয়া আলোয়ার ছিলেন শ্রীবিল্লীপুত্তুরের পূজারী। এই বিষ্ণুমন্দিরের পুরোহিতের ঘরে দক্ষিণের 'মীরা', তামিলদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী কবি আণ্ডাল ৭১৬ খৃষ্টাব্দে জন্মেছিলেন। তাঁর প্রধান রচনা 'নাচ্চিয়ার তিরুমোলি'। এতে কবি নিজেকে 'তিরুমল' বা নারায়ণের পত্নীরূপে কল্পনা করেছেন এবং তাঁর কাছে মান-অভিমান, বিরহবেদনা প্রভৃতি জানিয়েছেন। দক্ষিণ বিষ্ণুমন্দিরের আজও বৈষ্ণব মহাগুরুদের মধ্যে অন্যতম 'আলোয়ার' (আলবার) রূপে তিনি পূজা পাচ্ছেন। অতি অল্প বয়সে প্রথম যৌবনে আণ্ডালের মৃত্যু হয়। লোকলজ্জায় তাঁর পিতা তাঁর বিবাহ দিতে বদ্ধপরিকর হলে অণ্ডাল দৃঢ়ভাবে বিবাহ করতে অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরই জয় হয়, কৃষ্ণার্পিত দেহ মন নিয়ে অন্য কোনো মানুষকে স্বামী বলে স্বীকার করা তিনি অসম্ভব বিবেচনা করায় স্বপ্নাদেশ অনুসারে তাঁকে শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণুমন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়, সেইখানে জনশ্রুতি অনুসারে তিনি বিষ্ণুর দেহে বিলীন হয়ে যান। আণ্ডালের রচনার একটি নমুনা দিলাম:

"কে কোথা শুনেছে কবে, যাজ্ঞিকের যজ্ঞহবি
ভোগ ক'রে ফেরু মরুচারী?
যৌবনপুষ্পিত মোর এই অনিন্দিত তনু
রাখিয়াছি পূজা লাগি তাঁরি।
শঙ্খচক্রধারী যিনি, তিনি মোর প্রাণেশ্বর,
তাঁরে ছাড়ি পরিণয়-ডোরে
বন্দী হ'য়ে;—মর্ত নরে আমারে ভজিতে হবে?
তার আগে মৃত্যু দাও মোরে!"

বাঙালী মুসলিম নারীদের মধ্যে সাহিত্যিক ব'লে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁদের ভিতর "মতিচুর" রচয়িত্রী শ্রদ্ধেয়া রকেয়া হোসেনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই বাঙালী নারীর সঙ্গে বিহারী রাজকর্মচারী সৈয়দ সখাওয়াৎ হোসেনের পরিণয় হয়েছিল। স্বামীর দেহান্তের পর ইনি দীর্ঘজীবন হিন্দু সতী নারীর মতই নৈষ্ঠিক ও কৃচ্ছ্র বৈধব্যব্রত পালন করেছিলেন। তিনি শুধু নিজে বিদ্যার্চর্চায় সন্তুষ্ট হ'তে পারেননি, অবরোধবাসিনী মুসলিম নারীগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য পরলোকগত স্বামীর নামে "সখাওয়াৎ মেমোরিয়েল" বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে তার জন্য নিজের সম্পত্তি এবং জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। "পদ্মরাগ" নামক তাঁর আর একখানি পুস্তকও পাঠক-সমাজে আদৃত হয়েছিল। তা' ছাড়া তাঁর আরও কতকগুলি পুস্তক আছে।

এইখানে কয়েকজন আধুনিক মুসলিম লেখিকার নাম দিলাম। মুসলিম সমাজমধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করবার জন্য এবং হিন্দুমুসলমান দাঙ্গার দুর্দ্দিনে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী বন্ধনের আলো জ্বালাবার জন্য বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখে বেগম সোফিয়া খাতুন সমস্ত বাঙ্গালী জাতির শ্রদ্ধার পাত্রী হয়েছেন। বেগম শামসুন নাহার, সুফিয়া হুসেন, মাহ্‌মুদা সিদ্দিকা, নাজমা বেগম, জাহানারা বেগম চৌধুরী, এঁরা সকলেই সুলেখিকা। জাহানারা চৌধুরী কয়েক বৎসর ধ'রে একখানি সাহিত্য-বার্ষিকী সম্পাদন দ্বারা বহু হিন্দু মুসলিম লেখক-লেখিকাকে এক সাহিত্যিক সম্মিলন তীর্থক্ষেত্রে সমবেত ক'রে, সকলেরই ধন্যবাদের পাত্রী হয়েছিলেন। হিন্দু মুসলিম রাজনৈতিক প্যাক্টে'র মত স্বার্থময় বিষয়বস্তু নয়, এই নিঃস্বার্থ অসাম্প্রদায়িক পূজা-মণ্ডপই যথার্থ সর্বজাতির মিলনমন্দির, এই সত্য তাঁর তরুণচিত্তে প্রতিভাত হয়ে তাঁকে এই মহৎকার্যে প্ররোচিত করেছিল। সম্প্রতি হিন্দুমুসলিম মিলন উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত 'গুলিস্তাঁ' পত্রিকায় কয়েকজন লেখিকার নাম দেখা গেল, তাঁদের সুনাম বর্দ্ধিত হোক। লুৎফা সাহারুণ বেগম, জেবু আহমদ সাদদা বেগম প্রভৃতি।

হিন্দু-মুসলিম শিক্ষিতা মেয়েদের আমরা এই পথেই চলতে অনুরোধ করি, ক্ষুদ্র "স্বকে" বৃহত্তর স্বার্থে নিমজ্জিত ক'রে দেওয়াই যথার্থ স্বার্থ ত্যাগ, মায়ের বোনেরা যদি এই শিক্ষা তাঁদের রক্তের ভিতর দিয়ে, শিক্ষার ভিতর দিয়ে সন্ততি-শরীরে সঞ্চারিত করতে পারেন, তবে কোন শক্তি তাকে নিজ স্বার্থের যুপকাষ্ঠে বলি দিতে সমর্থ হবে না। ইসলামের বাণী, গীতার বাণীর সঙ্গে মিলে গিয়ে আসমুদ্র হিমাচলে জীমূত-মন্দ্রে ধ্বনিত হবে। পরাধীন জাতির সমস্ত গ্লানি ও সমূদয় জড়তাকে পরিহার করে সমগ্র ভারতবর্ষ এক সঙ্গে সমকণ্ঠে উচ্চারণ করে, আত্মোপলব্ধি করবে, এমন কি সমগ্র জগৎবাসীকেই ডেকে এনে এই মহা-মিলনের মহা-বাণী শোনাতে পারবে:

"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা"

এ সম্বোধন হিন্দুর জন্য নয়, উপনিষদকার ঋষি বিশ্বের সমুদয় "অ-মৃতের পুত্রদেরই" এই অপূর্ব তথ্য শ্রবণ করবার জন্য আহ্বান করেছেন, জাতি নীতি কুল গোত্র বাছেননি।

"ভগবান এক ও অদ্বিতীয়ই শুধু ন'ন, মানুষও তার পিত্রৈশ্বর্যের পরিপূর্ণ অধিকারী, এই কথাই হিন্দু মুসলমানের আত্মিক প্রেরণার মহত্তর বাণী, মন্দর-মথিত বাসুকির ক্লান্তশ্বাসসমুত্থিত বিষবাষ্পচ্ছন্ন পৃথিবীতে দুই বিভিন্ন ভঙ্গীতে উচ্চারিত এই একই বাণী শোনাবার সময় তাদের সম্মুখে এগিয়ে এসেছে, এই শুভ লগ্নকে সে যেন মূঢ় সঙ্কীর্ণতার দ্বারা ভ্রষ্ট হ'তে না দেয়। এই শুভ কার্যের সম্পূর্ণ ভার বিশ্ব-সন্তানদের জননীদেরই প্রধানতঃ, যেহেতু ঐ অমৃতের পুত্ররা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁদেরই ত পুত্র। তাঁরাই তাঁদের অমৃত-পরিবেশনের পূর্ণ স্বত্বাধিকারিণী।

আধুনিক হিন্দী মহিলা লেখিকাদের মধ্যে সকলের নাম আমরা জানি না। যাঁরা খুব বিখ্যাত তাঁদের ভিতর প্রয়াগ মহিলা বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ শ্রীমতী মহাদেবী বর্মার নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর "নীহার", "যামা", "সান্ধ্যগীত" প্রভৃতি কবিতার বই হিন্দী সাহিত্যে বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ গল্পলেখক শ্রীপ্রেমচন্দের পত্নী শ্রীমতী শিবরাণী দেবী কবিতা লিখে, দিল্লীর শ্রীমতী সত্যবতী মল্লিক, মিরাটের শ্রীমতী হোমবতী দেবী এবং কাশীর শ্রীমতী ঊষা মিত্র গল্প লিখে হিন্দী সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করেছেন। এঁদের পূর্ববর্ত্তী যুগে শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী নামে আর একজন বঙ্গনারী হিন্দীতে লিখে যশস্বিনী হয়েছিলেন। কাশীর শ্রীশ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত আর্যমহিলা হিতকারিণী মহাপরিষদের এবং মহিলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সংস্থাপিকা এবং সর্বাধ্যক্ষ শ্রীমতী বিদ্যা দেবী কবিতা এবং সমাজ, শিক্ষা ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধীয় বহুসংখ্যক উচ্চাঙ্গের পুস্তকের রচয়িত্রী। এই উচ্চশিক্ষিতা দৃঢ় নিষ্ঠাবতী বালবিধবা বহু পুস্তিকা, ধার্মিক রচনা এবং শিক্ষা প্রচারেই তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গিত করেছেন।

যুক্তপ্রদেশের শিক্ষিত নারীদের মধ্যে দেশসেবিকা শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নাম সর্বাগ্রগণ্য। এদেশে তিনিই সর্বপ্রথম মহিলা মন্ত্রী। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তিনি বহুবার নির্যাতিতা এবং কারারুদ্ধা হয়েছেন। আজও দুর্ভাগ্য দেশের পক্ষ হয়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে তিনি যে সকল জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিচ্ছেন, তার ফলে ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সেখানকার লোকেদের আর কোন কথা জানতে বাকী নেই।[১৩] শাসকবৃন্দ শত বিরুদ্ধ প্রোপাগাণ্ডা করেও তার বেগকে রুদ্ধ করতে পারছেন না।[১৪] নেহরু পরিবারের মধ্যে আরও অনেকে,—যেমন শ্রীমতী কমলা নেহরু, কৃষ্ণা নেহরু, মিসেস উমা নেহরু, মিসেস ব্রিজলাল নেহরু, শ্রীমতী শ্যামকুমারী নেহরু বিদ্যাবত্তায়, দেশসেবায় এবং সামাজিক প্রচেষ্টায় খ্যাতি লাভ করেছেন।

পূর্বেই বলেছি, বোম্বাই অঞ্চলে মিসেস হংসা মেহতা একজন খ্যাতিসম্পন্ন লেখিকা। প্রস্তাবিত হিন্দু কোড সম্বন্ধে তাঁর পুস্তকখানি উল্লেখযোগ্য। কোন পুরুষ এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিবার পূর্বেই তিনি হিন্দু আইন সংস্কার সম্বন্ধে পুস্তিকাটীতে আলোচনা করেছিলেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। তিনি হিন্দী, উর্দ্দু, এবং ইংরাজীতে কবিতা রচনা ক'রে এবং অজস্র বক্তৃতা দিয়ে "বুলবুল-ই-হিন্দ" আখ্যা লাভ করেছেন। তাঁর দেশসেবার কথা বিশেষভাবে এখানে বলতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীহারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়ও দক্ষিণ ভারতে সুপণ্ডিতা ও সুবক্ত্রী বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। শ্রীমতী এণাক্ষী রামা রাও, দর্শন কাব্য এবং নৃত্যগীত সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখে খ্যাতি পেয়েছেন। বোম্বাই-এর সরলা দেবী সংস্কৃতজ্ঞা এবং সুপণ্ডিতা।

সিন্ধু প্রদেশে কিকি বেন "ইত্তিহাদ" লিখে এবং গুলি সাদারঙ্গানি বিভিন্ন গ্রন্থ লিখে খ্যাতি লাভ করেছেন। মধ্য প্রদেশের হিন্দী কবিদের মধ্যে শ্রীমতী সুভদ্রাকুমারী চৌহানের নাম উল্লেখযোগ্য। ভূপালের ভূতপূর্ব বেগম সাহেবারও শিক্ষিতা নারীপ্রসঙ্গে

নাম করতে হয়। শ্রীমতী অনসূয়া বাই কালে ব্যবস্থাপক সভার প্রথম মহিলা সদস্য। তাঁহার পরে অবশ্য বিভিন্ন প্রদেশে আরও অনেক মহিলা উক্ত পদ লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ পরিষদের ডেপুটি স্পিকার বা প্রেসিডেন্টের পদ ও সমলঙ্কৃত করেছেন, যেমন মান্দ্রাজ প্রদেশে মিসেস রুক্মিণী লক্ষ্মীপতি, মধ্যপ্রদেশে মিসেস কালে, আসামে মিসেস জুবেদা আতাউর রহমান। আসাম প্রদেশে বর্তমানে একজন মহিলা মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিতা আছেন, তাঁহার নাম মিস সেভিস ডান লাইংডো। ইনি জাতিতে খাসিয়া, খৃষ্ট ধর্মাবলম্বিনী।[১৫]

সুপণ্ডিতা মুসলিম নারী বেগম সাহ নওয়াজ পূর্বে দেশভক্ত ও কংগ্রেসপন্থী ছিলেন; এক্ষণে সম্প্রদায়গত স্বার্থের খাতিরে মুসলিম লীগের পক্ষপাতী হয়েছেন। বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে (১৯৩০-৩২ খৃঃ) তিনি, মিসেস রাধাবাই সুব্বারাওন এবং একজন ব্রহ্মদেশীয়া মহিলা উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় নারীর ভোটাধিকার লাভের জন্য ইহাঁদের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। এর পূর্ববর্তী যুগে অর্থাৎ মণ্টেগু চেম্‌সফোর্ড রিফর্মের সময় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই হ’তে পার্সী মহিলা মিসেস হীরা বাই টাটা এবং তাঁহার কন্যা মিস নিঠম্ টাটা ভারত নারীর ভোটাধিকার লাভের জন্য আন্দোলন করতে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, মিস টাটাই প্রথম ভারতীয় মহিলা ব্যারিষ্টার। বর্ত্তমানে তিনি বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যবসায় রত আছেন। তাঁর পূর্বে মিস কর্ণেলিয়া সোরাবজী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রশংসার সহিত আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও এবং ব্যারিষ্টার হ’লেও তাৎকালীন প্রথামত প্রাক্‌টিস করতে অধিকারিণী ছিলেন না। এদেশের কোর্ট অব ওয়ার্ডের পর্দানসীন মহিলাবৃন্দের আইন-বিষয়ক পরামর্শদাত্রী রূপে দীর্ঘকাল তিনি কৃতিত্বের সহিত কাজ করে গেছেন। ইংরাজীতে কবিতা রচনা করেও তিনি যশ লাভ করেছিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দেও কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করবার অনুমতিলাভ মিস রেজিনা গুহর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু বিগত মহাসমরের অবসানের পর বাধা অপসারিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন প্রদেশে অনেকগুলি মহিলা ব্যারিষ্টার বা উকিল হ’তে পেরেছেন।—মিস সীতা দেবদাস, মিসেস ধরমশীলা লাল (বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ব্যারিষ্টার পরলোগত কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল মহাশয়ের কন্যা), বেগম ফরুকি, মিস টিওসুন কিম, আভা মেহেতা, ভিঘু বাটলিওয়ালা এঁরা ব্যারিষ্টার এবং শ্রীমতী সুধাংশুবালা হাজরা, শ্যামকুমারী নেহরু, বেগম সখিনা মুঈদজাদা, আনা চণ্ডী, মিস কর্থি অম্মল, বিমলা দেশমুখ এঁরা হলেন উকিল।

ভারতকে ভালবেসে ভারতবাসীকে আপনার করে নিয়ে যে কয়েক জন মনস্বিনী বিদেশিনী মহিলা ভারতের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের মধ্যে মাদাম ব্লাভার্টস্কি, ভগিনী নিবেদিতা, এনি বেসান্ত এবং মহাত্মা গান্ধীর শিষ্যা মিস স্লেড বা মীরা বেনের নাম উল্লেখযোগ্য। শুধু স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা বা রামকৃষ্ণমিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা বলে নয়, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু প্রমুখ আধুনিক বাংলার শ্রেষ্ঠ পুরুষদের জীবনে ভগিনী নিবেদিতার প্রভাব এবং প্রেরণা অসামান্য। রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। ‘তাঁর কাছে যে প্রেরণা পেয়েছি তা আর কারো কাছে

পাইনি। তাঁর চরিত্র স্মরণ ক'রে তাঁর প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব ক'রে প্রচুর বল পেয়ে থাকি।'

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পর বিদেশী সাহিত্যের আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের ইংলণ্ডের কথা মনে পড়ে। ইংলণ্ডের সাহিত্যক্ষেত্রে বাংলাদেশের মতোই নারীর আবির্ভাব খুব বেশী দিনের নয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে শ্রীমতী বেন্ আফ্রা নাম্নী একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহিলা দ্বিতীয়চার্ল্‌সের গুপ্তচর ছিলেন। ওরুনোকো (১৬৭৮) নামক উপন্যাসখানিতে তিনি নিগ্রোদের কথা প্রথম লেখেন এবং তারা যে মানুষ সে কথা সভ্য শ্বেতাঙ্গ-সমাজকে স্মরণ করিয়ে দেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মিসেস অ্যান্-র‍্যাড্‌ক্লিফের "উডল্‌ফোর অলৌকিক রহস্য" (১৭৯৪) একখানি বিখ্যাত রোমাঞ্চকর উপন্যাস। এই ধরণের দু'চারখানি বই এবং খুব প্রাচীন কালের পল্লীগাথা ছাড়া ইংরাজী সাহিত্যে ওযুগে নারীর কোনো লেখা আমরা পাই না; এর কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অন্যান্য দেশের মতো ইংলণ্ডের মেয়েদেরও বেশী লেখাপড়া শেখার প্রথা ছিল না, বই লেখা তো দূরের কথা। ইংলণ্ডের প্রথম সুলেখিকা ফ্যাণি বার্ণির জন্ম ১৭৭২ সালে। বাল্যে অত্যন্ত নির্বোধ বলে কুখ্যাত ছিলেন, আট বছর বয়সে বর্ণমালা শিখ্‌তে না পারায় তাঁকে আত্মীয়-বন্ধু অনেকেরই গঞ্জনা সহ্য কর'তে হয়েছে। তারপর তিনি যখন পড়তে শিখলেন, তখন বই পড়া তাঁর নেশা হ'য়ে দাঁড়াল, আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর নিজের রচনাও আরম্ভ হ'ল। যখন তাঁর ষোলো বছর বয়স তখন তিনি এক রাশ গল্প-উপন্যাস লিখেছেন এবং আরও লেখার চেষ্টায় আছেন দেখে তাঁর সৎমা বিরক্ত হয়ে তাঁকে বোঝালেন, উপন্যাস লেখা ভদ্রমহিলার পক্ষে অমর্যাদাকর। ফ্যাণি সেদিন মনের দুঃখে সমস্ত লেখাগুলি আগুনে পুড়িয়ে ফেললেন এবং 'ভদ্রমহিলা' হ'বার জন্য কিছুদিন উঠে পড়ে লাগ্‌লেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞা বজায় রইল না, আবার তাঁকে লিখ্‌তে হ'ল! এবার অবশ্য খুব গোপনে, বাবার এবং সৎমার অজ্ঞাতসারে। তাঁর প্রথম গল্প "ভেলিনা" সংগোপনে একজন প্রকাশককে নামমাত্র মূল্যে বিক্রী করা হয়, কিন্তু তাঁর প্রতিভা গোপন রইল না। ডাক্তার জনসন বইখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন, বাণী শার্লোট তাঁকে রাজবাড়ীতে চাকরী দিলেন, তাঁর বাড়ীতে সে যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সভা বসল। "সিসিলিয়া" "ক্যামিলা" "ভ্রাম্যমাণ" প্রভৃতি বইতে সে যুগের ধনী ও দরিদ্র সমাজের বাস্তবচিত্রগুলি সহজ ভাষায় অতি সুন্দর ফুটেছে। পরবর্তী জীবনে দেশত্যাগী ফরাসী সেনাপতি দার্‌ব্লে'কে বিবাহ করে ফ্যাণি মাদাম দার্‌ব্লে নামে পরিচিত হন। পরবর্তী সুবিখ্যাতা লেখিকা মারিয়া এজওয়ার্থ ছিলেন ফ্যাণির পিতৃস্বসা। ছোটো বেলায় তাঁর বাবা তাঁকে বাধা না দিয়ে সাহায্য করতেন, দু'জনের জীবনে এই যা' তফাৎ। মারিয়ার প্রথম বই "কার্যোপযোগী শিক্ষা" তাঁর বাবার সঙ্গে একত্রে লেখা। তার পর তাঁর অনেক প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস বেরিয়েছে, তার মধ্যে 'র‍্যাক্রেণ্ট প্রাসাদ', 'অনুপস্থিত' এবং 'অরমণ্ড'

বিখ্যাত। তাঁর লেখা আইরিশ জীবনের ছবিগুলি তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তির এবং সহৃদয়তার পরিচায়ক। বিরাশী বছর বয়সে তিনি স্প্যানিস্ ভাষা শিখ্‌তে আরম্ভ করেন, তাঁর জ্ঞান-পিপাসা এমনি তীব্র। সেই বছরই মৃত্যু এসে তাঁর সাধে বাদ সাধলো। শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'ল না। এর পরবর্তী লেখিকা জেন অষ্টেনের নাম পৃথিবী-বিখ্যাত। এঁর পিতা ছিলেন রেক্‌টর, তাঁর ছাত্রদের এবং ভাইয়েদের সঙ্গে জেনও বাল্যে সুশিক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁর সময়ে তাঁর মতো বহু ভাষাবিৎ নারী ইংলণ্ডে বেশী ছিল না, লেখার শক্তিও ছিল তাঁর অসামান্য। ঘরে অনবরত অতিথিসমাগম, তাঁদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে জেন অবলীলাক্রমে লিখে যেতেন। তাঁর সমস্ত লেখার মধ্যে অনাবিল হাস্যরসের যে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা বয়ে চলেছে তার তুলনা বিরল। তাঁর একুশ বছর বয়সের লেখা "চিন্তা ও ভাবালুতা" তাঁর প্রথম বিখ্যাত রচনা। তাঁর সব চেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস "গর্ব ও কুসংস্কার" এবং আর দুটি বই—"এমা" এবং "ম্যান্সফিল্ড" তাঁর জীবিত কালেই ছাপা হয়, তাঁর শেষ দুখানি বই 'নর্দ্যাঙ্গারের মঠ' এবং "প্ররোচনা" তিনি মুদ্রিত দেখে যেতে পারেন নি। বেঁচে থাকতে তিনি কোনো বইয়ে তাঁর নাম দেন নি, কারণ খ্যাতিতে তাঁর লোভ ছিল না। শতবর্ষ পূর্বের ইংলণ্ডের গ্রাম্য চিত্র তাঁর বইয়ে যেমন জীবন্ত হ'য়ে দেখা দিয়েছে এমন আর কোথাও নয়। সার ওয়াল্টার স্কট তিনবার তাঁর 'গর্ব ও কুসংস্কার' পড়েছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন বড় বড় ঘটনা নিয়ে বড় বড় কথা আমি কারো চেয়ে মন্দ লিখি না, কিন্তু অতি সাধারণ বিষয়বস্তু এবং চরিত্রকে যে নিপুণ স্পর্শ শুধু সত্যনিষ্ঠা এবং সহৃদয়তার জোরে অপূর্ব আকর্ষণীয় বস্তু করে তোলে, সে শক্তি আমার নেই। খৃষ্টীয় আঠারোশ' সতেরো সালে মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে জেনের মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের মানসক্ষেত্রে এক যুগপরিবর্তন হয়ে গেছে। জেন পোর্টার নাম্নী এক লেখিকা শুধু নারী বলেই তাঁর 'ওয়ারস্ নগরের থ্যাড্‌ডিয়ম' লিখে আঠারোশ' তিন খৃষ্টাব্দে প্রচুর সম্মান লাভ করেন। উর্টেমবের্গের গ্রাণ্ড ডিউক তাঁকে সেণ্ট জোয়ালিসের 'পূজারিণী' উপাধি দেন। আজ তাঁর বইয়ের পূর্বসমাদর না থাক্‌লেও স্কটের বহুপূর্বে তিনি 'স্কটল্যাণ্ডের নেতা' লিখে পথ দেখিয়েছেন, একথা মানতে হয়। তাঁর বোন 'আনামারিয়া' সে যুগে যথেষ্ট সম্মান পেয়েছিলেন। আজ তাঁর বই কেউ পড়ে না। এঁদের পরবর্তী লেখিকা মেরী মিটফোর্ড কবিতা, নাটক, গ্রাম্যচিত্র সব রকম লেখাই লিখেছেন। লেখাই ছিল তাঁর জীবিকা উপার্জনের উপায়। খৃষ্টীয় সতেরোশ' সাতাশি সালে জন্মে আঠারোশো পঁচাশি সালে তিনি মারা যান। তাঁর দশবছর বয়সে তাঁর নামে লটারির টিকিট কিনে তাঁর বাবা তিনলক্ষ টাকা পেয়েছিলেন। সে টাকা তিনি দু'দিনে উড়িয়ে দেন। এদিকে সুদীর্ঘ জীবন মেরীকে কাটাতে হয়েছিল তাঁর লেখনীর উপর নির্ভর করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বিখ্যাত লেখিকা মিসেস এলিজাবেথ গ্যাস্কেলের 'মেরী বার্টন' তাঁর আটত্রিশ বছর বয়সে প্রথম প্রকাশিত হয়। এঁর লেখার বিশেষত্ব এঁর বস্তু-তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। এঁর পূর্ববর্তিনীরা জীবনের বর্ণনায় কল্পনায় রং ফলিয়েছেন, ইনি যা' স্বচক্ষে দেখেছেন তার বাইরে এক পা যাননি। এঁর লেখা "শার্লোট ব্রঁতে"র জীবনীর মতো সুলিখিত জীবনী ইংরেজী সাহিত্যে বেশী নেই, কিন্তু এই লেখার জন্য এত লোক তাঁর কাছে এত রকম অভিযোগ করেছে, যে বিরক্ত হয়ে মরবার আগে অনুরোধ করে গেছেন, যেন তাঁর জীবনী লেখা না হয়। পরবর্তী লেখিকা এলেন প্রাইস বাল্যে লেখিকা

হ’বার কোন লক্ষণই দেখাননি। অল্পবয়সে বিধবা হয়ে তিনি ফ্রান্স থেকে ফিরে আসেন এবং সময় কাটাবার জন্য লিখতে আরম্ভ করেন। ছেচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম গল্প “ডেন্সবেরী হাউস” ছাপা হয়, এক মদ্যপান-নিবারিণী পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্য। পরবৎসর তাঁর ‘ইষ্টলিন’ বার হল। এই করুণ কাহিনী পঞ্চাশ বৎসর ধরে ইংরাজী সাহিত্যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে আজ অনেকটাই অনাদৃত। মানুষের রুচি বদলেছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বদলেছে। ঘরে ভাত, মনে শান্তি এবং সংসারে সুখ থাক্‌লে মানুষ বই পড়ে কেঁদে মুখ বদল কর’তে পারে, জীবন যখন অশান্তিতে দৈন্যে অশ্রুতে ভরে উঠে, তখন বিয়োগান্ত কাব্য-নাটকের মূল্য থাকে না। তখন অশ্রু-সজল মন হাসানর জন্য প্রয়োজন হয় মিলনান্ত কাব্য-নাটকের লেখকদের। যাঁরা বুদ্ধিমান্ তাঁরা চিরদিনই তাই মধ্যপন্থী, তাঁদের বাজার দর খুব বেশী না উঠুক, খুব বেশী নেমেও পড়ে না কোনদিন। মিসেস উডের “ইষ্টলিন”, “চানিংস্”, “রোল্যাণ্ড ইয়র্ক” “পোমরয় অ্যাবি” “লর্ডহালিবার্টনস্ ডটার্স্” প্রভৃতি করুণ কাহিনীর উপন্যাসগুলি স্বদেশে অপাংক্তেয় হ’বার পরেও বাংলা দেশে বহু শিক্ষিত নারী পুরুষকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছে এ কথা আদৌ অস্বীকার করা যায় না। এঁর লেখা বিস্তর বই আছে, অন্ততঃ কুড়ি পঁচিশের কম সংখ্যার হবে না। মিসেস্ উডের পর তিন জন বিখ্যাত লেখিকা ছিলেন, তিন ভগ্নী, শার্লোট ব্রঁতে, এমিলি ব্রঁতে এবং অ্যানব্রঁতে। তিনটি বোনই ছিলেন চিররুগ্না। অল্প বয়সে মাতৃহীন এই মেয়েরা দরিদ্র এবং গম্ভীর প্রকৃতি পিতার সাহচর্যে, আ-মৃত্যু গ্রাম্য জীবন যাপন করেছেন। একবার তাঁদের বেলজিয়মে যাবার সুযোগ হয়েছিল এবং কিছুদিন ধরে বোর্ডিংএ বাস করবার সৌভাগ্য হয়েছিল, এ ছাড়া বহির্জগতের সংশ্রব তাঁদের জীবনে বড় একটা ছিল না। এঁরা বেনামীতে লিখতেন, শার্লোটের “জেন আয়ার” প্রসিদ্ধি লাভ করবার পরেও অনেকের ধারণা ছিল ঐ বইটীর লেখক “কুরার বেল” একজন পুরুষ। শার্লোটের “জেন আয়ার” ছাড়া “শার্লি” এবং “ভিলেট” “অ্যাগনেস্” “অ্যানেস গ্রে” “এমিলি উথেরিং হোইট্স্” ইংরেজী সাহিত্যের সম্পদ্। শার্লোটের একমাত্র জীবিত ভাই এবং এমিলি ও অ্যান একবৎসরের মধ্যে মারা গেলেন, বৃদ্ধ শোকার্ত পুরোহিত পিতাকে নিয়ে বাড়ীতে শার্লোট একা পড়লেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি তখন সুপ্রতির্ষ্ঠিত, বহু সম্মান এবং বহু সুখ তাঁর ইঙ্গিতমাত্রে সেদিন করতলগত হ’তে পারত, কিন্তু সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। মৃত্যুর পূর্ববৎসর তিনি বিয়ে করেছিলেন, তাঁর পিতার সহকারী পুরোহিতকে। জীবনে কয়েক মাসের জন্য মাত্র তিনি সুখী হয়েছিলেন। ঊনচল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। পরবর্তী লেখিকা মরিয়াম ইভান্স শুধু সুলেখিকা এবং সুগায়িকা বলে নয়, সুপণ্ডিতা বলেও বিখ্যাত ছিলেন। বাইশ বছর বয়সে জার্মান ভাষা থেকে “যীশুর জীবন” অনুবাদ করে তাঁর সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ হয়। কভেণ্ট্রি’তে বাল্য জীবন কাটিয়ে পিতার মৃত্যুর পর তিনি কিছুদিন বিদেশ ভ্রমণ ক’রে লণ্ডনে আসেন। তাঁর পুরুষোচিত চালচলন এবং মতামত সে যুগে বিস্ময়ের বস্তু ছিল। এবারে লেখা এবং অনুবাদ করা তাঁর জীবিকা হয়েছিল। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম গল্প “অ্যামোস্ বার্টনের দুর্ভাগ্য” বাহির হয়। তাঁর ছদ্মনাম ‘জর্জ ইলিয়ট’ দেখতে দেখতে দেশবিখ্যাত হ’য়ে উঠে। তাঁর “অ্যাড্যাম বিড্”, চল্লিশ বৎসর বয়সে প্রকাশিত হয়। এর পর অনেক উপন্যাস তিনি লিখেছেন। “ফ্লস্ নদীতীরের কলবাড়ি”,

(মিল অন দি ফ্লস্) "সাইলাস মার্ণার" "রমোলা" প্রভৃতি উপন্যাসে যে পাণ্ডিত্য ও ভূয়োদর্শন, যে অপূর্ব চরিত্র-চিত্রণ-শক্তি এবং যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তার তুলনা যে কোনো সাহিত্যেই দুর্লভ। ইংলণ্ডে তাঁর আগে বা তাঁর পরে তাঁর চেয়ে বড় লেখিকা আজ পর্যন্ত কেউ জন্মাননি। উপন্যাসকে একাধারে আনন্দ বিতরণে এবং মান -চরিত্র ও মানব-জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণে তিনি সর্ব প্রথম কাজে লাগান, সেদিক দিয়েও তাঁর নাম চিরস্মরণীয়। জর্জ ইলিয়টের পরবর্তী লেখিকারা কেউই শার্লট, ব্রঁতে, জেন অষ্টেন বা ইলিয়টের সঙ্গে একাসনে স্থান পাবার যোগ্যা নন। তাঁদের সংখ্যাও যেমন বেড়ে গেল, শক্তিও তেমনি ক'মে গেল দেখা যায়। মিসেস লিন্‌লিপ্টন, শার্লোটইয়ং, মারিয়া মলক, মিসেস অলিফ্যাণ্ট, এড্‌না লায়েল এবং মারীকরেলির নাম এই সমস্ত লেখিকাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। শার্লোট ইয়ং "রেডাক্লফের উত্তরাধিকারী", "কীর্তি কথা", প্রভৃতি যে সব বই লিখে বিখ্যাত হন, তার লাভের অধিকাংশ টাকাই ধর্মপ্রচারের সাহায্যের জন্য ব্যয় করতেন। "ডেজিফুলের মালা" লিখে তিনি ত্রিশ হাজার টাকা পেয়েছিলেন, সেই সমস্ত টাকা নিউজিল্যাণ্ডে এক মিশনারি কলেজ স্থাপন করতে খরচ হয়। তিনি মোট একশ' কুড়িখানি গল্পের বই লেখেন, সব কটিরই যথেষ্ট বিক্রি ছিল সে সময়ে। মারিয়া মলকের বিখ্যাত বই "জনহালিফ্যাক্স্-ভদ্রলোক" তাঁকে স্মরণীয় ক'রে রাখবে। প্রবন্ধ এবং কবিতা লেখাতেও তাঁর দক্ষতা কম ছিল না। মিসেস অলিফ্যাণ্টের বহু গল্প উপন্যাস এক সময় ইংলণ্ডের সাময়িক পত্রকে সমৃদ্ধ করেছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি পথে দাঁড়ান; তিন হাজার টাকার জীবন-বীমা এবং পনেরো হাজার টাকা দেনা রেখে তাঁর স্বামী মারা যান। কারো দয়া ভিক্ষা না করে শুধু নিজের লেখনীকে সম্বল করে তিনি এই বিপুল ঋণ শোধ করেছেন, সংসার চালিয়েছেন, সকলের প্রতি সব কর্তব্য করেছেন। তাঁর ভাষায় মাধুর্য ছিল। ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে লেখবার সুন্দর শক্তি ছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর নাম হয়তো চিরস্মরণীয় হবে না, কিন্তু মনুষ্যত্বের সম্মান যতদিন আছে ততদিন এই তেজস্বিনী নারী সমস্ত শিক্ষিতা মহিলার আদর্শ স্বরূপা হ'য়ে থাকবেন। মারী করেলি নামক লেখিকার (১৮৬৪-১৮২৪) "বারাব্বাস", "শয়তানের দুঃখ", "স্বর্গের ঐশ্বর্য", "ইটারনাল লাইফ", 'মাইটী অ্যাটম্" প্রভৃতি উপন্যাস এর পরবর্তী স্থান লাভ করে। এই প্রসঙ্গে ইংরেজী গীতি-কবিতা রচয়িত্রীদের দু'চারজনের নাম উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে লেডী অ্যান লিণ্ডসের "বুরো রবিণ গ্রে" যখন দেশবিখ্যাত হ'ল, তখন লেখিকার নাম কেউ জান্‌ত না, এডিনবার্গের এক সাহিত্য-পরিষদ্ এই গানের রচয়িতার' সন্ধান করবার জন্য তিনশ' টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। শেষে লিণ্ডসে ধরা পড়ে কৈফিয়ৎ দিলেন এই বলে, "যারা লিখতে পারে না তাদের লজ্জা দিতে ভালবাসি না বলেই আমি লিখতে ভয় পাই।" সে যুগে আমাদের ইদানীন্তন শত বর্ষ পূর্বের মতই সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের লেখা ছাপা হওয়া লজ্জার কথা ছিল। এই যুগে স্কচ লেখিকা লেডি সেয়ার্ণ "যুবরাজ চার্লি" সম্বন্ধে কয়েকটি বিখ্যাত গান এবং "লিলের দেশ" প্রভৃতি লেখেন এবং আইরিশ লেখিকা মিসেস্ ক্রফোর্ড "ক্যাথলিন

মাভুর্নিন” লিখে বিখ্যাতা হন। এই গানটির কপিরাইট কিছুদিন আগে ন’হাজার টাকায় বিক্রি হ’য়েছে। লেডি জন স্কটের ‘অ্যানি লরি’ গানটি একটি পুরানো গানের নবরূপ মাত্র।

ইংলণ্ডের নারী কবিদের খুব পুরাণো ইতিহাস আমরা জানি না। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে নারী কবিরা নিজেদের লেখা কবিতা প্রথম সাধারণের পড়বার জন্য ছাপাতে সাহস করেন। কবি হিসাবে যাঁরা ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে মিসেস্ ফেলিসিয়া হিম্যান্স্, এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং, অ্যাডেলেড প্রক্টার, জিন ইজেলো, ক্রিষ্টিনা রসেটি, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মিসেস্ হিম্যান্সের জন্ম হয় ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে চৌদ্দ বছর বয়সে ছেপে তাঁর প্রথম কবিতার বই প্রশংসা পায় নি। ঊনিশ বছর বয়সে এক আইরিশ ক্যাপ্টেনকে এই বীর পূজারিণী বরমাল্য দান করেন, কিন্তু স্বামী তাঁর প্রেমের মর্যাদা রাখেন নি। ছ’ বছর পরে পাঁচটি শিশু সন্তান সহ ফোলসিয়াকে ছেড়ে তিনি ইতালিতে পালিয়ে যান, আর ফেরেন নি। পিতৃশোক, ভ্রাতৃশোক প্রভৃতি সহ্য করে এই পতিপরিত্যক্তা নারী শুধু কবিতা লিখে সংসার চালাতে আরম্ভ করেন, নিজেকে নিঃশেষ ক’রে তিনি সন্তানদের সুখী করতে চেয়েছিলেন। তাঁর “কাসাবিয়াঙ্কা”, “এক পরিবারের বিভিন্ন সমাধি”, “শিশুর প্রথম দুঃখ”, “ইংলণ্ডের সমৃদ্ধ সংসার” প্রভৃতি শত শত কবিতা সেদিন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। মধুর এবং করুণ রসে অসামান্য কৃতিত্ব দেখালেও তাঁর কাব্যে শক্তি সঞ্চার এবং গভীরতার অভাব ছিল, অতিরিক্ত পরিশ্রমে অল্প বয়সেই ইনি মারা যান।

পরবর্তী বিখ্যাতা কবি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিংয়ের খ্যাতি সমসাময়িক বহু পুরুষ-কবিকে ঈর্ষান্বিত করেছিল। তাঁর “দেবদূত” ও অন্যান্য কবিতা ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বার হয়। তার দু’ বছর পরে তিনি অসুস্থ হয়ে ছ’ বছর শয্যাশায়ী ছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত কবি রবার্ট ব্রাউনিংয়ের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ ও সাক্ষাৎ হয়। প্রথম দশ দিনেই দু’জনে প্রেমে পড়েন। বাবা বিয়েতে মত না দেওয়ায় এলিজাবেথ পালিয়ে গিয়ে ব্রাউনিংকে বিয়ে করেন। মিসেস ব্রাউনিংএর “পতুগীজ হইতে সনেট” এই যুগের লেখা। প্রেমের কবিতা লিখেই তিনি বিশ্বসাহিত্যে অমর হ’য়ে আছেন। ইটালি প্রবাস কালে অষ্ট্রিয়ার শাসনে জর্জরিত ইটালির প্রতি সহানুভূতি তিনি তাঁর কবিতায় প্রকাশ করেছেন। আ-মৃত্যু স্বামী সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী এই চিররুগ্না নারীর ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সে ফিয়েমৎসে নগরে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর বিখ্যাত “শেষ কবিতা” প্রকাশিত হয়েছিল। দৈহিক দুঃখ এবং মানসিক সুখের বিচিত্র সংঘাত তাঁর জীবনে ছিল, কাব্যেও তা’ প্রতিফলিত হয়েছে। এর পরবর্তী নারী কবিদের মধ্যে এলিজাকুকের “পুরাণো আরাম-কেদারা”, “রাজাক্রুস”, “মাকড়সা” প্রভৃতি কবিতা এবং মিসেস আলেকজাণ্ডারের “সকল পদার্থ সুন্দর উজ্জ্বল” প্রভৃতি লেখা বিখ্যাত।

ইংলণ্ডের পরেই আমেরিকার নারী লেখিকাদের কথা বলা দরকার, কারণ তাঁদের লেখাও ইংরেজী সাহিত্যেরই অন্তর্গত। ইংলণ্ডের সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর আমেরিকার

ভাষার ঐক্য থাকলেও দেশের অবস্থার কোনো দিক দিয়েই মিল্ ছিল না। চারিদিকে অজ্ঞাত অরণ্য, হিংস্র শ্বাপদ এবং প্রতিহিংসা-পরায়ণ আদিম অধিবাসীরা যে কোনো মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে। ভালো পথঘাটেরও একান্তই অভাব। এ সময়ে যে সমস্ত দুঃসাহসিক পরিবার সে দেশে বাস করতেন, তাদের পুরুষদের বাইরের কাজের পর অবসর কম ছিল, মেয়েদের গৃহকার্যেরও তেমনি ছুটি ছিল না। এরই মধ্যে সেলাই, কাপড় বোনা, রান্না প্রভৃতির ফাঁকে দু' চারজন যে কিছু লিখতেন না তাও নয়; তবে তার ধারাবাহিক ইতিহাস আমাদের জানা নেই। লেখার আগে বই পড়ার রেওয়াজ খুবই ছিল, কেন না নির্জন দেশে বইয়ের চেয়ে ভাল সঙ্গী বেশ মিলে না। যাঁরা সময় পেতেন ক্রমে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখতেও আরম্ভ করলেন। এই প্রথম যুগের লেখিকাদের মধ্যে এমা সার্তদয়র্থ সব চেয়ে প্রসিদ্ধ। তাঁর বইয়ে বিচিত্র রোমাঞ্চকর ঘটনা সমাবেশ এবং ভাবপ্রবণতার পরিচয় থাকলেও মানব-চরিত্র সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টির অভাব ছিল, তাই আজ তাঁর উপন্যাসগুলির আদর কমে গেছে। কুমারী বয়সের নাম ডরথি এলিজা সেভিউ। জন্ম হয় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে, অল্প বয়সে দু'টি ছেলে মেয়ে নিয়ে সংসার চালাবার জন্য তাঁকে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিতে হয়। সাময়িক পত্রিকায় ক্রমে তাঁর লেখা ছাপা হতে থাকে। পাঠকের উচ্চ প্রশংসার সঙ্গে অর্থাগমও শুরু হয়। চাকুরী ছেড়ে দিয়ে তিনি তখন লেখাই পেশা করেন। একে একে আটষট্টিটি উপন্যাস লেখেন। "পরিত্যক্তা স্ত্রী", "ক্লিফটনের অভিশাপ", "হারাণো উত্তরাধিকারিণী" প্রভৃতি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর দেশের, তাঁর সময়ের পাঠকের জন্যই লিখেছিলেন, এ কথা মনে রাখলে আমরা তাঁর প্রতি সুবিচার করতে পারব। তাঁর সমসাময়িক সুপণ্ডিতা মার্গারেট ফুলার দশ বছর বয়সে ল্যাটিন এবং তেরো বছর বয়সে গ্রীক শিখেছিলেন। প্রবন্ধ এবং ভ্রমণ-কাহিনীর সঙ্গে তাঁর চিঠি লেখারও নিপুণতা ছিল। সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারতেন, বহু সাহিত্যিক নিয়ে মজলিস করতেন। এই অসাধারণ শক্তিমতী নারী ইটালীয় এক কাউণ্টকে বিবাহ ক'রে প্রবাসী হন এবং ফেরার পথে জাহাজডুবি হ'য়ে মারা যান। আজ তাঁর নাম পর্যন্ত লোপ পেতে বসেছে। এই সময় একজন লেখিকার নাম আমরা পাই,— যাঁর দান শুধু সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হ'য়ে থাক্‌বে। মিসেস হারিয়েট ষ্টাউয়ের জন্ম ১৮১১ খৃষ্টাব্দে। বিবাহের পর এই আদর্শ গৃহিণী এবং আদর্শ মাতা গৃহকার্যের পর অবসর খুবই কম পেতেন, সেই বিরল অবসরে তিনি "ড্রেড্", "পুরাণো সহরের লোক" প্রভৃতি বই লিখে যশোলাভ করেন। দাস জীবনের দুঃখ নিয়ে তিনি "টমকাকার কুটীর" বইখানি লিখেছিলেন, অন্তরের সমবেদনা দিয়ে। সেই একখানি বই ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ খণ্ড বিক্রি হয়, পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হ'য়ে সর্বত্র সহৃদয় মানুষকে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে সচেতন ক'রে তোলে। এর দ্বারা যে আন্দোলন আরম্ভ হয় তার পরিসমাপ্তি হয় প্রায় সমস্ত পৃথিবী থেকে দাসত্ব প্রথার বিলোপে, বিভিন্ন দেশে কোটি কোটি চির-পরাধীন নির্যাতিত নরনারীর পরিত্রাণে। এত বড় পুণ্যকার্যের মূলে একজন মাত্র সহৃদয়া নারীর প্রেরণা ছিল, একথা ভাবলেও গভীর আনন্দ হয়।

সে যুগের আমেরিকার মেয়েরা গল্পের চেয়ে কবিতাই বেশী লিখতেন, কিন্তু কবিতা লিখে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করতে কেউই বড় একটা পারেন নি। যে দু'চার জনের স্থান আজও ইংরেজী সাহিত্যে আছে, তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন অ্যালিস কেরীয়া। তাঁদের অল্প বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়, বিমাতা এসে সব সময় সদয় ব্যবহার করেননি, দিনের বেলা কাজ ছিল, রাত্রে বাতি জ্বেলে কবিতা লেখা নিষেধ ছিল। ফেলে দেওয়া চর্বিতে ছেঁড়া কাপড়ের সল্‌তে জ্বালিয়ে তাঁরা প্রয়োজন মতো লেখা পড়া করতেন। অ্যালিসের যখন বত্রিশ বছর এবং কিরির আটাশ বছর বয়স, তখন তাঁরা নিউ ইয়র্কে ভাগ্যানুসন্ধানে আসেন। কাগজে গদ্য পদ্য লেখা ছাপিয়ে এবং বাড়ীতে সাহিত্য-সভা বসিয়ে তাঁরা অল্প দিনেই বিখ্যাতা হন। তাঁদের লেখার মধ্যে উপাসনার স্তোত্রগুলিই প্রধান, অ্যালিসের আঠারো বছর বয়সের রচনা "একটি মধুর গভীর চিন্তা"এর মধ্যে সব চেয়ে বিখ্যাত। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কিরির মৃত্যু হয়, অ্যালিস ভগ্নীশোকে অল্পদিন পরেই মারা যান। তাঁদের ধর্মভাবদ্যোতক কবিতা ও প্রার্থনার গানগুলি এখন পর্যন্ত ইংরেজী-ভাষাভাষী জগতে বহু শোকার্তকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। বর্তমান যুগে আমেরিকায় নারী কবির অভাব নেই,— তবে পৃথিবীব্যাপী যশের অধিকারিণী—তাঁরা কেউই এখনও পর্যন্ত হন নি, সুতরাং আমরা তাঁদের কথা বলতে পারলাম না। গল্প উপন্যাস লিখে আর যে ক'জন ঊনবিংশ শতাব্দীতে খ্যাতি লাভ করে গেছেন তাঁদের মধ্যে মারিয়া সুসানা ক্যাথিডের বিখ্যাত বই "মশাল্‌চি" (Lamp lighter) ১৮৫৪ সালে ছাপা হ'বার দু'মাসের মধ্যে চল্লিশ হাজার খণ্ড বিক্রয় হয়। ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় আজও এই বইখানির সমাদর আছে। অগষ্টা ইভা বই লিখে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। তাঁর "সেণ্ট এলমো" "টাইরিফসের কবলে" "বিউলা ইনফেলিত" প্রভৃতি বই প্রকাশকরা প্রচুর টাকা দিয়ে কিনেছিলেন। একমাত্র "বস্তি" বইখানির জন্য তিনি পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা পান। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় ইনি সোবাইল সহরে আহত সৈনিকদের জন্য একটি বেসরকারী হাঁসপাতাল নিজ ব্যয়ে স্থাপন করেছিলেন এবং নিজে সেখানে পরিচর্যার অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সমসাময়িক সুলেখিকা ম্যারিয়ন হার্ল্যাণ্ডের আসল নাম মেরী ভার্জিনিয়া। আঠারো বছর বয়সে তাঁর প্রথম বই "একাকী" ছাপা হয়। তারপর অনেক বই-ই তিনি লেখেন; কিন্তু সেগুলির জন্যে খ্যাতি তাঁর চিরদিন থাক্‌বে না। কুড়ি বছর বয়সে তিনি এক পাদ্রীকে বিবাহ করেন এবং পঞ্চাশ বছর পরমানন্দে গৃহকর্ত্রীত্ব করেন। তাঁর স্বামী এই বিদুষী নারীর গৃহকর্মের দক্ষতা দেখে বিস্মিত হতেন, তিনি বলতেন, তাঁর "সংসারে সহজ বুদ্ধি" নামক গৃহকর্ম এবং রন্ধন-বিষয়ক বইটি পৃথিবীর যত উপকারে লাগবে, অন্য সব বইগুলি মিলিয়েও তা লাগবে না। এই যুগের আর একজন বিখ্যাত লেখিকা ছিলেন সুসান ওয়ার্নার। তাঁর বিখ্যাত লেখা "বিস্তীর্ণা ধরণীর মাতার" মত জগৎব্যাপী খ্যাতি 'টমকাকার কুটির' ছাড়া আর কোন বই পায় নি। তাঁর বাবা ছিলেন ধনী, আইন ব্যবসায়ী। হেডসান নদীর মধ্যে কনষ্টিটিউসন দ্বীপটি ছিল তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি। সুসান জীবনের অধিকাংশ সময় সেই দ্বীপে কাটিয়ে ছিলেন, অর্থাভাব তাঁকে ভোগ করতে হয় নি। তাঁর দ্বিতীয় বিখ্যাত উপন্যাস "কুইচির" নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আমেরিকায় শিশুপাঠ্য বই লিখে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে লুইসাসে অলকট সর্ব প্রধান। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। এঁর "ক্ষুদ্রা নারী", "ক্ষুদ্র পুরুষ", "সেকেলে মেয়ে", "আট ভাই" প্রভৃতি পড়ে আজও কোটি কোটি ছেলে মেয়ে আনন্দ পাচ্ছে। বাবা ছিলেন দার্শনিক পণ্ডিত, উপার্জনের জন্য মা'কেই খাট্‌তে হ'ত। বাড়ীতে অনেক সময় অন্নাভাব পুতুলের পোষাক তৈরী ক'রে জামা সেলাই করে মাষ্টারী ক'রে রান্না ক'রে লুইসা মা'কে সাহায্য করতেন। হাঁসপাতালে সেবিকার নানান্ কাজ নিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য জন্মের মতো ভেঙ্গে যায়। যেখানে যে অবস্থায় এবং যে কাজেই থাকুন, তিনি ছেলেদের জন্য সুন্দর সুন্দর গল্প লিখতে পারতেন। তাঁর হাঁসপাতালের গল্পগুলিরও সে যুগে তুলনা ছিল না। শেষ জীবনে ইনি মোটের উপর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে গেছেন। শিশু-সাহিত্যের অন্যতম লেখিকা মেরী সেপস্ বা মিসেস্ ডজ্ জন্মেছিলেন ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে। অল্প বয়সে বিধবা হ'য়ে দু'টি ছেলে নিয়ে ইনি পিতৃভবনে ফিরে আসেন। ছেলেদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা নিয়ে তিনি গল্প লিখতেন। সঙ্গীতে, চিত্রে, ভাস্কর্যে, বার বারে তিনি সমভাবে দক্ষতা দেখিয়ে গেছেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ থেকে দীর্ঘকাল সেণ্ট নিকোলাস নামক সাময়িক পত্রের সম্পাদনা করেছেন। ১৯০৫ সালে তাঁর মৃত্যুতে শিশুসাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ সহৃদয় বন্ধু হারিয়েছে। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে সহানুভূতিপূর্ণ রচনা আমরা প্রথম পাই হেলেন হাণ্টজ্যাকসনের কাছে। এই অত্যাচারিত জাতির স্বপক্ষে তিনি তীব্র ভাষায় সরকারকে আক্রমণ ক'রে "শতাব্দীর অপমান" লেখেন। সরকার তাঁকেই এ বিষয়ে অনুসন্ধানের ভার দেন, তিনি সাধ্যমতো এই দুরূহ কর্ত্তব্য পালন ক'রে অনেক অন্যায়ের প্রতিকার করে গেছেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "র‍্যামোনা" এই লাল মানুষদের নিয়েই লেখা। পরবর্তী লেখিকা ফ্রান্সেস্ হজসনের জন্ম ইংলণ্ডে, তাঁর পনেরো বছর বয়সের সময় তাঁর বাবার মৃত্যু হ'লে তাঁর মা এসে আমেরিকায় বাস করেন। শৈশবেই তিনি চমৎকার গল্প বলতে পারতেন, অল্প বয়সে অর্থাভাবে অনেক লেখা তাঁকে ব্যবসায় হিসাবে ছাপাতে হয়। তাঁর প্রথম বিখ্যাত বই "শার্লি চিনের ঝঞ্ঝাট", তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বই "লৌরীর মেয়ে এবং সব চেয়ে বিখ্যাত বই "ছোট্টো লর্ড ফণ্টলরয়"। "লৌরীর মেয়ে" বইখানি কুলি মজুরদের সুখ-দুঃখ নিয়ে লেখা। এঁর পরবর্তী লেখিকা অ্যামেলিয়ার জন্ম ইংলণ্ডে, বিয়ের পর তিনি স্বামীর সঙ্গে আমেরিকায় যান। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে পীতজ্বরে স্বামীকে এবং তিন ছেলেকে হারিয়ে ভাগ্যান্বেষণে তিনটি মেয়ে নিয়ে নিউইয়র্কে গিয়ে বই লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সত্তরখানি উপন্যাস তিনি একে একে লেখেন এবং সবগুলিই তৎকালে সমাদৃত হয়। এই যুগে এলিজাবেথ ষ্টুয়ার্থ ফেল্পস্ পরলোকের কথা নিয়ে "খোলা দরজা" উপন্যাসখানি লেখেন। তেরো বছর থেকে তিনি লিখতে আরম্ভ করেন, ছোটো গল্প এবং উপন্যাস দু'য়েতেই তাঁর শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল তিনি বহু সাময়িক পত্রের লোকপ্রিয় লেখিকা ছিলেন, "অ্যাডিসের গল্প", "টারসের ম্যাডোনা", "একটি জীবন" প্রভৃতি উপন্যাসে আর্ত মানুষের, এমন কি পশুর প্রতি তাঁর আশ্চর্য সমবেদনা দেখা যায়। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে "সাধারণ তন্ত্রের রণ-সঙ্গীত" নামে যে গানটির সুর সহস্র সহস্র সৈনিকের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করত, তার লেখিকা জুলিয়া ওয়ার্ড হাউ বহু গল্প কবিতা লিখেছেন, বহু সৎকার্যে শক্তি এবং অর্থ ব্যয় করেছেন এবং

সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিয়েছেন। গৃহে তিনি মাতা এবং আদর্শ-পত্নী ছিলেন। এর পরবর্তী লেখিকা সারা ওর্ণ জুয়েটের "ডিপ হেভেন", "গ্রামের গলি", "সূচ দেবদারুর দেশ" প্রভৃতি পড়লে সে যুগের সমুদ্রতীরবাসী মৎস্যজীবী; বণিক প্রভৃতির এবং তাদের মেয়েদের নিখুঁত ছবি আমরা দেখতে পাই। প্রতিদিন যে সব দৃশ্য আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় তাই নিয়ে সুলেখক কি অপূর্ব সৃষ্টি করতে পারেন, সারার বইগুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অ্যালিস ব্রাউনের ছোটো গল্পের বই "টাইভারটনের গল্প", "মেঠো ঘাস", "পাড়া গাঁয়ের পড়শী" প্রভৃতি এই জাতীয় স্বগ্রামের ঘরোয়া ঘটনা নিয়ে লেখা। চার্লস্ এগবার্ট ক্র্যাডকের "বিশাল ধুমল পর্বতের প্রেরিত পুরুষ"। "টেনেস পর্বতে" প্রভৃতি বই এমনি পাহাড়ীদের জীবনযাত্রার নিখুঁত ছবি। লেখিকা মেরী নোয়াইল্স্ "মরফ্রি" এই পুরুষের ছদ্মনামে লিখতেন। শৈশবে একটা দুর্ঘটনায় একটা পা খোঁড়া হ'য়ে যায়, সুতরাং কোনো পরিশ্রমের কাজ তাঁর দ্বারা চলত না, প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে তাঁরা পাহাড়ে বেড়াতে যেতেন, তাঁর গল্প উপন্যাসগুলির চরিত্র সেই সব স্থানে বাসের সময়ে সংগ্রহ করতেন।

"আশার বন্দী" "পাওয়া ও রাখা" প্রভৃতি উপন্যাসের লেখিকা মেরী জনষ্টন চিররুগ্না ছিলেন। ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের বাস্তব জগৎ মিলিয়ে তাকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তুলতে তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। তাঁর লেখা আমেরিকার যুদ্ধের দুটি রোমাঞ্চকর গল্প "গুলি ছোঁড়া বন্ধ করো", "দীর্ঘ উপস্থিতি গণনা" বিশেষ বিখ্যাত। ভার্জিনিয়া প্রদেশের বর্ণনা ইনি ছাড়া আর একজন শক্তিমতী লেখিকার পল্লী-উপন্যাসে পাওয়া যায় তাঁর নাম এলেন গ্লাসগো। এলেনের আমেরিকান গৃহযুদ্ধের গল্পগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ, তার মধ্যে সব চেয়ে শক্তিশালী রচনা তাঁর "জাতির মর্মবাণী"। এর পর শিশু-সাহিত্যের সুলেখিকা কেট ডগ্লাস্ উইগিনের নাম করতে হয়। তাঁর সখীদের খৃষ্টোৎসবের গান "টিম্থির সন্ধান" "সানিব্রুক ফার্মের রেবেকা" প্রভৃতি শুধু গল্প বইয়েই নয়, অভিনয়েও খুব নাম করেছে। তাঁর "পেনিলোপির অগ্রগতি" পড়ে অনেক শিশু আজও কল্পনায় দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। লেখিকা নিজে সতেরো বৎসর বয়সে শিশুশিক্ষা-প্রণালী শেখবার জন্য সানফ্রানসিস্কো যান এবং নিজে কিণ্ডার গার্টেন ট্রেনিং স্কুল ক'রে ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকে আনন্দময় করবার জন্য আজীবন চেষ্টা করেছেন। তাঁর লেখায় শিশুদের প্রতি তাঁর আন্তরিক কল্যাণ বুদ্ধি ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। এরপর মিসেস মার্গারেট ডেল্যাণ্ডের লেখা বইয়ে পেনসিল ভেনিয়ার মধুর গ্রাম্য চিত্রগুলির, মিসেস্ ফ্রিম্যানের লেখা নিউ ইংলণ্ডের কলের কুলিদের করুণ কাহিনীগুলির, প্রেস্ কিংয়ের লুসিয়ানার ঐতিহাসিক গল্পগুলির, হেলেন রাইসেন স্নাইডেনের সেনো নাইট সম্প্রদায়ের বিচিত্র চরিত্রচিত্রগুলির উল্লেখ প্রয়োজন। এরপর একজন শক্তিশালিনী হাস্যরসের লেখিকার দর্শন পাওয়া যায়, তাঁর নাম অ্যালিস হিগ্যান রাইস। তাঁর বিখ্যাত "মিসেস্ উইগ্স্" বইটি বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। "রুথ এশোরি ষ্টুয়ার্টে"র নিগ্রোদের চরিত্র-চিত্রগুলি তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা;— হতভাগ্য নিপীড়িতদের কাহিনী। জুলিয়া ম্যাগ্রুডারের "রাজকুমারী সোনিয়া" "মৃত সেলভেস" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জোসেফাইন ডজ ডাস্কার তাঁর "ভিলিপের পাগলামি"

দিয়ে, তাঁর শিশু-চরিত্র দিয়ে হাস্যরসাত্মক বই লেখা শুরু করেন এবং এই ধরণের বই বড়দের লেখাতে এর শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি এখনও জীবিতা আছেন। মিসেস্ অ্যাটউড মার্টিন "জর্জ ম্যাডন মার্টিন"- এই ছদ্মনামে "এমিলু" প্রভৃতি কয়েকখানি বিখ্যাত বই লিখেছেন। তাঁর বই একটি ছোটো মেয়ের স্কুল-জীবন নিয়ে। এ বইটী পড়ে অনেক অভিভাবক শিশুদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতে প্রেরণা পেয়েছেন। বর্তমানে আমেরিকায় এত লেখিকা এত রকম বিষয়ে লিখছেন যে, তাঁদের হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। তার মধ্যে দু' চারজনের কথা বলা চলে। মেরী রেমণ্ডের কানাডার জঙ্গলে গ্রীষ্ম যাপনের গল্প, মেরী রবার্ট রাইন হার্টের রহস্যমূলক উপন্যাস এবং মহাযুদ্ধের কাহিনী, এডিথ হোয়ার্টনের করুণ রসাত্মক "আনন্দময় গৃহ" প্রভৃতি উপন্যাস, গারট্রড্ অ্যবহার্ট লেকের দেশবিদেশের কথা বিখ্যাত। বর্তমান ইংরেজ কবিদের মধ্যে এডিথ সিট্ওয়েলের নাম আছে।

যুরোপ ও আমেরিকায় বর্তমান যুগের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান লেখিকাদের মধ্যে মেরী ওয়েবের "স্বর্ণ শায়ক" (১৯১৬), "মৃত্তিকাগত" (১৯১৭), "বহু মূল্য বেন" (১৯২৪), শীলা কে স্মিথের "সাসেক্স গর্স্" (১৯১৬), "কাঁচা আপেলের ফসল" (১৯২০), "জোয়ানা গডেন" (১৯২১), "আলার্ড বংশের শেষ" (১৯২৩) "জর্জ এবং রাষ্ট্র" (১৯২৫) নামক উপন্যাস এবং "ইংলণ্ডের শাশ্বত মত", (১৯২৫) নামক প্রবন্ধ পুস্তক উল্লেখযোগ্য। নায়োবি মিচিসনের অধিকাংশ গল্প উপন্যাসের পটভূমিকা প্রাচীন গ্রীস বা যুরোপ। তার প্রধান বই "মেঘ কোকিলের দেশ" (১৯২৫) "কালো স্পার্টা" (১৯২৭) ও "শস্যের রাজা" এবং "বসন্তের রাণী" (১৯৩১)। সিল্ভিয়া টাউনশেণ্ড ওয়ার্নারের "ললি উইলোজ্" (১৯২৬) "মিষ্টার ফরচুনের ম্যাগট (১৯২৭), "ট্রু হার্ট" (১৯২৯) বিখ্যাত বই। তিনি গায়িকা ব'লেও বিখ্যাতা, টিউডরদের সময় "ধর্ম সঙ্গীত" বইটির তিনি অন্যতম সম্পাদিকা। রেবেকা ওয়েষ্ট বা মিসেস্ অ্যাণ্ড্রুজ্ "বিচারক" (১৯২২) "চিন্তাশীল রীড়্" (১৯২২) প্রভৃতি উপন্যাস এবং হেনরী জেম্স, ডি, এইচ, লরেন্স এবং আর্নল্ড বেনেটের সমালোচনা লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। বর্তমান যুগের সব চেয়ে বিখ্যাত লেখিকা মিসেস ভার্জিনিয়া উলফের প্রধান বিশেষত্ব তিনি কোনো চরিত্রের একটা বিশেষ সমগ্র রূপ ধরে বেঁধে দেন না, খণ্ড খণ্ড ভালোয় মন্দয় ছোটো ছোটো কাজ ও কথার সমষ্টিরূপে তাঁর প্রত্যেক চরিত্রই জটিল এবং স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর বিখ্যাত রচনা "জলযাত্রা" (১৯১৫), "দিন ও রাত্রি" (১৯১৯), "জ্যাকবের ঘর" (১৯২২), "মিসেস্ ডলওয়ে" (১৯২৫), "বাতিঘরে" (১৯২৭), "অর্ল্যাণ্ডো (১৯২৯), "ঢেউ" (১৯৩১), "বৎসর গুলি" (১৯৩৭)। তাঁর সমালোচনা বিষয়ক বিখ্যাত বই "সাধারণ পাঠক" (১৯২৫) "নিজের একখানি ঘর" (১৯২৯)। এ যুগের আর একখানি সুপ্রসিদ্ধ এবং সুবৃহৎ উপন্যাস "গন্ উইথ দি উইণ্ড"। এই বইখানি প্রকাশ হওয়া মাত্র, লক্ষ লক্ষ খণ্ড বিক্রয় হইয়াছিল আমেরিকান গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় এই বইখানি লিখিত। আশ্চর্য এইরূপ শক্তিশালিনী লেখিকা প্রায় ১১৩০ পৃষ্ঠার অপূর্ব উপন্যাসখানি লিখিয়াই তাঁহার লেখনি সম্বরণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ অকলঙ্ক যশো রশ্মিতে পাছে কলঙ্ক স্পর্শ করে সেই ভয়ে! এঁর নাম মার্গারেট মিচেল।

বর্তমান কবিদের মধ্যে এডিথ্ সিট্ওয়েলের “কবিতা সংগ্রহ” (১৯৩০), “ক্যাথারিন ম্যান্সফিল্ড” (১৮৮৮-১৯২৩), তাঁর ছোটো গল্প সংগ্রহ “আনন্দ” (ব্লিস), ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ‘ফেমিনাভি হোরোজ’ পুরস্কার পায়। তাঁর দ্বিতীয় বিখ্যাত গল্প সংগ্রহ “কপোত-নীড়” ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রোজ সেকালে তাঁর “বিপজ্জনক যুগ” নামক উপন্যাস লিখে (১৯৩২ সালে) পূর্বোক্ত পুরস্কার পান। “পটারিজ্ম্” (১৯২০) “মূর্খের দ্বারা কথিত (১৯২৩) এবং “তারা হেরে গেল” (১৯৩২) তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কনষ্ট্যান্স হোম্সের “নিঃসঙ্গ লাঙ্গল” (১৯২৪) উপন্যাসে তিনি বন্যার দুর্দিনে উত্তর ইংল্যাণ্ডের প্রজার প্রভূভক্তি এবং অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। উইলা ক্যাথারের “আর্ক বিশপের কাম্য মৃত্যু এল” (১৯২৭) একখানি বিখ্যাত বই।

আমেরিকার ক্যানেডিয়ান লেখিকা মাজো দ্য লা রোশ্ এর “নীচ জীবন” এবং অন্যান্য অভিনয় (১৯২৫) এবং “ভ্যাল্না” (১৯২৭) “হোয়াইটোক্স্” (১৯২৯), “ফিঞ্চের ঐশ্বর্য” (১৯৩১), “জানার প্রভু” (১৯:৩), “নর্মান দুর্গের ধারে” (১৯৩৪) বিখ্যাত বই। ষ্টেলা বেনসনের “আমি সেজে দাঁড়ালুম” (১৯১৫), “নিঃসঙ্গ জীবন” (১৯১৯), “টাবিট্কে নেড়ে বসালো’ (১৯৩১), খ্যাতি লাভ করেছে। ভারতবর্ষ, চীন, আরব, ইংলণ্ড এবং আমেরিকার বাইরে অন্যান্য দেশের লেখিকাদের সঙ্গে আমাদের সম্যক্ পরিচয় নেই, তবে যতদূর জানা যায়, তা’তে ফ্রান্সে এবং জার্মানীতে ইংলণ্ডের অনেক আগেই নারীরা সাহিত্য সেবায় যোগ দিয়েছিলেন, ইটালিতে প্রাচীন রোমক সংস্কৃতির ধারা তো চলছিলই। ফরাসী বিদুষীদের মধ্যে একাদশ শতাব্দীতে এলোয়াজ, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্গে-রিৎ দ্য বুর্গোঞ্, পঞ্চদশ শতাব্দীতে লুইজ্ দ্য সাভোয়া (১৪৭৬-১৫৩১) ষোড়শ শতাব্দীতে লুইজ্ শার্লি লাবে (১৫২৬-১৫৬৬) মাদাম ক্যারোলিন অলিভিয়েরের নাম শোনা যায়।

মাদাম গিয়ঁ, মাদাম মৎভিল্ এবং মাদাম দ্য লাফায়েৎ প্রধানতঃ ধর্মোপদেশ এবং স্মৃতি কথা লিখে বিখ্যাতা হন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সোফি দ্য লা লিভ্, দ্য বেলগার্দ’বা কঁতেস্ হুদ্তো (১৭৩০-১৮১৩) মাদাম সাবিন্ ট্রাস্ত (১৭৯৫), মারী জোসেফিন, রোজ টাসে’ বা সাম্রাজ্ঞী জোসেফিন (১৭৬৩-১৮১৪) তাঁর কন্যা এবং তৃতীয় নাপোলেয়ঁরের মা অর্তাঁস্ ইউজেনি দ্য বোআর্নে (১৭৮৩-১৮৩৭), মাশিয়িনেস্ দ্য ত্রোভান্, এমে দ্য কোয়াঞ্যি, মার্সেলিন দেবোর্দ ভালমোর (১৭৮৭-১৮৫৯) কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অঁর্তাস্ সকল কলানিপুণা, সোফি বহু শাস্ত্রজ্ঞা, গিয়ঁ পুণ্যবতী এবং ধর্মজ্ঞা, লুইজ্ লাবে রণনিপুণা এবং এমে দ্য কোয়াঞ্যি (ফ্লোরির ডাচেস্) রাজনীতিজ্ঞা বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনীতিজ্ঞা বীর নারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা মাদাম রোলাঁ ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম নেত্রী ছিলেন। দলগত বিরোধে তাঁদের পক্ষভূক্ত জিরঁদিষ্ট দলের আধিপত্য নষ্ট হ’লে, তাঁর স্বামী মন্ত্রীত্ব ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন, কিন্তু মাদাম রোলাঁ শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবার জন্য পারীতে থেকে শত্রুর হাতে বন্দিনী হন এবং শেষে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে গিলোটিনে প্রাণ দেন, তাঁর স্বামী ও তাঁর মৃত্যুর কথা শুনে আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর পূর্বে কারাবাসকালে লেখা তাঁর

"ভবিষ্যদ্বংশীয়দের প্রতি আবেদন" নামক প্রবন্ধটি তাঁর দেশপ্রেমের এবং মহানুভবতার নিদর্শন স্বরূপ আজও তাঁর স্মৃতি বহন করছে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সুবিখ্যাত বাণী, "হায় স্বাধীনতা, তোমার নামে কত পাপই না সংঘটিত হয়।" ঐ যুগের আর একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞা এবং রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখিকা মাদাম দ্য স্টায়েল্ (১৭৬৬-১৮১৭) তাঁর "রুশোর সম্বন্ধে চিঠি" বইখানির জন্য ফরাসী বিদ্রোহের প্রাক্কালে খুব বিখ্যাত হয়েছিলেন। বিদ্রোহীদের অনাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে, তিনি কিছুদিনের জন্য দেশ থেকে নির্বাসিত হন। সম্রাট নাপোলেয়ঁর সময়ে দেশে ফিরে তিনি কিছুদিন পরেই তাঁর বিরুদ্ধে লিখতে আরম্ভ করেন এবং আবার নির্বাসিতা হন, তাঁর এই সময়কার লেখা "কোরিণ", বিখ্যাত গ্রন্থ। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী লেখিকাদের মধ্যে আমাঁদিন লুসিল্, ওরোর্ দুপ্যাঁ (১৯০৪-১৮৭৬), জর্জ স্যাণ্ড, এই ছদ্ম নামে নাটক এবং উপন্যাস লিখে জগদ্বিখ্যাত হন।

ফ্রান্সের বর্তমান শতাব্দীর বিখ্যাত কবি এবং বিদুষী কঁতেস নোয়াইয় কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিতা ছিলেন। আজকের দিনের ফরাসী নারী কবিদের সঙ্গে আমাদের একে বারেই পরিচয় নেই।

জার্মানীর প্রথম সুবিখ্যাত নারী কবি আভার পর বহু নারী সাহিত্য সেবার এবং পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ ক'রে গেছেন।

শুরম্যান ছিলেন একাধারে বিখ্যাত কবি এবং বিখ্যাত চিত্র শিল্পী, জার্মানীতে তাঁর সময়ে তাঁর মতো সুপণ্ডিত পুরুষও অল্পই ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ব্যারনেস ফন ক্রুড্নের নাম্নী একজন জার্মান বিদুষীকে রুষ সম্রাট গুরুর মতো শ্রদ্ধা করতেন। ফরাসী সম্রাট নাপোলেয়ঁর বিরুদ্ধে য়ুরোপের রাজন্যবর্গ যে "পবিত্র" সন্ধিসুত্রে আবদ্ধ হন, তার মূল খসড়া তিনিই করেছিলেন। রুষ সম্রাট আলেকজাণ্ডারের রাজ্য শাসন এবং যুদ্ধবিগ্রহ সংক্রান্ত অনেক গুরুতর কাজ ক্রুডনেরের উপদেশ অনুসারে পরিচালিত হ'ত ব'লে শোনা যায়।

গান লিখে যাঁরা বিখ্যাত হ'য়েছেন, তাঁদের মধ্যে "স্কটল্যাণ্ড অনিলার" লেখিকা লেডী জন্ স্কট, লেডী "অল্ড রবিন গ্রে' লেখিকা অ্যান্লিণ্ডসের লেডী নেয়ার্সের "ল্যাণ্ড দ্য লিল" বিখ্যাত।

স্পেনে ষোড়শ শতাব্দীতে সেণ্ট টেরেসা "আত্মার প্রাসাদ" "পরিপূর্ণতার পথ" প্রভৃতি বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন।

বর্তমান শতাব্দীতে মিসেস্ হামফ্রি ওয়ার্ড (১৮৫৮-১৯২০) ১৮৮৮-তে "রবার্ট এসফের" লেখেন।

নোবেল পুরষ্কার লাভ ক'রে বর্ত্তমান জগতে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা আসন লাভ করেছেন, তাঁদের নাম, সেলমা লাগেরলফ, গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা, সিগ্রিড উণ্ডসেট ও পার্লবাক। এরা প্রত্যেকেই আদর্শবাদী এবং মানবহিতৈষী, এঁরা প্রত্যেকেই নারী-লেখিকাদের গৌরব। এঁদের মধ্যে পার্লবাক ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধের প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি জানিয়ে এবং কার্য্যক্ষেত্রে ভারতে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদেশে জনমত গঠন করে, প্রত্যেক ভারত-নারীর শ্রদ্ধার পাত্রী হয়েছেন। সময়ের হিসাবে এঁদের অগ্রণী সেলমার জন্ম ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সুইডেনে মারবাক্কায়; তাঁর বাবা লেপ্টেন্যাণ্ট লাগেরলফ মজলিসী লোক ছিলেন, মা ছিলেন খুব হিসেবী এবং ভারিক্কি মেজাজের। ছোটোবেলায় একবার পুকুরের ঠাণ্ডাজলে স্নান ক'রে সেলমার পক্ষাঘাত হয়, বহু চিকিৎসায় তিনি রোগমুক্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর শরীর জন্মের মতো দুর্বল হয়ে গেছল। ছোটবেলা থেকে সুইডেনের বনজঙ্গল, জীবজন্তু, রূপকথা, ক্ষেতখামারের গল্প, প্রাচীন বীরত্বগাথা প্রভৃতি তিনি ভালোবাসতেন, চিরদিন তাঁর বইয়ের মধ্যে এইসব বিষয়ে লিখেছেন। ষ্টকহ'ল্‌ম্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপাধি নিয়ে তিনি ল্যাণ্ডস্ক্রোনা শহরে মাষ্টারী আরম্ভ করেন। ক্লাশের কাজে এত সময় দিতে হ'ত যে ইচ্ছাসত্ত্বেও লেখবার সময় পেতেন না। তবু তিনি সে সময় ছাত্রীদের অনেক গল্প বলতেন মুখে মুখে। ১৮৯০ সালে "ইদুন" পত্রিকার পুরস্কার প্রতিযোগিতায় যখম তিনি লেখা পাঠান, তখন এলোমেলোভাবে লেখা ব'লে সেগুলি সম্বন্ধে প্রথমে বিবেচনার অযোগ্য এইরূপ মন্তব্য আসে। তারপর লেখাটি শুধু যে গৃহীত হয়েছিল তাই নয়, গল্পটিকে উপন্যাসের আকারে লিখে দেবার অনুরোধও এসেছিল। এরপর বারনেস আল্‌ভেসকারের সহায়তায় তিনি চাকরী থেকে ছুটি পান এবং লিখতে আরম্ভ করেন। ১৮৯৪ সালে "অদৃশ্য গ্রন্থি", লিখে তিনি অ্যাকাডেমি এবং রাজপরিবারের সহায়তায় একটি বৃত্তি লাভ করেন। এই সময় ইটালি, সিসিলি প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফেরেন এবং "খৃষ্টশত্রুর অলৌকিক কাণ্ড", বইটি প্রকাশ করেন। তাঁর "পর্তুগালিয়ার সম্রাট", "জেরুজালেম", "গোষ্টা বেলিঙ্গের গল্প", "সুইডেনের গৃহ হইতে", "নিল্‌সের আশ্চর্য্য রোমাঞ্চকর অভিযান", "নিল্‌সের আরও অভিজান" প্রভৃতি বই তাঁকে আবালবৃদ্ধবনিতার আপন জন করেছে। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ "নিল্‌সের অভিযান" নিয়ে তাঁর অদ্বিতীয় শিশুপাঠ্য উপন্যাস "বুড়ো আংলার গল্প", লিখেছেন। জেরুজালেমে সুইডেনের এক উপনিবেশ ছিল: সেখানকার দুর্নীতি, অবিচার প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা গুজব শুনে সুইডিশ সরকার সেলমাকে সন্ধান নিতে পাঠান। সেলমা সকল দিক বিবেচনা ক'রে শুধু একটি সুন্দর রিপোর্ট দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, এইখানের সংগৃহীত মালমসলা নিয়ে "জেরুজালেম" নামক উপন্যাস ও "খৃষ্ট কাহিনী" নামক গল্প সংগ্রহ করলেন। আপশালা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমতঃ তাঁকে এল, এল, ভি, উপাধি দেন্ তারপর সুইডিশ অ্যাকাডেমী তাঁকে প্রথম নারী সভ্যারূপে মনোনীত করেন। একান্ন বছর বয়সে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। গত মহাযুদ্ধের সময় নিরর্থক নরহত্যা তাঁকে পীড়িত করেছিল, ১৯১৮ সালে "পতিত" নামক উপন্যাসে মনুষ্যজীবনের মহার্ঘতা তিনি দেখিয়েছেন। ঈশ্বরপ্রেম, দেশভক্তি, পরলোক সম্বন্ধে চিন্তা, প্রকৃতি-

প্রীতি, সর্বজীবের সুখেদুঃখে সমবেদনা এবং করুণ ও হাস্যরসের মিলিত প্রবাহ তাঁর লেখাকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে।

সেল্‌মার পর যে নারী সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কার পান তার নাম গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা, তিনি ইতালির এক মধ্যবিত্ত আইনজীবী এবং কৃষিজীবী পরিবারের মেয়ে। বারো বছর বয়সে এক প্রবন্ধ লিখে তিনি পঞ্চাশ লিরা পুরস্কার পান। তারপর "ঘৃণা" নামক তাঁর একটি নাটিকা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। তাঁর "ভস্ম" নামক উপন্যাসখানি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তাঁকে বিখ্যাত করে। তাঁর "দুইটি অলৌকিক ঘটনা" নামক বিখ্যাত গল্প পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মুসোলিনির নেতৃত্বে ইটালির অমরগণের সভায় তিনি সভ্যা রূপে গৃহীতা এবং নোবেল পুরস্কার লাভ করে পৃথিবীর কাছে পরিচিতা হন। তাঁর চুয়াল্লিশ খানা বইয়ের মধ্যে মাত্র পাঁচ খানা ইংরাজিতে অনুদিত হয়েছে। তিনি নিজে স্বীকার করেন, নিজের তৃপ্তির জন্যই তিনি লেখেন, সাধারণ পাঠকের রুচির দাবী মেনে লেখা তাঁর পোষায় না। তিনি ধর্ম্মের জয়ে বিশ্বাসী তাঁর মতামত আধুনিক উদ্দাম প্রগতি যুগের সঙ্গে ঠিক মেলেনা, তথাপি তাঁর প্রতিভাকে স্বীকার না ক'রে প্রগতিবাদিনীদেরও উপায় নেই!

গ্রাৎসিয়া নোবল পুরস্কার পাবার দু'বৎসর পরেই অর্থাৎ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সিগ্রিণ্ড উণ্ডমেট ঐ সম্মানে সম্মানিতা হন। তিনি ডেনমার্কের ভাস্কর মার্টিন উণ্ডমেটের কন্যা এবং শিল্পী সোয়ার্ষ্টেডের পত্নী। 'ওলোর' কলেজের পাঠ সমাপ্ত করে ইনি বাড়ীতে বসে ডেনমার্কের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। অর্থাভাবে শেষ পর্যন্ত তাঁকে চাকরী নিতে হয়, চাকরী করে সংসারের কাজ কর্ম সেরে অনেক সময়ে রাত জেগে তিনি সাহিত্য চর্চা করতেন। তাঁর লেখায় সর্বত্র মধ্যযুগের বর্ণনা এবং দারিদ্র্যগ্রস্ত মধ্যবিত্ত সমাজের স্বাভাবিক ছবি দেখতে পাওয়া যায়। উণ্ডমেটের সব চেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস "ক্রিষ্টিন ল্যাভ্রান্সভাটার" এবং "হেষ্টভিকেনের প্রভু" ইংরেজীতে অনুদিত হয়েছে। নিজের জীবনের সমস্যা;—অর্থাৎ মেয়েদের যদি চাকরী করেই খেতে হয়, তাহলে তাদের বিয়ে করার প্রয়োজন কি? স্বাধীন থাকলে তারা তো ঢের বেশী আমোদে থাকতে পারে। এ প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজের লেখার মধ্যেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন; —"একলা কাজে আমোদ আছে, কিন্তু সে আমোদ বেশীদিন ভালো লাগে না, শীঘ্রই তা'তে অবসাদ এসে যায়। অপরকে সুখ দুঃখের অংশীদার করতে পারলে জীবনে তখনই প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায়, সেই জন্যই নরনারীর মনোমত সঙ্গীর প্রয়োজন।

উণ্ডমেটের সব বই ইংরাজীতে অনুদিত হয় নি। তিনি তাঁর বইগুলিতে তাঁর প্রগাঢ় ঐতিহাসিক জ্ঞান, সহজ এবং সুন্দরভাবে প্রয়োগ করেছেন, তিনি দেখিয়েছেন মানুষের আশা আকাক্ষ। দু' পাঁচশ' বছরে কিছুই বদলায় নি।

আমেরিকার বর্ত্তমানের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখিকা পার্ল বাক ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর "মঙ্গলময়ী ভূমি" (গুড্ আর্থ) পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

লেখিকা পিতা এবং স্বামীর কার্যোপলক্ষে দীর্ঘকাল চীনদেশে ছিলেন, চীনের সামাজিক চিত্রই তিনি বইটিতে নিখুতভাবে এঁকেছেন অত্যন্ত সহানুভূতি নিয়ে।

পরাধীন ভারতের প্রতি সমবেদনায় ইনি ইংরাজ শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বহু প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং আজও জানাচ্ছেন, এর জন্য এদেশের শুধু নারীই নয়, নারী পুরুষনির্বিশেষে সকলেই তাঁর কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করছে।

পৃথিবীর সাহিত্যে দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতন্ত্রগুলির দান খুবই সামান্য। প্রাচীন পেরুর ইঙ্কারাজাদের সূর্যোপাসক প্রজারা সভ্যতার পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু উত্তরের মায়াসভ্যতার সঙ্গে তার কোনো যোগ ছিলনা। আমেরিকার ঐ সর্ব সুপ্রাচীন সভ্যতার শেষ চিহ্ন স্বরূপ কতকগুলি দেবমন্দির ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আজও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, বাকি সমস্তই কালের এবং ততোধিক ক্রুর স্পেন দেশীয় বর্বরদের করালকবলে বহুদিন হ'ল নিপতিত হয়েছে। এক সময়ে খৃষ্টান ধর্মযাজকেরা ইঙ্কাদের আমলের সমস্ত সাহিত্য ও শিল্প ভেঙে পুড়িয়ে শেষ করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের চেষ্টা অনেকটা সফল হলেও সম্পূর্ণরূপে সফল হয়নি, এদিকে ওদিকে দুচারটে গল্প-গাথা ছড়িয়ে পড়ে র'য়েই গেছে। স্পেনের পুরুষ যারা দস্যুতা এবং লুণ্ঠনের জন্য সে দেশে গেছল, তারা অনেকেই পরিবার নিয়ে যায়নি, সেই দেশের মেয়ে বিয়ে করে সেই দেশেই বাস করেছে। পরে পোর্তুগীজ ফরাসী প্রভৃতি অনেকে সে দেশে যায়, তারাও অনেকেই মিশ্র-জাতির মেয়ে বিয়ে করে। বর্তমান মেক্সিকো, পেরু, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশের অধিকাংশ লোকই মিশ্রজাতীয়। তারা স্পেনের অধীনতা পাশ ছিন্ন করার পর থেকেই দেশের প্রাচীন শিল্প সাহিত্যের দিকে ক্রমেই আকৃষ্ট হচ্ছে। অনেকে নূতন গল্প ও কবিতা পুরাতন গাথার বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা আরম্ভ করেছে। সে দেশের অধিকাংশ লোক বর্তমানে স্পেনীয় ভাষায় কথা বলে এবং লেখে, সুতরাং বর্তমান সাহিত্য সেই ভাষাতেই রচিত হয়। বিদুষী নারী সে দেশে বর্তমানে অনেক আছেন, স্কুল কলেজও অনেক হয়েছে, তবে দেশের বাইরে যাঁদের খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছে তেমন নারী বেশি নেই। ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনের কোর্টেজ নামক যে ভাগ্যান্বেষী অতর্কিত আক্রমণ ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ক'রে পেরু দখল করেন, তাঁর একজন বিদুষী 'দোভাষী' ছিলেন তাঁর নাম 'ডনা মারিয়ানা'। বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ যখন নিমন্ত্রিত হ'য়ে সে দেশে গিয়ে অসুস্থ হ'য়ে পড়েন, তখন একজন বিদুষী শিল্প-সঙ্গীত-নিপুণা নারী প্রাণপণে তাঁকে সেবা ক'রেছিলেন, তাঁর নাম সিন্‌য়রা ভিক্টোরিয়া দ্য এষ্ট্রাডা। কবির "পূরবী" নামক কাব্যখানি তাঁকে উৎসর্গিত। "বিজয়া" এই নামে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অমর ক'রে রেখে গেছেন।

বর্তমানে দক্ষিণ আমেরিকার লেখিকাদের মধ্যে ভেনিজুইলার টেরেসা দ্য লাপারা সব চেয়ে বিখ্যাতা, তাঁর আধুনিক নারীচরিত্র নিয়ে লেখা উপন্যাস "ইফিজেনিয়া" (১৯১৪) এবং 'মানাব্লাস্কা" (১৯২৮) মাদ্রিদ ও পারীতে সমাদর লাভ করেছে।

উত্তর আমেরিকার ইংরেজী সাহিত্যের আধুনিকতমা লেখিকাদের মধ্যে বর্তমানে সুবিখ্যাতা কুমারী উইল ক্যাথারের “মাই অ্যাণ্টোনিয়ার” লিখনভঙ্গী প্রাচীনপন্থীদেরই মতো।

রাজনৈতিক মন্তব্য লিখেই যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিখ্যাতা ডরথি টম্‌সন।

শুধু ব্যর্থ প্রেমের কবিতা লিখে ডরথি পার্কার ও কুমারী এড্‌না সেণ্ট ভিন্‌সেণ্ট মিলে খুব নাম করেছেন।

আমেরিকার ইংরেজী সাহিত্য আলোচনার সময় অনেকেই একদল সাহিত্যিকের কথা ভুলে যান, তারা অবজ্ঞাত অত্যাচারিত নিগ্রো। একশতাব্দীর অনধিক কাল আগে তারা নামে মাত্র স্বাধীনতা পেয়েছে, কিন্তু তাদের দাবিয়ে রাখবার জন্য শ্বেতাঙ্গরা ঘরেবাইরে কোনো চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। এই নিগ্রোদের জোর করে তাদের স্বদেশ আফ্রিকা থেকে কুলি খাটাবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আজও তুলোর খেতে কুলি-গিরি এবং লোকের বাড়ীতে বা কারখানায় কুলি-খাটাই তাদের প্রধান উপজীবিকা। শিক্ষায় এবং সভ্যতায় শ্বেতাঙ্গের সমান তারা আজও হতে পরে নি। তবু তাদের মধ্যেও কয়েক জন বিখ্যাত সমাজসেবক এবং শিক্ষকের অক্লান্ত চেষ্টায় নব জীবনের সাড়া পৌঁছেচে। এদেশে ছবি আঁকা, কবিতা রচনা, বিশেষ করে সঙ্গীতে তারা কেউ কেউ শ্বেতাঙ্গদের সমপদস্থ বলে স্বীকৃতও হয়েছে। নিগ্রো নারী কবিদের মধ্যে ক্রীতদাসী ফিলিস হুইট্‌লি (১৮৫৩-৮৪) সর্বপ্রথম কাব্যরচনা করে খ্যাতি লাভ করেন। তারপর শ্রীমতী ফ্রাথেস্-ই হার্পার তাঁর কাব্যে মুক্তির আহ্বান এবং ন্যায়বিচারের দাবী জানান;—স্বাধীনতা লাভের ঠিক পরবর্তী যুগে। বিখ্যাত নিগ্রো কবি ডানবারের পত্নী অ্যালিস্ নেলসন সুবক্তা, সুকবি এবং বিখ্যাত সম্পাদিকা ছিলেন (১৮৭৫)। আন্ স্পেন্সর (১৮৮২), জর্জিয়া জন্‌সন (১৮৮৬) ও জেসি রেডমণ্ড ফসেট্‌কে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ নিগ্রো নারী কবি বলা চলে। দক্ষিণ আমেরিকার নিগ্রো কবিরাও স্পেনীয় ভাষায় কাব্য লিখেছেন, তবে তাঁদের নাম আমার জানা নেই।

জাপানের কথা আমার কাছে অজ্ঞাত, তাই বলে অত বড় উন্নতিশীল দেশে নারী সাহিত্যিকা ও সুপণ্ডিতার আদৌ অভাব হয়নি, একথা নিঃসন্দেহেই বল্‌তে পারি।

পরিশিষ্ট

কবি এবং মনীষীরাই সকল যুগে তাঁদের সম সাময়িক মানবসমাজকে পথ প্রদর্শন করে এসেছেন। এর মধ্যে মাতৃজাতি নারীর দায়িত্ব তাঁদের মানব-সন্তানদের পথ নির্দ্দেশ সম্বন্ধে অধিকতর। সন্তানপালনে মাতৃ-কর্ত্তব্য পিতৃ-কর্ত্তব্যেরও উপরে। আমরা অনেক

নারী-চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখেছি সে শক্তি তাঁদের মধ্যে আছে। প্রতি যুগেই যুগ-বিধাতার মত যুগ-নিয়ন্ত্রী নারীরও উদ্ভব হয়েছে। তাঁদের দেহ-মনের পরিস্থিতি মত কার্য্যপ্রণালী পুরুষের সঙ্গে ঠিক সমান হ'তে পারে না, আদর্শ মূলতঃ এক হলেও বাহ্যতঃ বিভিন্ন।

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং,
নৃনামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।"

তাঁরা নিজ জীবনের মহত্তম ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের দ্বারা নিজ জাতিকে উন্নত করে গেছেন, কোথাও স্বদেশপ্রেম, কোথাও সধর্ম্ম প্রেম, কোথাও বাৎসল্য, কোন খানে পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে স্বদেশে এবং বিশ্বে অমরতা লাভ করেছেন। কত অখ্যাত অজ্ঞাত মহিলা যুগ যুগ ধ'রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে তাঁদের অন্তরের অবদান দিয়ে জাতীয় জীবন ও তার জীবনীশক্তির উৎস-স্বরূপ লিখিত এবং অ-লিখিত সাহিত্যের সৃষ্টি করে রেখেছেন, তার কতটুকুই বা আমরা জান্‌তে বা জানাতে পেরেছি। আজও আমরা যত কিছু ভাল কাজ করতে যাই কোথাও পূর্ব দৃষ্টান্তের অভাব হয় না।

আজ আবার তাঁদের সামনে যে সমস্যাপূর্ণ দিন এসেছে, তাতে নারীকে শুধু সাহিত্যিকা অথবা সুপণ্ডিতা হলেই তাঁদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ পালন করা হবে না, তাঁকে উভয় ক্ষেত্রেই সম্মিলিত দায়িত্ব পরিপূর্ণ রূপে গ্রহণ করতে হবে। নিজ নিজ জাতীয় শিক্ষার রক্ষাবীজ তাঁরই আঁচলে বাঁধা আছে, ধর্ম্মের কর্ষিত ক্ষেত্রে আত্মোৎসর্গের জল সিঞ্চনে সেই বীজ বপন তাঁরই জন্য প্রতীক্ষা ক'রে রয়েছে।

জাতি স্বাধীন নয়,[১৬] পুরুষেই সর্ব্ববিধ উচ্চাধিকারে বঞ্চিত। অনিয়ন্ত্রিত বৈদেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধর্ম্ম বিষয়েও তাদের স্বাধীন অধিকার নেই, "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ো" এ বাণী আজ তাদের কাছে কুসংস্কাররূপে প্রতিপন্ন করবার জন্য চক্রান্ত চলেছে। অপর দিকে গূঢ় রাজনৈতিক কারণ-পরম্পরায় নিজ ধর্ম্মের ব্যবহারিক স্বাধীনতা ব্যাহত হচ্ছে![১৭] মেয়েরাই এতকাল পারিবারিক জীবনক্ষেত্রে ধর্ম্মবীজ বপন ও ধর্ম্মবৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ করে সযত্নে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, বর্ত্তমানে নারীর পুরুষের সঙ্গে সমশিক্ষা এবং পরানুকৃতির মোহ প্রবলরূপ ধারণ করায় সেই ধর্ম্মতরুর মূলোচ্ছেদ হ'বার উপক্রম করেছে। এই দারুণ দূর্দ্দেব থেকে জাতিকে বাঁচাবার জন্য শুধু এদেশেরই নয়, পৃথিবীর নারীকে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে হবে। তাঁরাই জীব-জননী। তাঁদের সৃষ্টি আজ স্বার্থান্ধ মানুষের লোভ-জর্জ্জরতায় ধ্বংস হ'তে বসেছে। বেশীদিন এই হিংস্র পাশবতা চলাতে দিলে, পৃথিবীর যে মূর্ত্তি প্রকট হবে, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের চেয়েও তা' ভয়াবহ। সৃষ্টি কর্ত্তার সৃষ্টি করবার নিশ্চয়ই তা' উদ্দেশ্য ছিল না!

রুদ্রের প্রলয়-বিষাণ স্তব্ধ হোক। মহাপ্রকৃতি সু-ক্রিয়মাণা হোন!

“কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে” ভুলে গিয়ে, আচরণ দিয়ে, আদর্শ দিয়ে, মৃতসঞ্জীবনী মহাবাণী দিয়ে তাঁরা নিজ নিজ সমাজকে পূণ্যের সমাজ, ত্যাগের সমাজ, পবিত্রতার সমাজ, ধর্মের সমাজ তৈরী করতে বদ্ধপরিকর হোন। নারী পুরুষের যথাযথ সাম্য তাঁরা নিজ চরিত্রবলে জয় করে সংস্থাপিত করুন। জোর ক’রে, ভিক্ষা ক’রে, অ-দূরদর্শী আইন ক’রে তা লাভ করা যায় না। সে অধিকার হতে পারে;—সমান সম্পত্তি লাভের, সমান যৌন ভোগের, সমান উচ্ছৃঙ্খলতার। ক্লীবের সঙ্গে, দীনের সঙ্গে, না হয় নৃশংস-দানবের সঙ্গে ধ্বংস-শক্তির সমান অধিকার সে যেন পেতে চায় না,—সে যেন তা’ পায় না,—জোর ক’রে স্বার্থের খাতিরে তার মাথায় চাপিয়ে দিলেও সে যেন মাথা ঝেড়ে ফেলে দেয়,—যেন সে তা’ নেয় না। সে যেন খুঁজে পায় তার নিজের সত্যকার সত্তাকে, সে যেন তার পূর্ণ মহিমায় নব যুগের অরুণ-রাগ-বিমণ্ডিতা ঊষারূপে সমুদিতা হয়ে জগতের এই ব্যাত্যা-বিক্ষুব্ধ জীবন-সিন্ধুর প্রলয় অন্ধকার বিদূরিত করতে পারে, যেমন আদিম সৃষ্টিতে একদিন বিশ্বেশ্বরের বিশ্বসৃষ্টি সহায়িকা রূপে করেছিল! তাকেই বলি, নারী-জাগরণ,—নারী-প্রগতি,—অন্যথায় অধোগতি ও দুর্গতির চরম।

১. ↑

শাস্ত্রমতে “কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্ন সমন্বিতা—”

কন্যাকেও সযত্নে পালন করে শিক্ষিতা করে ধনরত্নসহিত বিদ্বান বরের হাতে সমর্পণ করবে। অত্র শাস্ত্র বলেছেন,

“যদি কুলোন্নয়নে প্রসৃতং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতুহলং
যদি নিজমভীষ্ট চিন্তয়মেকদা, কুরু সুতাং শীলবতীং তদা।”

‘অথ য ইচ্ছেদ্দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত সর্বমায়ুরিয়াদিতি’

বৃহদারণ্যক উঃ ৬, ৪, ১৭

‘ইৎখোপি একচ্চী মা সেয্যো পোসা জনাধিপ। মেধাবতী

সীলাবতী...।’ সংযুক্তনিকার ১, ৮৬

'সন্ত্যপি খলু শাস্ত্রপ্রহতবুদ্ধয়ো গণিকা রাজপুত্র্যো মহামাত্য

দুহিতরশ্চ।' কামসূত্র, ১, ৩, ১২

ইধ পণ মাণব, একচ্চো ইৎথি বা পুরিষো বা সমণং বা ব্রাহ্মণং বা উপসঙ্কমিত্বা পরিপুচ্ছিতা হোতি...সো তেন কম্মেন...মহা পঞ্ঞো হোতি।'

মঝিঝম নিকায় ৩, ২০৬

সা গা-লেখ-লিখিতে গুণ অর্থযুক্তা যা কন্যা ইদৃশ ভবেন্মম

তাং ববেথাঃ। ললিতবিস্তর ১২, ১৫৮

'পুরুষবদ্যোবিতোহপি কবী ভবেয়ুঃ। সংস্কারো হ্যাত্মনি সমবৈতি, ন স্ত্রৈণং পৌরুষং বা বিভাগং অপেক্ষতে। শ্রয়ন্তে দৃশ্যন্তে চ রাজপুত্র্যো মহামাত্যদুহিতয়ো গণিকাঃ কৌতুকিভার্যাশ্চ-শাস্ত্র-প্রহতযুদ্ধয়ঃ কবরশ্চ।' কাব্যমীমাংসা, ৫৩।

২. ↑ সা-গাথ লেখ-ণিখিত গুণ অর্থযুক্তা যা ফলা ইদৃশ ভবেস্মম তাং বরেখাঃ।
৩. ↑ অন্যত্র 'পরিমলা।
৪. ↑

সূক্তিনাং স্মর কেলীনাং কলানাং চ বিলাসভূঃ।
প্রভুদেবী কবির্লাটী গতাহপি হৃদি তিষ্ঠতি॥"

৫. ↑ একান্ত পরিতাপের বিষয় অতীতের "ভুল" বর্ত্তমানে সংশোধিত হওয়া দূরের কথা, সমগ্র ভারতব্যাপী দাবানলরূপে প্রজ্বলিত হয়ে তার অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ করতে উদ্যত হয়েছে। ভারতবর্ষ আজ ভারতবর্ষ নয়, পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান!!!
-মর্ম্মাহতা লেখিকা।
৬. ↑ অবশ্য ইদানীং "আগডম্ বাগডম্" আর ছেলে-ভুলানী ছড়া মাত্র নেই, 'আগা-ডোম', 'বাগাডোম'দের সমর-সঙ্গীত বলে সনাক্ত হয়েছে।
৭. ↑ তার যোগ্য পুরস্কার দিতেও দেশবাসী কার্পণ্য করেনি। (১৯৪৭-৪৮) এখন তিনি যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর। —লেখিকা।
৮. ↑ পাকুড় রাজকন্যা শৈলাঙ্গিনী দেবী।
৯. ↑ বিগত ১৯৪৬ সালে তাঁর দেহান্ত হওয়ায় আমরা একান্ত মর্মাহত হয়েছি, দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য যারা অগ্রবর্তী হয়েছিলেন, এই শক্তিময়ী নারী তাঁদের মধ্যেই একজন। কংগ্রেস সভা লাউডস্পীকারের পূর্ববর্তী যুগ তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে সম্মোহিত থাকতো। "জনগণ" "অতীত গৌরব বাহিনী মম

বাণী” “অগ্নি ভূবন মনমোহিনী” এসব গান তাঁর কণ্ঠে যাঁরাই কংগ্রেস-সভায় শুনে ধন্য হয়েছেন, তাঁরাই জানেন, যে সে স্বরমূর্চ্ছনার কি অপূর্ব প্রভাব!

১০. ↑ বিঠোবা--বিষ্ণু।

১১. ↑ কবিতার অনুবাদ সুকবি প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত। এই পুস্তকের বহু কবিতার অনুবাদই বহু ভাষাভিজ্ঞ উক্ত কবিই সযত্নে করিয়া দিয়াছেন।

১২. ↑ ভাবানুবাদক শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩. ↑ ১৯৪৫-৪৬।

১৪. ↑ আজ স্বাধীন ভারতে তিনি প্রথম নির্বাচিত। বৈদেশিক রাজদূত।

১৫. ↑ স্বাধীন ভারতে রাজকুমারী অমৃত কাউর, মিসেস স্বামীনাথন্ আরও অনেকে বহুতর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

১৬. ↑ আজ দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষ কার্য্যতঃ না হ’লেও বাহ্যতঃ স্বাধীনতার কাঠামো ফিরে পেয়েছে। (১৯৪৮)

১৭. ↑ নিতান্ত দুঃখের বিষয় স্বরাজ প্রাপ্তিতেও জাতির ধার্ম্মিকশিক্ষা ব্যাহত হয়েই রইল, বরং নব-বিধানে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্থই হ’ল!!

লেখিকা (১৯৪৮)

এই ডিজিটাল সংস্করণ সম্পর্কে

এই ই-বই অনলাইন গ্রন্থাগার উইকিসংকলন[১] হতে প্রাপ্ত। স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা নির্মিত এই বহুভাষী ডিজিটাল গ্রন্থাগার উপন্যাস, কবিতা, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি সমস্ত ধরণের প্রকাশনার মুক্ত সংকলন গড়ে তোলার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

আমরা কপিরাইটমুক্ত অথবা মুক্ত লাইসেন্সের অধীনে প্রকাশিত বইগুলিকে বিনামূল্যে প্রদান করে থাকি। আপনি আমাদের ই-বইগুলিকে ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন-শেয়ারঅ্যালাইক ৩.০ আনপোর্টেড লাইসেন্স[২] বা জিএনইউ ফ্রি ডকুমেন্টশন লাইসেন্সের[৩] শর্তাধীনে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য সহ যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারেন।

উইকিসংকলন সর্বদা নতুন সদস্যদের জন্য উন্মুক্ত। এই ই-বইয়ে কিছু ভুল ভ্রান্তি থেকে যাওয়া সম্ভব, সেক্ষেত্রে আপনি এই পাতায় জানাতে পারেন[৪]।

নিম্নে তালিকাভুক্ত ব্যবহারকারীরা এই ই-বইয়ে অবদান রেখেছেন:

- Suvray
- Nafiul adeeb
- Bodhisattwa
- Shashanka Chandra Das
- Sumasa
- Nettime Sujata

- Titodutta
- Hrishikes
- Safuan12616
- Md.Fahamidul Islam Dipro

---

১. ↑ https://bn.wikisource.org
২. ↑ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.bn
৩. ↑ http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
৪. ↑ https://bn.wikisource.org/wiki/উইকিসংকলন:লিপিশালা